হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

জীবন্ত উপবীত

ভয়ংকর-বীভৎস-অদ্ভুত

BanglaBook.org

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

জীবন্ত উপবীত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পত্রভারতী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.bookspatrabharati.com

পত্রভারতী

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৮

হিমাদ্রিকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ অমিত সেন

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশের
কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনওরকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।
এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

JIBONTO UPOBIT
by Himadrikishore Dasgupta
Published by PATRA BHARATI 3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
E-mail patrabharati@gmail.com
visit at www.facebook.com/ Patra Bharati

Price ₹ 225.00

ISBN 978-81-8374-491-1

প্রীতম দে

মোনালিসা দাশ

সুজনেষু

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ষড়রিপুর ষড়যন্ত্রে আমরা বন্দি। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ এবং মাৎসর্য। যে-কোনও একটি প্রবল হলেই সর্বনাশ। সৃষ্টি জগতেও নবরসের হাস্য-করুণ-বীর-শান্তর পাশাপাশি বিরাজ করছে শৃঙ্গার-রৌদ্র-ভয়ানক-বীভৎস-অদ্ভুত রস।

এই দুই মলাটে স্থান পেয়েছে তীব্র এবং তীক্ষ্ণ স্বাদের রচনা। কখনো ধর্মীয় সংস্কারের পৈশাচিক পরিণতি, তো কখনো কাম জর্জরিত মানবিক মনোবিকলন। ভিনগ্রহের প্রাণীর বেঁচে থাকার বীভৎস উপায়, আবার অলৌকিকতা ও প্রেমের মিলিজুলিতে হাড়হিম করা অদ্ভুত কাহিনি।

কোথাও বা লোভের মদে ভয়ানকের হাতছানি...বিজ্ঞান আর সংস্কারের দোলাচল চিন্তা জগতকে কাঁপিয়ে দেবে হয়তো বা কখনো। মানুষের অমানুষিক নৃশংসতায় গা শিউরে ওঠে।

সবই ধরা পড়েছে এখানে। প্রাপ্তবয়স্ক চিন্তায় পরিপূর্ণ বিচিত্র রসের ধারা নিয়েই আমার এই নিবেদন আশাকরি পাঠকের আশা পূরণ করবে।

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

উপন্যাস

জীবন্ত উপবীত ১১

গল্প

রোলাং ৬১
বিল্লি মহল ৮১
প্রজাপতির পাখা ১০৩
মহাশোলের টোপ ১৩৯
বিপরীত বিহার ১৫৭
এক্কাকুন ১৭৩
মেডুসার মুক্তো ১৯৩

জীবন্ত উপবীত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

জীবন্ত উপবীত

স্টেটবাসের পিছনের সিটে বসে জানলার বাইরে তাকিয়েছিল নবারুণ। ইচ্ছা করেই পিছনের আসনটা বেছে নিয়েছে নবারুণ। যাতে সহযাত্রীদের দৃষ্টি কম পড়ে তার ওপর।

এ-দুটো বছর ধরে বহুবার টেলিভিশন চ্যানেলে, সংবাদপত্রের পাতায় ছবি ছাপা হয়েছে তার। আজকাল কেউ তার দিকে তাকালেই নবারুণের মনে হয় লোকটা তাকে চিনে ফেলল না তো? তার দিকে তাকিয়ে লোকটা মনে মনে ভাবছে না তো যে—আরে, এই তো সেই অর্থলোভী নরপিশাচ ডাক্তার নবারুণ গুপ্ত! যার জন্য সরকারি হাসপাতালে একটা ফুটফুটে বাচ্চা ছেলের প্রাণ গেল!

হ্যাঁ, এই অর্থলোভী, অবিবেচক, দায়িত্বজ্ঞানহীন নরপিশাচ—এধরনের বিশেষণগুলোই তার সম্পর্কে ব্যবহৃত হত সংবাদমাধ্যমের আলোচনায়। সংবাদমাধ্যমে কলঙ্কের খবর যত ফলাও করে ছাপা হয় কলঙ্ক মোচনের খবর তেমনভাবে ছাপা হয় না। মেডিকেল কাউন্সিল, আইন, আদালত তাকে নির্দোষ বললেও মানুষের কাছে সে খবর তেমনভাবে পৌঁছোয়নি। সমাজের চোখে হয়তো সে ঘৃণ্য মানুষ হিসেবেই সারাজীবন রয়ে যাবে।

তবে এর চেয়েও বড় ধাক্কা মালবিকার মৃত্যুটা। ঘটনার চাপ নিতে পারেনি সে। প্রথমে সে নিজেকে ধীরে ধীরে দূরে সরিয়ে নিল। সন্তানসম্ভবা ছিল সে। হয়তো সামাজিক লজ্জার ভয়ে এরপর সে চলে গেল পৃথিবী থেকেই। গত দু'বছরে হাসপাতালে সেই শিশুমৃত্যুর ঘটনাটা একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়ে গেল নবারুণের জীবনটাকে।

মসৃণ পিচগলা রাস্তা দিয়ে উল্কার গতিতে ছুটে চলেছে বাস। হু হু করে বাতাস ঢুকছে জানলা দিয়ে। রাস্তার দু'পাশে ফাঁকা ফাঁকা জমি, কোথাও কাশফুলের বন। তারই মাঝে কোথাও কোথাও চোখে পড়ছে পানশালা। ঝাঁ-চকচকে রিসর্ট, একলা দাঁড়িয়ে থাকা নির্মীয়মাণ বহুতল, বহুজাতিক সংস্থার হোর্ডিং—মোবাইল, বাইকের বিজ্ঞাপন। শহর এখন হাত বাড়িয়েছে গ্রামের দিকে।

BanglaBook.org

যদিও নবারুণের মাঝে মাঝেই মনে পড়ছে গত দু-বছর ধরে চলা বিভিন্ন ঘটনা বা দুর্ঘটনার নানা অনুষঙ্গ, বিশেষত মালবিকার সেই মৃত্যু-শীতল মুখটার কথা। তবুও বহুদিন পর সেসব থেকে কিছুটা মুক্তির আনন্দ যেন অনুভব করছে নবারুণ। প্রফেসর ঘটকও বলেছেন যে, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। এখানে তার কোনও অসুবিধা হবে না। নার্সিংহোমেই তার থাকার ব্যবস্থা হবে। ইচ্ছে না হলে নার্সিংহোম ছেড়ে বাইরে যাওয়ার দরকার নেই।

বাইরের দিকেই তাকিয়ে বসেছিল নবারুণ। কলকাতা থেকে সারারাত একইভাবে বসে এসেছে সে। মাঝরাতে একবার একটা ধাবায় বাস থেমেছিল। তখন শুধু একবার চা খেতে নেমেছিল সে। বেলা প্রায় দশটা বাজে, এমন সময় হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বাসের গতি কমে এল। কনডাকটর ঘাড় ফিরিয়ে নবারুণকে বলল, 'দাদা, এগিয়ে আসুন। আপনার নার্সিংহোম এসে গেছে।'

সিট ছেড়ে ব্যাগটা সঙ্গে নিয়ে উঠে দাঁড়াল নবারুণ। এক মিনিটের মধ্যেই বাসটা তাকে রাস্তার পাশে নামিয়ে দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ তুলে চলে গেল।

কিছুটা তফাতেই দেখা যাচ্ছে তিনতলা নার্সিংহোমটা। মাথার ওপর সাইনবোর্ডে ইংরেজিতে লেখা 'ঘটক নার্সিংহোম'। দূর থেকেই বাড়িটার পিছন দিকে প্রাচীরঘেরা বিঘে চারেক লম্বা একটা বিশাল জমি চোখে পড়ছে। সম্ভবত সেটা নার্সিংহোমের জমির-ই অংশ। কালো রঙের একটা এসইউভি দাঁড়িয়ে আছে নার্সিংহোমের সামনে, তবে লোকজন তেমন চোখে পড়ছে না।

তিনতলা সাদা রঙের বাড়িটাকে কেমন যেন বিবর্ণ-বিষণ্ণ লাগছে। তার ঝাঁ-চকচকে ভাবটা নেই। হয়তো বা একদম রাস্তার গা ঘেঁষেই বিল্ডিংটা দাঁড়িয়ে রয়েছে বলে ধুলো ধোঁয়ায় অমন বিবর্ণ দেখাচ্ছে তাকে। নবারুণ কিছুটা হেঁটে নার্সিংহোমের গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। ভিতর থেকে কোনও শব্দ আসছে না। মাথার ওপর একবার তাকাল নবারুণ। দোতলা-তিনতলার ঘরগুলোর সার সার কাচের জানলাগুলো ভিতর থেকে সব বন্ধ।

নবারুণকে দেখতে পেয়ে গেটের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সবুজ পোশাক পরা একজন সিকিউরিটির লোক। দরজা আগলে দাঁড়িয়ে সে

BanglaBook.org

নবারুণের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করল, 'পেশেন্ট পার্টি? নাকি ওষুধ কোম্পানির লোক?'

নবারুণ জবাব দিল, 'আমি ডাক্তার অম্বরীশ ঘটকের কাছে এসেছি।'

'কী কাজ?' সন্দিগ্ধ চোখে আবার প্রশ্ন করল লোকটা।

নবারুণ জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগে নার্সিংহোমের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার ঘটক। নবারুণ তাঁকে প্রায় সাত-আট বছর পর দেখল। তাঁকে সে শেষ চাক্ষুষ করেছিল যখন সে মেডিকেল কলেজের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র ছিল। তাদের প্রফেসর ছিলেন ডাক্তার ঘটক। এই সাত-আট বছরে বয়স তাঁর কিছুটা বেড়েছে, মাথার টাকটাও যেন কিছুটা বেড়েছে, জুলপিতে পাক ধরেছে। কিন্তু তাঁর চেহারা-পোশাকেও যেন আভিজাত্য বেড়েছে অনেকটা। পরনে সাদা রঙের দামি স্যুট। সূর্যের আলোতে ঝলমল করছে হাতের রোলেক্স, চোখের সোনার ফ্রেমের বাইফোকালটা। নবারুণকে দেখতে পেয়েই তিনি সেই গেটম্যানকে বললেন, 'ওঁনাকে ভিতরে ঢুকতে দাও। উনি আমাদের নতুন ডাক্তারবাবু।'

লোকটা কথাটা শুনে একটু লজ্জা পেয়ে 'আসুন আসুন স্যার' বলে দরজা খুলে দিল। হাতের ব্যাগটাও নিতে গেছিল সে, কিন্তু নবারুণ ইশারায় থামাল তাকে। নবারুণ প্রবেশ করল নার্সিংহোমে। ডাক্তার ঘটক কয়েক-পা এগিয়ে এলেন তার সামনে। তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে একবার তিনি নবারুণকে দেখে নিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'ওয়েলকাম মাই বয়। এসো, ভিতরে এসো।

নবারুণের কাঁধে ভরসার হাত, বিশ্বাসের হাত। অনেকদিন পর কেউ এভাবে হাত রাখল তার কাঁধে। নবারুণের বন্ধু-বান্ধব, ছেড়ে-আসা হাসপাতালের কলিগরা তো কবেই তার সঙ্গ ত্যাগ করেছে, বদনামের অংশীদার হওয়ার ভয়ে বা ঘৃণাতে। নবারুণ ঝুঁকে পড়ে তার স্যারকে প্রণাম করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তাকে তুলে ধরে ডাক্তার ঘটক বললেন, 'এসবের কোনও দরকার নেই। মেডিকেল কলেজে তুমি আমার প্রিয় ছাত্র ছিলে, এখনও তাই আছ। চলো, আগে ভিতরে চলো।'

ডাক্তার ঘটকের সঙ্গে বাড়িটার ভিতর পা রাখল নবারুণ। দরজার পাশেই রিসেপশন, ক্যাশ কাউন্টার, কিন্তু কেউ কোথাও নেই। কয়েক পা এগিয়ে একপাশে একটা লিফট। তার ঠিক বিপরীতে ওপরে ওঠার সিঁড়ি।

BanglaBook.org

সামনে একটা লম্বা প্যাসেজ চলে গিয়েছে নার্সিংহোমের ভিতরে। আর তার দু'পাশে সার সার ঘর। তার কোনওটা এক্স-রে রুম, কোনওটা প্যাথলজি রুম, দরজার গায়ে লেখা আছে। সেখানেই একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার ঘটক।

ঘরটা তার অফিসরুম। নবারুণকে নিয়ে তিনি প্রবেশ করলেন সেই ঘরে। কাচের টেবিল-ঘিরে সার সার চেয়ার। নবারুণকে তার একটাতে বসতে বলে তিনি গিয়ে বসলেন তাঁর নিজের গদি আঁটা রিভলভিং চেয়ারে, নবারুণের মুখোমুখি। ডাক্তার ঘটক যেখানে বসলেন ঠিক তাঁর মাথার পিছনে এক সন্ন্যাসীর ছবি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে আছেন ফোটো ফ্রেমের ভিতর থেকে। যেন তিনি তাকিয়ে আছেন নবারুণের দিকেই।

ডাক্তার ঘটকের ঘরে টাঙানো এই ছবিটা দেখে বেশ অবাক-ই হল নবারুণ। মুহূর্তের জন্য তার মনে পড়ে গেল একটা পুরোনো ঘটনা। মেডিকেল কলেজে তার এক সহপাঠী ছিল সুপ্রিয় বলে। কোনও এক গুরুদেবের শিষ্য ছিল সে। অপারেশন টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কাজ শুরু করার আগে অবশ্যই একবার সে তার গুরুদেবের ছবি পকেট থেকে বার করে প্রণাম করত। ব্যাপারটা একবার ধরা পড়ে গিয়েছিল প্রফেসর ঘটকের চোখে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সবার সামনেই সুপ্রিয়কে তিরস্কার করে বলেছিলেন, 'এই পেশেন্টকে যদি কেউ বাঁচাতে পারে তা হল মেডিকেল সায়েন্স। এই পেশেন্টের জীবন-মৃত্যু-আরোগ্য সবই নির্ভর করছে বিজ্ঞানের ওপর। আমাদের হাতের ওপর। তোমার ওই ছবির ওপর নয়। ছিঃ ছিঃ, তুমি না বিজ্ঞানের ছাত্র! সামনের দিনে এ-ঘটনা দেখলে তোমাকে ওটি থেকে বার করে দেব। ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিয়ে তুমি বরং তোমার গুরুদেবের আশ্রমে চলে যেও। অলৌকিকভাবে রোগীদের চিকিৎসা কোরো।'

এহেন ডাক্তার ঘটকের মাথার পিছনে এজন্য সাধুসন্ন্যাসীর ছবি দেখে বেশ অবাক-ই হল নবারুণ। সে নিজে অবশ্য গুরুবাদ বা দৈববাদে বিশ্বাস না করলেও এসবকে অশ্রদ্ধাও করে না। কারণ, এক-এক মানুষের এক-এক বিশ্বাস। সে-বিশ্বাসকে ব্যক্তিগতভাবে অবিশ্বাস করলেও অশ্রদ্ধা করাও উচিত নয়।

বেশ কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে রইলেন ডাক্তার ঘটক। তারপর একটা পেপার ওয়েট তুলে নিয়ে সেটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, 'অনেক বছর

BanglaBook.org

পর দেখা হল তোমার সঙ্গে। তুমি যখন ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র তখনই তো চাকরি থেকে আমি রেজিগনেশন দিই। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতা থেকে অনেক দূরে এখানে চলে আসি। প্রায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল মেডিকেল কলেজের সবার সঙ্গে। তারপর যখন তোমার ঘটনাটা ঘটল তখন খবরের কাগজে, টেলিভিশনের পরদায় তোমার ছবি দেখে তোমাকে চিনলাম। খুব খারাপ লাগছিল তোমার ব্যাপারটা দেখে। আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না ঘটনাটা। সেসময় বেশ কয়েকবার তোমার টেলিফোন নম্বর জোগাড় করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। কিন্তু দিনকয়েক আগে ঘটনাচক্রে তোমার নম্বরটা এক মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের কাছে পেয়ে যোগাযোগ করলাম তোমার সঙ্গে। তোমাকে আসতে বললাম আমার এখানে।

তোমার ঘটনাটা সম্বন্ধে নানা খবর বেরিয়েছিল সংবাদমাধ্যমে। আমি জানি সবসময় সংবাদমাধ্যমের সব সংবাদ সঠিক হয় না। আসল ঘটনাটা কী ঘটেছিল তা আর একবার সংক্ষেপে জানতে চাই। নির্দ্বিধায় বলো। তোমার আশঙ্কার কোনও কারণ নেই। মেডিকেল কাউন্সিল, আদালত তো তোমাকে ক্লিনচিট দিয়েছে। তুমি আমার এখানে কাজ করবে অতীতে যাই ঘটুক না কেন।'—একটানা কথাগুলো বলে নবারুণের উত্তরের প্রত্যাশায় চশমার ফাঁক দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন ডাক্তার ঘটক।

নবারুণ একটু চুপ করে থেকে বলতে শুরু করল।—আপনাকে টেলিফোনে যা বলেছি সেটাই সত্যি স্যার। আমাদের সেই সরকারি হাসপাতালে 'ওটি'-তে নাইট ডিউটি ছিল আমার। ঠিক দু'বছর আগে কালীপুজোর রাত। একজন এসে খবর দিল একজন পেশেন্ট এসেছে। বছর আটেক বয়সের একটা বাচ্চা ছেলে। হেড ইনজুরি। বাজি পোড়াতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে গেছে। আমি অ্যাটেন্ড করলাম ছেলেটাকে। দেখলাম ওর মাথায় গভীর ক্ষত। স্টিচ করতে হবে। তাকে ওটিতে নিয়ে যেতে বলে আমি যখন তৈরি হয়ে 'ওটি'-তে ঢুকতে যাচ্ছি, ঠিক তখন-ই মোবাইলে হাসপাতাল সুপারের মেজেস এল, 'কাম শার্প, আর্জেন্ট ম্যাটার।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে সুপার সাহেবকে ফোন করতেই তিনি জানালেন, 'এখনি আমার অফিসে আসতে হবে। বাইরে বেরোতে হবে।'

আমি তাঁকে বললাম, 'কিন্তু আমি তো এখন 'ওটি'-তে ঢুকছি। হেড

BanglaBook.org

ইনজুরি নিয়ে একটা বাচ্চা ছেলে এসেছে। স্টিচ করতে হবে।'

তিনি বললেন, 'আমি এখনই অন্য একজনকে সেখানে পাঠাচ্ছি।' কিন্তু তুমি চলে এসো এখনই।'

সুপারের নির্দেশ। কাজেই একটু ইতস্তত করে আমি ছুটলাম পাশের বিল্ডিং-এ তাঁর অফিসে। আমি তাঁর চেম্বারে ঢুকলাম। আমাদের সরকারি হাসপাতালের গায়েই একটা নতুন নার্সিংহোম রয়েছে। সুপার সাহেব বললেন, আমাকে সেখানে এখনই একবার যেতে হবে। এক বিখ্যাত শিল্পপতির মেয়ে কার অ্যাক্সিডেন্টে পায়ে ইনজুরি নিয়ে সেখানে গেছে। ঢাকঢোল পিটিয়ে বিজ্ঞাপন করলেও তেমন পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি সেই নার্সিংহোমের। যে-সার্জেনরা নিয়োজিত হয়েছেন তাঁরা কালীপুজোর রাতে ডিউটিতে আসেননি। তাঁদের খবর পাঠানো হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাঁদের আসতে অন্তত একঘণ্টা সময় লাগবে। অন্য কেউ হলে সে নার্সিংহোম হয়তো পেশেন্টকে অন্য কোথাও যেতে বলত। কিন্তু ক্ষমতাবান বিশিষ্ট শিল্পপতির কন্যা বলে তাকে ফেরাতে পারেনি।

সেই শিল্পপতির পলিটিক্যাল কানেকশন আছে শাসকদলের সর্বোচ্চ মহলে। আর সেই সূত্র ধরে ওই শিল্পপতি স্বাস্থ্যভবনের এক পদস্থ কর্তাকে ফোন করে সাহায্য চেয়ে। সেই অফিসার আবার সুপার সাহেবকে ফোন করেছেন একজন সার্জেনকে সেখানে পাঠাবার জন্য। কারণ আমাদের সরকারি হাসপাতালটা সেই নার্সিংহোমের কাছেই। সুপার সাহেবের কথা শুনে আমি তাকে বললাম, 'কিন্তু স্যার, ডিউটি আওয়ার্সে এভাবে বাইরে যাওয়া কি ঠিক হবে? তাছাড়া আমি ওটিতে ছেলেটাকে ঢুকিয়ে এসেছি।'

সুপার সাহেব বললেন, না-গেলে তাঁর আর আমার পরিণাম ভালো হবে না। সেই শিল্পপতি রাজনৈতিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। সেখানে গেলে আমার চিন্তার কিছু নেই। আর ওটি-তে এখনই অন্য একজন সার্জেনকে পাঠাচ্ছেন তিনি। তার কথার ওপর ভরসা করে কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাসপাতালের সরকারি গাড়িতেই হাসপাতাল ছেড়ে সেই নার্সিংহোমে পৌঁছোলাম আমি।

গিয়ে দেখি ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। ধনীর দুলালি মদ্যপ অবস্থায় ধর্মতলার একটা পানশালা থেকে বেরিয়ে গাড়ি নিয়ে ধাক্কা মেরেছিল রাস্তার ডিভাইডারে। গাড়িতে-বসা অবস্থায় তার বাঁ-পায়ের পাতা জখম হয়েছে।

BanglaBook.org

দুটো স্টিচ-ই যথেষ্ট। কিন্তু ওই সামান্য কাজ করতেই ঘণ্টা দুই সময় লেগে গেল। একে সে মদ্যপ অবস্থায় ছিল, তার ওপর বাপের আদরের মেয়ে। কিছুতেই সে পা ছুঁতে দিতে রাজি হচ্ছিল না। চিৎকার করছিল, অশ্রাব্য গালিগালাজ করছিল।

কাজ মিটিয়ে আমি যখন হাসপাতালে ফিরলাম তখন প্রায় ঘণ্টা তিনেক সময় কেটে গেছে। সেখানে ঢুকেই শুনলাম ব্যাপারটা। আমার ওটি-তে রেখে আসা সেই বাচ্চা ছেলেটা নাকি মারা গেছে! আসলে সুপার সাহেব ওটি-তে কাউকে পাঠাতে ভুলে গিয়েছিলেন। রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয়েছে তার।

পরদিন কীভাবে যেন খবরটা চাউর হয়ে গেল মিডিয়াতে। সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার পেশেন্ট ফেলে টাকার লোভে নার্সিংহোমে শিল্পপতির মেয়ের চিকিৎসা করতে গিয়েছিল। আমার লোভ আর কর্তব্যে অবহেলার জন্যই মৃত্যু হয়েছে বাচ্চাটার। অথচ আমি সেই নার্সিংহোমে থেকে একটা পয়সাও নিইনি। আমার কোনও যোগাযোগ-ই ছিল না ওই নার্সিংহোমের সঙ্গে। খবর মিডিয়াতে প্রচার হওয়ামাত্রই বিরোধী রাজনৈতিক দল, সমাজকর্মী, বুদ্ধিজীবীরা হইহই করে মাঠে নেমে পড়লেন। অবস্থা বেগতিক দেখে সুপার সাহেবও ঘটনাটার দায় ঝেড়ে ফেলে বললেন, তিনি নাকি জানতেন-ই না ব্যাপারটা! আর তারপর...

দীর্ঘক্ষণ কথাগুলো বলে একটু চুপ করে রইল নবারুণ। তার চোখে ভেসে উঠল সে-সময়ের ঘটনাগুলো। তার সাসপেনশন, মামলা-মোকদ্দমা, মিডিয়ার আক্রমণ, অবসাদে মালবিকার আত্মহত্যা...। শেষের দিকে একদিন সে বলেছিল, 'কী হবে আমার? কী হবে পেটের বাচ্চাটার?'

আমার এক পেশেন্ট ছিলেন নামকরা অ্যাডভোকেট। সেদিন হাসপাতালে ডিউটিতে গেলেও অ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্টারে সই করিনি। সেই সূত্র ধরেই তিনি শেষপর্যন্ত আমায় বাঁচিয়ে দিলেন। আমি চাকরি ফিরে পেলেও বুঝতে পারলাম ওই হাসপাতালে চাকরি করা আর আমার সম্ভব নয়। রেজিগনেশন দিয়ে দিলাম।

কথাগুলো বলে চুপ করে গেল নবারুণ। বেশ খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতা। মাথা নীচু করে বসেছিল নবারুণ। ডাক্তার ঘটক তার উদ্দেশে বললেন, 'চিয়ার আপ। অনেকের জীবনেই এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। তারপর ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে। তাছাড়া আমি তোমার সঙ্গে আছি।'

BanglaBook.org

নবারুণ বলল, 'আপনার ভরসাতেই তো এখানে এলাম। কিন্তু এখানে কেউ আমাকে চিনে ফেলবে না তো? আপনাকে কোনও বিড়ম্বনায় পড়তে হবে না তো?'

ডাক্তার ঘটক বললেন, 'ওসব নিয়ে চিন্তা কোরো না। পাবলিক মেমরি খুব শর্ট। হয়তো তারা ইতিমধ্যেই ঘটনাটা ভুলতে শুরু করেছে বা ভুলেই গেছে। তোমার ডাক্তার মাইতির সেই ঘটনার কথা খেয়াল আছে? যে রোগীর পেটের মধ্যে নিড্‌ল রেখে স্টিচ করে দিয়েছিল। তাই নিয়ে মিডিয়াতে কত হইচই হয়েছিল! কিন্তু সে এখন চুটিয়ে প্র্যাকটিস করছে। তিনটে নার্সিংহোমে বানিয়েছে। তাছাড়া এটা কলকাতা শহর নয়। এখানে মিডিয়ার দাপাদাপি নেই, কোনও সমস্যা হবে না তোমার।'

এ কথা বলার পর ডাক্তার ঘটক বললেন, 'এবার এখানকার কথা বলি তোমাকে। এখানেই ক'টা দিন থাকতে হবে তোমাকে। খাবারের ব্যবস্থা কেয়ারটেকার মানে ওই গেটম্যান করে দেবে। আমার নতুন নার্সিংহোমটা শহরের ভিতর। সেটা ওপেন হলেই সেখানে শিফট্ করবে তুমি। এই নার্সিংহোমে তোমার তেমন কাজ নেই। এটা বন্ধ করে দিচ্ছি। এখানে ঠান্ডা পানীয়র একটা বটলিং প্ল্যান্ট করব। যন্ত্রপাতি সব শিফট হচ্ছে এখান থেকে নতুন নার্সিংহোমে। এখানে নতুন কোনও রোগীকে অ্যাডমিট করা হচ্ছে না। দুজন মাত্র রোগী আছে এখানে। তাদের একজন বৃদ্ধ, বয়সজনিত অসুবিধার কারণে ভরতি আছে। অন্য একজন একটা মাঝবয়সি লোক। পা ভেঙেছে, ট্রাকশন দেওয়া আছে। হাউস ফিজিশিয়ান ডাক্তার দাস এসে দু'বেলা তাদের দেখে যান। ক'দিনের মধ্যে তাদের ছুটি দিয়ে দেওয়া হবে। আর আছে দুজন আয়া। নার্সিং-এর কাজটা তারাই করে। নতুন নার্সিং হোমটা চালু হলে তোমার কাজ শুরু হবে।'

নবারুণ জানতে চাইল, 'কত কাজ বাকি আছে তার?'

ডাক্তার ঘটক বললেন, 'খুব দ্রুত সেখানে কাজ শেষ করার চেষ্টা করছি। দেখা যাক! তার আগে একটা কাজ বাকি আছে।'

এরপর ডাক্তার ঘটক হঠাৎ তার রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চলো, এবার তোমাকে তোমার ঘরে নিয়ে যাই। সারারাত জার্নি করে এসেছ। বিশ্রাম নাও। আমাকে আবার স্টেশনে যেতে হবে একজনকে আনতে। বিকালে আমি আবার আসব।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার

BanglaBook.org

ঘটক। উঠে দাঁড়াল নবারুণও। সে-ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে ডাক্তার ঘটকের পিছনে হাঁটতে হাঁটতে নবারুণ বলল, 'তাহলে আমার এখানে কোনও কাজ নেই বলছেন?'

ডাক্তার ঘটক হেসে বললেন, 'না, নেই। তবে ইচ্ছা হলে পেশেন্ট দুজনের কেবিনে ভিজিট করতে পারো। একটু পালস প্রেশারগুলো দেখেটেখে দিও। পেশেন্টরা স্যাটিসফায়েড হবে দুজন ডাক্তারবাবু তাদের দেখতে আসছেন বলে।'

দুই

ঘরটা নার্সিংহোমের ঠিক পিছন দিকে। অ্যাটাচড্ বাথ, বেশ ছিমছাম ঘর। ডাক্তার ঘটক তাকে এঘরে পৌঁছে দেওয়ার পর সে দুজন আয়া এসে দেখা করে গিয়েছিল নবারুণের সঙ্গে। মাঝবয়সি দুজন মহিলা। গেটের সেই ছেলেটাও এসেছিল খাবার দিতে। ননীগোপাল নাম তার। স্নান-খাওয়া সেরে, নবারুণ ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার যখন ঘুম ভাঙল তখন বিকেল হয়ে গেছে।

নবারুণ স্বপ্নের মধ্যে মালবিকাকে দেখছিল। কোর্ট রুমে উইটনেস বক্সে দাঁড়িয়ে আছেন নবারুণ। অ্যাডভোকেটদের তীক্ষ্ণ সওয়াল জবাব চলছে। চোখা-চোখা সব প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হচ্ছে নবারুণের উদ্দেশ্যে। আর কিছুটা তফাতে একটা কেঠো বেঞ্চে অন্যদের সঙ্গে আশঙ্কিত, বিধ্বস্ত মুখ নিয়ে বসে আছে মালবিকা। সেদিনই তাকে শেষবারের জন্য দেখেছিল নবারুণ এজলাসের ঘেরাটোপের মধ্যে।

নবারুণের স্বপ্নে আবার ফিরে এসেছিল দৃশ্যটা। মাঝে মাঝেই এ-স্বপ্নটা দেখে নবারুণ। আজও দেখল। ঘুমটা ভাঙার পর। ঘুমটা ভেঙে যাওয়ার পর ধাতস্থ হতে বেশ কিছু সময় লাগল নবারুণের। আসলে মালবিকা নবারুণের জীবনকে এতটা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে তাকে এখনও মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না নবারুণ। এক-এক সময় তার মনে হয়—সব মিথ্যা, সব মিথ্যা, মালবিকা চলে যায়নি সে আছে, সে আছে...

জানলার বাইরে তাকাল নবারুণ। পড়ন্ত বেলায় একলা দাঁড়িয়ে আছে

BanglaBook.org

উঁচু প্রাচীর ঘেরা বিরাট জমিটা। স্বপ্নটা দেখার পর আবার একটা বিষণ্ণতা ঘিরে ধরেছে নবারুণকে। তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল নবারুণ। তার ঘরের ঠিক পিছনেই একটা ছোট প্যাসেজ। তারপরই একটা ছোট গেট আছে। সেটা দিয়ে মাঠটাতে নেমে পড়ল সে। ভালো করে চারদিকে তাকাল নবারুণ। কেউ কোথাও নেই। তবে জমিটার একদম শেষ মাথায় বেশ কয়েকটা গাছ জটলা বেঁধে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। গাছগুলো খুব বিশাল নয়, আবার ছোটও নয়। আর তার কিছুটা তফাতে প্রাচীরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ছোট আউট হাউস। নবারুণ হাঁটতে শুরু করল সেদিকে।

ফাঁকা মাঠে ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে একসময় সেদিকে পৌঁছে গেল সে। হ্যাঁ, আউট হাউসের মতোই একটা ঘর। সেটা বাইরে থেকে তালাবন্ধ। সে এরপর এগোল গাছের দঙ্গলগুলোর দিকে। পাঁচটা গাছ সেখানে যেন বৃত্তরচনা করে দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে দুটো গাছকে সে চিনতে পারল, বট আর অশ্বত্থ। বাকিগুলো অচেনা। গাছগুলোর ডাল-পাতা মিলেমিশে তাদের ভিতরের ফাঁকা জমিটার মাথায় একটা চাঁদোয়ার সৃষ্টি করেছে। তবুও তারই ফাঁক গলে শেষ বিকেলের সূর্যকিরণ কীভাবে যেন এসে পড়েছে গাছে ঘেরা ভিতরের ছোট্ট জমিটাতে। সেখানে রয়েছে লাল রঙের একটা অনুচ্চ বেদি। ঠিক যেমন বেদির ওপর মূর্তি বসিয়ে পুজো-অর্চনা করা হয়, তেমন বেদি।

জিনিসটা দেখে বেশ একটু অবাক হয়ে গেল নবারুণ। ডাক্তার ঘটক এখানে কোনও পুজোর ব্যবস্থা করেন নাকি! আবার হয়তো তিনি নন, হাসপাতালের কর্মীরাই হয়তো কোনও পুজোটুজো করেন—মনে মনে ভাবল নবারুণ।

ডাক্তার ঘটকের কথা মনে পড়তেই হঠাৎ তার খেয়াল হল যে, তিনি বিকেলবেলা আসবেন বলেছেন। কথাটা মনে আসতেই নবারুণ সে-জায়গা ছেড়ে পা বাড়াল ঘরে ফেরার জন্য। জমিটা পেরিয়ে এসে নবারুণ আবার বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় মাথার ওপরে একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনে ওপরদিকে তাকাল সে। নার্সিংহোমের তিনতলার একটা জানলা খোলা ছিল। সেটা হাত দিয়ে টেনে বন্ধ করল কেউ। তার চুড়ি-পরা হাতটাই শুধু এক ঝলক দেখতে পেল নবারুণ। হয়তো সে সেই আয়া দুজনের

BanglaBook.org

মধ্যেই কেউ হবে।

নিজের ঘরের এসে ঢুকল নবারুণ। বাইরে বেলা দ্রুত পড়ে আসছে। শরতের বেলা। দুর্গাপুজো শেষ হয়ে গেছে দিন দশেক আগে। সামনে কালীপুজো আসছে। মানে সেই ঘটনার দু'বছর পূর্ণ হবে আর ক'দিন পর। জানলার বাইরে তাকিয়ে বাইরের সন্ধ্যা-নামা দেখতে লাগল নবারুণ। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে মাঠের বুকে। সেদিকেই তাকিয়ে ছিল নবারুণ। হঠাৎ একটা গাড়ির শব্দ শুনতে পেল। একটা এসইউভি গাড়ি ঢুকল মাঠে। গাড়িটা সম্ভবত ডাক্তার ঘটকের।

নার্সিংহোমের কম্পাউন্ডে ঢোকার পর একটা চওড়া প্যাসেজ আছে বিল্ডিং-এর পিছন দিকে যাওয়ার জন্য। সেখান দিয়েই গাড়িটা ঢুকে পিছনের জমিটা দিয়ে গোটা এগোচ্ছে জমিটার শেষ প্রান্তের দিকে। গাড়িটা গিয়ে থামল জমিটার শেষ প্রান্তের সেই আউট হাউসের মতো ঘরটার সামনে। গাড়ি থেকে নামল দুজন। আলো মরে এসেছে। সেই আবছা আলোতে দূর থেকে একজনকে আন্দাজে চিনতে পারল নবারুণ। তিনি ডাক্তার ঘটক।

গাড়ি থেকে নেমে লোক দুজন সেই ঘরটাতে ঢুকল। নবারুণ সেদিকে তাকিয়ে রইল। বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। অন্ধকার নেমে আসছে। একসময় একজন বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠল। তারপর গাড়ি আবার ফিরে আসতে লাগল। নবারুণের ঘরের পাশ কাটিয়ে আবার নার্সিংহোমের সামনের দিকে চলে গেল গাড়িটা। এর পাঁচ মিনিটের মধ্যে নবারুণের ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। ননীগোপাল এসে তাকে জানাল, 'স্যার এসেছেন। তিনি আপনাকে তাঁর চেম্বারে ডাকছেন।'

নিজের সেই গদি আঁটা চেয়ারে বসেছিলেন ডাক্তার ঘটক। নবারুণ তাঁর ঘরে ঢুকতেই তিনি ইশারায় বসতে বললেন তাকে। বসল নবারুণ। ডাক্তার ঘটক বললেন, 'কী করছিলে তুমি? ঘুমোচ্ছিলে? আমি এই একটু আগেই এখানে এলাম।'

নবারুণ বলল, দুপুরে একটু ঘুমোলাম। বসেছিলাম ঘরে। আপনাকে তো মনে হয় দেখলাম পিছনের জমিটাতে যেখানে ঘরটা আছে সেখানে যেতে।'

ডাক্তার ঘটক বললেন, 'হ্যাঁ, গুরুদেব এসেছেন। আমার মাথার ওপর যে ছবিটা দেখছ ওটা তাঁরই। ওঁকেই আনতে গিয়েছিলাম রেলস্টেশনে। ট্রেন লেট ছিল। তাই আসতে একটু দেরি হল। উনি ক'দিন থাকবেন

BanglaBook.org

এখানে। বছরে একবার আসেন। ওই ঘরটাতে ক'দিন থাকেন।'

একদা প্রবল নাস্তিক, মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব প্রফেসরের কথা শুনে এবার স্পষ্টতই বিস্মিতভাবে তাকাল নবারুণ। ডাক্তার ঘটকের সে-দৃষ্টি পাঠ করতে অসুবিধা হল না। তিনি বললেন, 'কী ভাবছ? তোমাদের মেডিকেল কলেজের প্রফেসর ঘটকের সঙ্গে আজকের আমাকে ঠিক মেলাতে পারছ না তাই না? আসলে জীবন বড় বিচিত্র। একদিন আমি বুঝতে পারলাম আমাদের চেনা-জানা জীবনের পরিধির বাইরেও এমন অনেক কিছু আছে যা আমরা জানি না। এ-কথাটা আমি জানতাম না যদি গুরুদেবের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হত। আমরা ক্ষুদ্র মানুষ, দু'পাতা বিজ্ঞানের বই পড়ে নিজেদের পণ্ডিত মনে করি। অথচ আমাদের সে জ্ঞান কত তুচ্ছ। তোমাকে বলতে দ্বিধা নেই যে আজ আমি এই নার্সিংহোম, দু-দুটো কোল্ড স্টোরেজ, একটা প্যাথলজি ক্লিনিকের মালিক। কলকাতার নিউ আলিপুরে একটা দু'হাজার স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট আর এখানে শহরে একটা তিনতলা বাড়ি করেছি। নতুন একটা নার্সিংহোম খুলতে যাচ্ছি আর এখানে একটা বটলিং প্ল্যান্ট।

অথচ কী ছিলাম আমি। সরকারি হাসপাতালের একটা দেড় কামরার কোয়ার্টারে থাকতাম, আর আমার হুগলির গ্রামে সামান্য কিছু জমি ছিল। আজ আমাকে যা দেখছ, আমার যা হয়েছে তা সবই গুরুদেবের কৃপায়। ভাগ্যিস তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তোমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। আশীর্বাদ নিও। তোমার সব দুর্যোগ কেটে যাবে।'

তাঁর কথা শুনে নবারুণ জানতে চাইল, 'কীভাবে আপনার সঙ্গে পরিচয় হল তাঁর? ওনার নাম কী? কোথায় থাকেন?'

ডাক্তার ঘটক বললেন, 'ওঁনাকে সবাই 'অঘোরবাবা' বলে ডাকেন। আমিও তাই বলি। তন্ত্রসিদ্ধ যোগীপুরুষ। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম জানি না। সেটা জিগ্যেস করাও উচিত নয়। উনি থাকেন বেনারসে। ওখানে 'হরিশচন্দ্র ঘাট' বলে একটা ঘাট আছে হয়তো শুনেছ। শ্মশানঘাট, যেখানে রাজা হরিশচন্দ্র চণ্ডালের কাজ করতেন বলে কথিত। সেখানে এক কুটিরে থাকেন গুরুদেব।

ওঁর সঙ্গে পরিচয় বেশ অদ্ভুতভাবে। গঙ্গাসাগর মেলার সময় পুণ্যার্থীদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে মেডিকেল ক্যাম্প করা হয় নিশ্চয় জানো। তার

BanglaBook.org

ইনচার্জ করে আমাকে পাঠানো হয়েছিল সেখানে। আমি তখন মানসিকভাবে খুব বিপর্যস্ত। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতাম না আমি। সরকারি চাকরি করে কিছু টাকা জমিয়েছিলাম। সেই পরিশ্রমের টাকা আমি লগ্নি করেছিলাম একটা নতুন ওষুধ কোম্পানিতে। আসলে সেটা কোনও কোম্পানি ছিল না, কাগজ-কলমে দেখানো একটা কোম্পানি। তারা আমাকে প্রতারিত করে আমার সঞ্চিত টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল। অন্ধকার নেমে এল আমার জীবনে।

সারা জীবনের সঞ্চয় চলে গেছে! ঠিক সেই সময় আমার দেখা তাঁর সঙ্গে। বাবুঘাটের রেলিং-এ হেলান দিয়ে সেই কুয়াশা মাখানো অন্ধকারে বসেছিলেন তিনি। আমি পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ তিনি কৃপা করে ডাকলেন আমাকে। আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি গড়গড় করে বলে দিলেন আমার জীবনের সব কথা। এমনকী যে কথা আমি ছাড়া অন্য কারও জানার কথা নয়, সে কথাও।

এত বিস্মিত আমি কোনওদিন হইনি। সেই প্রথম আমি সম্মোহিত হয়ে কোনও সাধু-সন্ন্যাসীর পা-ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। তিনি আমার মাথায় হাত রেখে অভয় দিয়ে বললেন, 'তোর কোনও ভয় নেই। আমি তোর সঙ্গে আছি। তুই চাকরি ছেড়ে দে। কোনও "কূর্মভূমি"-তে গিয়ে সেখানে আমার দেওয়া তম্ত্রবৃক্ষ রোপন করে সেখানে নিজের ব্যবসা শুরু কর। তোর নাম-যশ-অর্থ সবই হবে। আমি যাব তোর কাছে।'

তাঁর কথা শুনে সে-কাজ করলাম আমি। খুঁজে-পেতে কলকাতা থেকে এই কূর্মভূমিতে চলে এলাম। ব্যাংক লোন নিয়ে, গ্রামের জমি বিক্রি করে এখানে এই জমি কিনলাম। পঞ্চবৃক্ষ বা তম্ত্রবৃক্ষ রোপণ করলাম এখানে। তারপর নার্সিংহোম খুললাম। আজ এই শূন্য নার্সিংহোম দেখে তুমি ধারণাই করতে পারবে না কী রমরম করে চলেছে নার্সিংহোমটা। রোজ-ই স্থানাভাবে অনেক রোগীকে ফিরিয়ে দেওয়া হত। কুড়িজন ডাক্তার আর সত্তর জন মেডিকেল স্টাফ ছিল এখানে। আর তারপর...'

ডাক্তার ঘটকের কথার মাঝেই নবারুণ কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল, 'কূর্মভূমি মানে?'

ঘটক বললেন, 'এই বর্ধমান জেলার কিছু জায়গায় কিছু কূর্মভূমি আছে। অর্থাৎ কচ্ছপের পিঠের মতো উঁচু জমি। বীরভূম জেলাতেও এই কূর্মভূমি

BanglaBook.org

দেখা যায়। এই কূর্মভূমিকে বলে 'সাধনপীঠ'। তন্ত্র সাধনার উৎকৃষ্ট জায়গা। যে জমির ওপর এই নার্সিংহোম, প্রাচীর ঘেরা জায়গা, সেটা যদি তুমি ভালো করে দেখো তবে বুঝতে পারবে যে, এটা আশেপাশের জমিগুলোর তুলনায় কচ্ছপের পিঠের মতো কিছুটা উঁচু। এটা কূর্মভূমি...'

ডাক্তার ঘটক হয়তো আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করলেন মাঝবয়সি একজন লোক। তাঁর গলায় স্টেথিস্কোপ ঝুলছে। তাঁকে দেখেই ডাক্তার ঘটক বললেন, 'আসুন, আসুন, ডাক্তার দাস। এই হল ডাক্তার নবারুণ গুপ্ত। যার কথা আপনাকে বলেছিলাম।

নবারুণ হাতজোড় করে নমস্কার জানাল তাঁকে। তিনিও প্রতি নমস্কার জানালেন। ডাক্তার ঘটক এরপর ডাক্তার দাসকে প্রশ্ন করলেন, 'পেশেন্ট দু'জনকে কেমন দেখলেন?'

ডাক্তার দাস জবাব দিলেন, 'দেখার তো বিশেষ কিছু নেই। নর্মাল কেস। তবে বুড়োটার প্রেশার একটু ওঠা নামা করছে। ওকে একটা ওষুধ দিলাম। আর পেশেন্ট পার্টিরা এসেছিল। আমি তাদের বলে দিয়েছি যে আর তিনদিনের মধ্যে তাদের পেশেন্ট নিয়ে যেতে হবে এখান থেকে। বুড়োটার বাড়ির লোক অবশ্য একটু গররাজি ছিল। বুড়োটাকে নার্সিংহোমে ফেলে রেখে ঝঞ্ঝাট এড়াতে চায় তারা। তবে শেষ পর্যন্ত তারা রাজি হয়েছে।'

কথাটা শুনে ডাক্তার ঘটক বললেন, 'বাঃ বেশ। আজ মঙ্গলবার। রবিবার কালীপুজো। শুক্রবারে মধ্যে পেশেন্ট দু'জনকে সরিয়ে দিতে হবে। নর্মাল কেস হলেও কিছু চিন্তা তো এদের জন্য আমার থাকেই। ওদিকে নতুন নার্সিংহোমটা ওপেন না হওয়া পর্যন্ত আমার যা চাপ যাচ্ছে তা তো আপনি জানেনই। এই পেশেন্ট দু-জন চলে গেলে আমার মেন্টাল রিলিফ হয়।'

ঘড়ি দেখলেন ডাক্তার দাস। তারপর বললেন, 'সাতটায় কিন্তু নতুন নার্সিংহোমে সেই এক্স-রে কোম্পানির টেকনিশিয়ানদের আসার কথা আপনার খেয়াল আছে তো?'

কথাটা শুনে ডাক্তার ঘটক মৃদু চমকে উঠলেন। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দেখেছেন, ব্যাপারটা একদম খেয়াল ছিল না। চলুন, চলুন।'

ডাক্তার ঘটকের চেম্বার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল তিনজন। নবারুণ বাইরের গেট পর্যন্ত এল তাঁদের সঙ্গে। গেটের বাইরে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে

BanglaBook.org

আছে। ডাক্তার ঘটকের 'এসইউভি' আর ডাক্তার দাসের একটা পুরোনো ফিয়েট। ননীগোপাল গেট খুলে দিল। বাইরে বেরোবার সময় ডাক্তার ঘটক বললেন, 'কাল সকালে আসব। তোমার ইচ্ছা হলে পেশেন্ট দুজনকে দেখে আসতে পারো। সময় কাটবে।'

ডাক্তার দাসও হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, দেখে আসুন ওদের দুজনকে।'

দুজন দুটো গাড়িতে উঠে রওনা হয়ে যাবার পর নবারুণ আবার নার্সিংহোমের ভিতরে ঢুকল। তার কোনও কাজ নেই। হ্যাঁ, সেই দুজন পেশেন্টকে দেখে আসা যেতে পারে।

ভিতরে ঢুকে সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল দোতলায়। কাঠের আর প্লাইউডের পার্টিশন দেওয়া ছোট ছোট কেবিন। তার একটার সামনে বসেছিল একজন আয়া। অন্যজন বাড়ি চলে গেছে। নবারুণকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে সে প্রথমে তাকে নিয়ে প্রবেশ করল সামনের কেবিনটাতে। সেখানে বেডে শুয়ে আছেন এক বৃদ্ধ। বয়স আশির ওপরেই হবে। বিছানা থেকে নেমেছে ক্যাথিটারের নল। শূন্য দৃষ্টিতে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে আছেন বৃদ্ধ। নবারুণ তাঁর বেডের পাশে দাঁড়াল। নবারুণকে দেখিয়ে আয়া বৃদ্ধের উদ্দেশে বলল, 'ইনি আমাদের নতুন ডাক্তারবাবু। আপনাকে দেখতে এসেছেন দাদু।' তার কথায় বৃদ্ধ কী বুঝল কে জানে! তিনি শুধু একইভাবে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আমি কবে বাড়ি যাব?'

নবারুণ জবাব দিল, 'আর দু-দিনের মধ্যেই।'

বৃদ্ধ আর কোনও কথা বললেন না। আয়া বলল, 'উনি খালি একই কথা বলেন।'

ওই ঘরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আয়ার সঙ্গে পাশের কেবিনে ঢুকল নবারুণ। মাঝবয়সি একজন শুয়ে আছে বেডে। ডানপায়ে প্লাস্টার, ট্রাকশন। একটা খবরের কাগজ পড়ছিল সে। আয়া নবারুণের পরিচয় দিল তাকে। নবারুণ তাকে জিগোস করল, 'কীভাবে পা ভাঙলেন?'

লোকটা জবাব দিল, 'বাইক অ্যাক্সিডেন্টে।'

তারপর সে বলল, 'আমি আবার বাইক চালাতে পারব তো ডাক্তারবাবু? আমি একটা সার কোম্পানিতে চাকরি করি। বাইক নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হয়। বাইক না চালাতে পারলে পেট চলবে না।'

নবারুণ অর্থপেডিক নয়। তবু সে তার মনোবল বাড়াবার জন্য বলল,

BanglaBook.org

'পারবেন। তবে একটু সময় লাগবে।'

তার কথা শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হল লোকটা।

পেশেন্ট দুজনকে এক ঝলক দেখা হয়ে গেল নবারুণের। তাদের বিশেষ কিছু করার নেই। আয়া রয়ে গেল সেখানেই। নবারুণ এগোল নীচে ফেরার জন্য। প্যাসেজ দিয়ে এগিয়ে দোতলার সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ এসে নীচে নামতে যাচ্ছিল সে। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। তিনতলার সিঁড়ি উঠে গেছে ওপর দিকে। একটা চাপা কান্নার শব্দ যেন ভেসে এল ওপর থেকে। কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। তারপরেই শব্দটা থেমে গেল।

নবারুণের হঠাৎ মনে পড়ে গেল বিকেলবেলা পিছনের জমিটা থেকে ফেরার সময় একজনকে জানলা বন্ধ করতে দেখেছিল সে। তবে তিনতলায় কি কেউ থাকে? সে কি পেশেন্ট? নাকি অন্য কেউ? ডাক্তার ঘটক তো বললেন, যে দুজন পেশেন্টকে সে এখন দেখে এল তারা ছাড়া অন্য কোনও পেশেন্ট নেই নার্সিংহোমে। তাহলে কি সে ভুল শুনল শব্দটা? নারীকণ্ঠের কান্নার শব্দই তো যেন কানে বাজল তার! কথাটা ভাবতে ভাবতে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে শুরু করল সে।

তিন

ভোর ছটা নাগাদ ঘুম ভাঙল নবারুণের বিছানা ছেড়ে উঠে বাথরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে জানলা খুলল সে। একরাশ আলো ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। বাইরে সকালের আলোতে ঝলমল করছে মাঠটা। তার জানলার কিছুটা তফাতে মাঠ থেকে পোকা খুঁটে খাচ্ছে একদল ছাতারে পাখি। অন্য বেশ কয়েকটা পাখির ডাকও ভেসে আসছে পিছনের জমিটা থেকে। বহুদিন পর রাতে ভালো ঘুম হয়েছে নবারুণের। না, কোনও দুঃস্বপ্ন সে দেখেনি। বেশ একটু চনমনে লাগছে মনটা। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েও বেশ ভালো লাগল তার। ঘর থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করল জমিটার শেষ প্রান্তের দিকে। হাঁটতেও বেশ ভালোই লাগছে নবারুণের। সূর্য উঠলেও বাতাসে ঠান্ডা মেজাজ আছে একটা।

হাঁটতে হাঁটতে সে পৌঁছে গেল জমিটার শেষ প্রান্তে। আর তখনই দেখতে

BanglaBook.org

পেল তাঁকে। সেই গাছের দঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে সূর্যালোকে এসে দাঁড়ালেন তিনি। টকটকে ফর্সা রং, তীক্ষ্ণ নাসা, উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি, শ্মশ্রুমণ্ডিত এক পুরুষ। তাঁর মাথার দীর্ঘ কেশরাশি কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে, রক্তাম্বরে আবৃত সারা দেহ, গলায় রক্ত-রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে একটা বেশ বড় সিঁদুরের ফোঁটা। তাঁকে দেখে নবারুণের মনে হল তাঁর বয়স মনে হয় প্রৌঢ়ত্বের সীমানায়, তবে দেহ এখনও নির্মেদ। শালগাছের মতো ঋজু। অঘোরবাবা! অঘোর তান্ত্রিক!

তিনি তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছেন নবারুণের দিকে। এমনিতে কোনও দিন কোনও সাধুসঙ্গ করেনি নবারুণ। সাধু-সন্ন্যাসী-দেব-দ্বিজে খুব একটা বিশ্বাস করে না সে, তবে অশ্রদ্ধাও সে করে না কাউকে। তাই সে হাতজোড় করে নমস্কার জানাল অঘোরবাবার উদ্দেশে।

নবারুণ তাঁকে নমস্কার জানাতে তিনিও তাঁর ডান হাতটা একটু ওপরে তুললেন আশীর্বাদের ভঙ্গিতে। তারপর স্মিত হেসে বললেন, 'এতদিন খুব বিপদের মধ্যে ছিলে তুমি। হাসপাতাল, মর্গে ঘোরাঘুরি করতে তো। অতৃপ্ত প্রেতাত্মার দৃষ্টি পড়েছিল তোমার ওপর। শহরে থাকলে আরও ক্ষতি হত তোমার। বাঁচতে না। সে তোমাকে ছাড়ত না। তোমার পিছু ধাওয়া করে সে এই প্রাচীরের দরজা পর্যন্ত এসে ফিরে গেছে। আমার বন্ধন দেওয়া আছে এ জায়গাতে। তাই সে ভিতরে ঢুকতে পারেনি। সে আর আসবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে তোমার। নাম-যশ-অর্থ সব-ই হবে।'

প্রেতাত্মা বা এসব ব্যাপারে কোনও বিশ্বাস নেই নবারুণের। আর তার অতীতের দুর্ঘটনার কথাটা হয়তো ডাক্তার ঘটক-ই বলেছেন তাঁকে। অঘোরবাবার কথা শুনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল নবারুণ।

সম্ভবত তার মনের ভাব পাঠ করেই সন্ন্যাসী বললেন, 'কী ভাবছ, অম্বরীশ আমাকে বলেছে তোমার বিপর্যয়ের কথা? না, সে আমাকে কোনও কথাই বলেনি। তাকে জিগ্যেস করে দেখতে পারো।'

নবারুণ তাকাল তাঁর চোখের দিকে। সে কী জবাব দেবে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

তান্ত্রিকের ঠোঁটের কোণের হাসিটা এবার যেন একটু চওড়া হল। তিনি আর কোনও কথা বললেন না নবারুণের উদ্দেশ্যে। শুধু সামনের গাছটার মাথার দিকে তাকিয়ে হাঁক দিলেন, 'কুহকিনী?'

BanglaBook.org

একটা খচর খচর শব্দ হল গাছটার পাতায়। তারপর পাতার আড়াল থেকে একটা প্রাণী গুঁড়ি বেয়ে নেমে এসে দাঁড়াল অঘোরবাবার পায়ের কাছে। বেশ বড় আর কুচকুচে কালো একটা বেড়াল। এই বড় আর কালো বেড়াল সাধারণত চোখে পড়ে না। তান্ত্রিক সন্ন্যাসী মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে কোলে তুলে নিলেন বেড়ালটাকে। তারপর ধীরে ধীরে হেঁটে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

নবারুণ এবার ফেরার পথ ধরল। বাড়িটার কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ তার চোখ পড়ল তিনতলার দিকে। কাচের শার্শি দেওয়া সার সার জানলাগুলো বন্ধ থাকলেও একটা ঘরের জানলার পাল্লা খোলা। সম্ভবত ওই জানলাটাই গতকাল বিকেলে বন্ধ হতে দেখেছিল সে। নীচ থেকে সেই ঘরের ভিতর কেউ আছে কি না বুঝতে পারল না নবারুণ। সে নার্সিংহোমের ভিতর ঢুকল।

ঠিক সেই সময় ডাক্তার ঘটকের গাড়িটা মাঠে ঢুকে এগোলো অঘোরবাবার ঘরের দিকে। নবারুণ নিজের ঘরে না ঢুকে প্যাসেজ দিয়ে এগিয়ে এসে বসল নার্সিংহোমের বাইরের দিকের রিসেপশনে। সেখান থেকে নার্সিংহোমের বাইরের বড় রাস্তাটা দেখা যায়, গাড়ি চলাচল দেখা যায়, আর কেউ যদি আসে তবে তার সঙ্গে কথা বললেও কিছুটা সময় কাটবে। সব ভেবেই সেখানে এসে বসল সে। সকাল সাড়ে আটটায় একটা লোক এলও ঠিক-ই, কিন্তু সে পেশেন্ট পার্টির লোক। নবারুণের সঙ্গে কথা না বলে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। তার কিছুক্ষণ পর অবশ্য ডাক্তার ঘটক তাঁর গুরুদেবের সাক্ষাৎ সেরে ফিরে এলেন। রিসেপশনে ঢুকে তিনি নবারুণকে দেখেই বললেন, 'কী ঘুম কেমন হল? নতুন জায়গাতে কোনও অসুবিধা হয়নি তো?'

নবারুণ উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দিলে, 'না স্যার, কোনও অসুবিধা হয়নি। বরং অনেকদিন পর যেন নিশ্চিন্তে ঘুমোলাম।'

ডাক্তার ঘটক একটা চেয়ার টেনে নিয়ে নবারুণের পাশে বসতে বসতে বললেন, 'বলছি তো কদিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

এরপর তিনি হেসে বললেন, 'আরে আমি অঘোরবাবার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ করাবার আগেই তো তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল তোমার! তাঁর সঙ্গেই দেখা করে এলাম আমি। উনি তোমাকে কী বলেছেন জানি না,

BanglaBook.org

কিন্তু তোমার অতীতের সব কথা তিনি আমাকে গড়গড় করে বলে গেলেন। এমনকী মালবিকার অবসাদে আত্মহত্যা করার ঘটনাটাও!'

হঠাৎ এভাবে মালবিকার কথা উঠে আসতেই মুহূর্তের মধ্যে বিষণ্ণ হয়ে গেল নবারুণের মুখটা। ব্যাপারটা ধরতে পেরে ডাক্তার ঘটক বললেন, 'সরি। আমি বুঝতে পারছি তোমার মনের অবস্থা। ওর কথাটা তোলা আমার ঠিক হয়নি। তবে গুরুদেব যখন আছেন তখন একদিন দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

নবারুণ মালবিকার ভাবনাটা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বলল, 'না, না, ঠিক আছে। তা অঘোরবাবা কি প্রতিবছর এখানে আসেন?'

ডাক্তার ঘটক বললেন, 'বছর দশেক আগে আমি যখন কলকাতার চাকরিটা ছেড়ে এখানে আসি তখন তিনি একবার এসেছিলেন ওই তন্ত্রবৃক্ষগুলো নিয়ে তা রোপণের জন্য। মাঝে কয়েকবারও তিনি এখানে এসেছেন। গত তিনবছর ধরে তিনি প্রতিবছর আসেন এখানে, এ সময়। তারপর কালীপুজোর দিন আবার ফিরে যান। আমার উন্নতির জন্য যজ্ঞ করেন তিনি। তাঁর কৃপাতেই তো সব।'

নবারুণ বলল, 'তন্ত্রবৃক্ষ মানে ওই যে জমিটার পিছনে যে গাছগুলো আছে সেগুলো? ওখানে একটা বেদিও আছে দেখলাম। তন্ত্রবৃক্ষ মানে?'

ডাক্তার ঘটক জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, ওই বেদিতেই যজ্ঞ করেন তিনি। পাঁচটা তন্ত্রবৃক্ষ আছে ওখানে। বট-অশ্বত্থ, ঘোড়া নিম, হরীতকী আর পাকুড়।'

নবারুণ কৌতূহলী হয়ে আবার জানতে চাইল 'তন্ত্রবৃক্ষ' মানে?

ডাক্তার ঘটক বললেন, 'মানে তন্ত্রমতে ওদের চারা প্রস্তুত করা হয়।'

'কীভাবে?'

নবারুণের এ-প্রশ্নর জবাবে মুহূর্ত খানেক চুপ করে থেকে ডাক্তার ঘটক একটু ইতস্তত করে বললেন, 'এ সব তন্ত্রসাধনা, ডাকিনী সাধনার গূঢ়কথা। তোমার শুনতে ভালো লাগবে কি না জানি না। অন্য কেউ হলে প্রশ্নের জবাব দিতাম না। তুমি বলেই বলছি। ব্যাপারটা কাউকে বোলো না। নদীর পাড়ে লাশ ভেসে আসে জানো তো? বিশেষত বড় বড় নদীতে। নদী থেকে প্রথমে সংগ্রহ করতে হয় অপঘাতে মৃত অথচ বিকৃতিহীন কোনও ষোড়শী মেয়ের টাটকা লাশ। তন্ত্র সাধনার মাধ্যমে প্রথমে সে-লাশে তার

BanglaBook.org

আত্মাকে ফিরিয়ে আনতে হয়। তারপর বিশেষ প্রক্রিয়ায় তার দুই অক্ষি-কোটরে, মুখগহ্বরে, নাভিতে, যোনিতে প্রোথিত করতে হয় আঙুল সমেত পঞ্চতন্ত্র বৃক্ষের চারা। আঙুলের মতো আকার তখন তাদের। ওই মৃতদেহের-ই দেহরস সংগ্রহ করে ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করে চারাগাছগুলো। একসময় যখন দেহের মাংস মাটির সঙ্গে মিশে যায় তখন কঙ্কালের ভিতর থেকে উঁকি মারতে থাকে লকলকে চারাগাছগুলো। তখন তাদের সেখান থেকে তুলে এনে সাধনার স্থানে বসানো হয়। এ গাছগুলো গুরুদেব এনেছিলেন বেনারসের হরিশচন্দ্র ঘাট থেকে। সেখানেই নাকি ভেসে এসেছিল সেই মেয়ের লাশটা। অবিকৃত লাশ ছিল। বিষ প্রয়োগে মৃত্যু হয়েছিল তার।'

নবারুণ মৃদু চমকে উঠল চারাগাছ তৈরির প্রক্রিয়াটা শুনে। মনে মনে সে কল্পনা করল ঘটনাটা। ব্যাপারটা মোটেও ভালো লাগল না তার। ডাক্তার ঘটক বললেন, 'হয়তো ব্যাপারটা শুনে তোমার অস্বস্তি হচ্ছে, বিস্মিত হচ্ছ, আমারও প্রাথমিক অবস্থায় হত। কিন্তু এসব সাধনার-ই অঙ্গ। শক্তিকে জাগ্রত করার অঙ্গ।'

এসব আলোচনা আর শুনতে ভালো লাগছিল না নবারুণের। ব্যাপারটা ভাবতেই কেমন অস্বস্তি হচ্ছে তার। ডিসেকশন রুমে অনেক মৃতদেহ ঘেঁটেছে নবারুণ। কিন্তু তা সবই পড়াশোনার স্বার্থে। মৃতদেহ নিয়ে তার তেমন কোনও আলাদা অস্বস্তি নেই। কিন্তু তা বলে এমনভাবে ব্যবহার করা হবে মৃতদেহটা? প্রসঙ্গটা পালটাবার জন্য নবারুণ বলল, 'এখানে কোনও বইপত্র আছে? আমার তো কোনও কাজ নেই। তবে সেসব পড়ে একটু সময় কাটত।'

ডাক্তার ঘটক বললেন, 'এখানে কিছু মেডিকেল জার্নাল ছিল ঠিকই। কিন্তু সেসব সরিয়ে ফেলা হয়েছে অন্য জিনিসপত্রের সঙ্গে। সেগুলো কোথাও আছে ঠিকই, কিন্তু কোথায় আছে কে জানে! তবে শহরের মাঝখানে একটা বইয়ের দোকান আছে। সেখানে মেডিকেল জার্নাল পাওয়া না গেলেও সাধারণ বইপত্র-ম্যাগাজিন পাওয়া যায়। সেসব কেনার ইচ্ছা হলে কাল বা পরশু তোমাকে সময় করে নিয়ে যাব সেখানে।'

ডাক্তার ঘটক এরপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমাকে যেতে হবে এবার। আর নতুন নার্সিংহোম নিয়ে যা চাপ চলছে আমার!

BanglaBook.org

নতুন মেশিনগুলো বসছে সেখানে, ফার্নিশের কাজও বাকি। তার ওপর ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, নতুন কিছু স্টাফও নিয়োগ করতে হবে সেখানে। সব মিলিয়ে জেরবার অবস্থা। তবে সময়-সুযোগ বুঝে আমি রোজ-ই ঘুরে যাব এখানে। গুরুদেব আছেন, তাঁর জন্য তো আসতেই হবে। তার ওপর তুমিও আছ।'

উঠে দাঁড়াল নবারুণও। সে জানতে চাইল, 'নার্সিংহোমের ইনোগোরেশন কবে হবে?'

বাইরের দিকে এগোতে এগোতে ডাক্তার ঘটক বললেন, 'আজ বুধবার। রবিবার কালীপুজো। শনিবার আমার মঙ্গল কামনায়, নতুন নার্সিংহোমের আর যে বটলিংপ্লান্টটা এখানে হবে, তার মঙ্গলার্থে যজ্ঞ করাবেন গুরুদেব। রবিবার তিনি চলে যাবেন। ভাবছি সোম বা মঙ্গলবার থেকেই চালু করে দেব নার্সিংহোমটা। ওখানে যে হসপিটাল কোয়ার্টার হচ্ছে তার ইলেকট্রিকাল ওয়ারিং-এর কাজ সামান্য বাকি। আশা করছি শনিবার সকালের মধ্যেই সেখানে তোমার থাকার জন্য একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কষ্ট করে তিনটে দিন এখানে কাটিয়ে নাও।'

রিসেপশন ছেড়ে বাইরে গাড়ি পর্যন্ত ডাক্তার ঘটককে এগিয়ে দিল নবারুণ। তিনি গাড়িতে ওঠার সময় নবারুণ বলল, 'তবে আমাকে ওই বইয়ের দোকানে নিয়ে যাবেন স্যার।'

গাড়িতে উঠতে উঠতে ডাক্তার ঘটক বললেন, 'আচ্ছা, দেখা যাক কখন সময় বার করতে পারি।'

ডাক্তার ঘটক গাড়িতে উঠে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

নবারুণ আবার তার নিজের জায়গায় এসে বসল। বড় রাস্তা দিয়ে হুশহুশ করে চলে যাচ্ছে দূরপাল্লার বাস ও ট্রাকগুলো। নার্সিংহোমের ভিতরে বসে সে তাকিয়ে রইল রাস্তার দিকে। ঘণ্টাখানেক সেখানে বসে থাকার পর তার একঘেয়ে লাগতে লাগল সেসব দৃশ্য। ঘরে ফিরে গেল সে। বেলা বারোটা নাগাদ খাবার দিয়ে গেল ননীগোপাল। খাবার খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল নবারুণ।

যখন ঘুম ভাঙল তখন রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল সে। অনেক আগেই অন্ধকার নেমেছে মাঠটাতে। চাঁদও উঠেছে। তবে নখের মতো ক্ষীণ চাঁদ। আর তিনদিন পর-ই তো অমাবস্যা। ঘড়িতে সাড়ে সাতটা

BanglaBook.org

বাজে। এতক্ষণ একটানা ঘুমিয়েছে নবারুণ! নিজেই সে অবাক হয়ে গেল ব্যাপারটা দেখে। তারপর মনে মনে ভাবল যে, গত দু-বছর সে অনেক সময় রাতের পর রাত ঘুমোয়নি। দিনেরবেলা ঘুমানো তো দূরঅস্ত। হয়তো সে-ক্লান্তিই এখন পুষিয়ে নিচ্ছে তার দেহ। একদিক থেকে ব্যাপারটা তার দেহের পক্ষে ভালো। তাছাড়া ঘুমানোর ফলে তার সময়টাও কেটে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ বিছানায় বসে রইল নবারুণ। তারপর সে ভাবল, 'যাই, একবার পেশেন্ট দুজনকে দেখে আসি। আবার তো এত তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে না নিশ্চয়ই।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘর ছেড়ে বেরোল নবারুণ। রিসেপশনের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় সে উঠতে শুরু করল। দোতলার ল্যান্ডিং-এ উঠে প্যাসেজ ধরে পেশেন্ট কেবিনের দিকে এগোতে যাচ্ছিল সে। ঠিক সেইসময় ওপর থেকে যেন আবার কান্নার শব্দ ভেসে এল। অস্পষ্ট শব্দ হলেও কাঁদছে কেউ। সম্ভবত নারীকণ্ঠের শব্দ। তার মনে পড়ে গেল তিনতলার খোলা জানলার কথা। তবে কি সেখানে কোনও পেশেন্ট আছে? যার কথা তাকে বলতে ভুলে গেছেন ডাক্তার ঘটক? দোতলার পেশেন্টদের ঘরের দিকে না গিয়ে একটু কৌতূহলবশত সে উঠতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে তিনতলার দিকে।

তিনতলার প্যাসেজগুলো অন্ধকার। তবে কান্নার শব্দ অনুমান করে সে এগোল। দু-পাশে সার সার শূন্য কেবিন। তার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে সে দাঁড়াল সেই ঘরটার সামনে।

হ্যাঁ, কান্নাটা ঘরের ভিতর থেকেই আসছে। নারীকণ্ঠের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না! নার্সিংহোমটা লোকশূন্য নিঝুম বলে সে শব্দ দোতলার ল্যান্ডিং পর্যন্ত পৌঁছোয়। তবে ঘরের ভিতর আলো জ্বলছে। দরজার পাল্লাটা বন্ধ নয়, ভেজানো। মহিলা কেবিন। তাই ভিতরে ঢোকার আগে বাইরে থেকে একবার টোকা দিল নবারুণ। কান্নার শব্দ সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। ঘরের ভিতর থেকে একটা কম্পিত নারীকণ্ঠ শোনা গেল 'কে?'

নবারুণ বলল, 'আমি নার্সিংহোমের ডাক্তারবাবু। নতুন এসেছি।'

মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। তারপর ভিতর থেকে শোনা গেল, 'দরজা তো খোলাই আছে।' নবারুণ কেবিনে পা রাখল। একপাশে দেওয়াল সংলগ্ন বেডে বসে আছে একজন নারী। তাকে দেখে চমকে উঠল নবারুণ। আরে,

BanglaBook.org

এ যে মালবিকা! সেই ডাগর চোখ, পাতলা ঠোঁঠ, মাথায় ঘন কুঞ্চিত কেশরাশি, শ্যামবর্ণা ছোটখাটো দেহ! কিন্তু মুহূর্তর মধ্যেই নিজের ভুল বুঝতে পারল নবারুণ। মালবিকার সঙ্গে তার চেহারার বেশ কিছু সাদৃশ্য থাকলেও সে মালবিকা নয়। নেহাতই এক গ্রাম্য নারী। তার পরনে সস্তা দামের ছাপা শাড়ি। বিবাহিতা, সিঁথিতে অস্পষ্ট সিঁদুরের দাগ আর হাতে শাঁখা আছে।

আসলে মালবিকা তার মনকে আজও এতটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে তার সঙ্গে কারও সাদৃশ্য থাকলেই তাকে মালবিকা বলে মনে হয় নবারুণের। মালবিকার অনুপস্থিতিটা নবারুণের মন এখনও মেনে নিতে পারছে না। বেশ কিছুদিন আগে নবারুণ একবার রেল স্টেশনে এক মহিলাকে মালবিকা বলে ডাকতে যাচ্ছিল। ব্যাপারটা ধরতে পারল নবারুণ। ভালো করে বউটার দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারল তার পেটের কাছটা স্ফিত। এ নারী সন্তানসম্ভবা!

বউ বা মেয়েটা কিন্তু মালবিকার বয়সি-ই হবে। বছর তিরিশ বয়স তার। শাড়ির খুঁট দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিয়ে সে তাকাল নবারুণের দিকে। নবারুণ তাঁকে প্রশ্ন করল, 'কাঁদছেন কেন? কী হয়েছে? কোনও যন্ত্রণা হচ্ছে?'

প্রথম প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সে পালটা প্রশ্ন করল, 'তুমি আমাকে দেখতে এসেছ?'

গ্রাম্য মহিলা। তাই তার সম্ভাষণটা 'আপনি' না হয়ে 'তুমি' হল।

নবারুণও এবার তাকে তুমি করেই বলল, 'কী অসুবিধা তোমার? কবে এসেছ এখানে? কী নাম তোমার?'

সে জবাব দিল, 'শ্যামা।' তারপর বলল, 'বাচ্চা হবে আমার। ক'দিন আগেই এসেছি। এর আগেও দু-বার এসেছিলাম এখানে।'

নবারুণ আবার প্রশ্ন করে, 'কী অসুবিধা হচ্ছে তোমার?'

সে বলল, 'কিছু না।'

'তবে কাঁদছ কেন?'

শ্যামা জবাব দিল, 'অসুবিধা কিছু হয় না। তবে পেটের বাচ্চা বাঁচে না। এর আগে দু-বার এলাম এখানে। কিন্তু বাচ্চা বাঁচল না। এবার আমার বাচ্চা বাঁচবে তো?' জলভরা চোখে সে প্রশ্ন করল নবারুণকে।

BanglaBook.org

নবারুণ স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ নয়। সে সার্জেন। তাছাড়া এই মেয়েটার কী কমপ্লিকেশনস্ তা জানা নেই নবারুণের। তাই সে তার উদ্দেশে বলল, 'যে ডাক্তারবাবু তোমাকে দেখছেন তিনি নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন।'

'তাহলে তুমি কিছু বলতে পারবে না?' এই বলে শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটা। তারপর চোখে আঁচল চাপা দিল। শব্দ না করলেও নবারুণ বুঝতে পারল মেয়েটা কাঁদছে।

কিছুক্ষণ মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল নবারুণ। মহিলা কেবিন। তার ওপর বেশ রাত হয়েছে, চার চারপাশে কেউ নেই। হাসপাতালের শিশুমৃত্যুর সেই মিথ্যা দায়টা তার ওপর এসে পড়ার পর সাবধানী হয়ে গেছে নবারুণ। কখন কীসের মিথ্যে বদনাম এসে পড়ে, বলা যায় না। তাই কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে নীচে দোতলায় নেমে এল নবারুণ।

প্রথমে বৃদ্ধের ঘরে গিয়ে কিছু মামুলি কথা বলল। এতে কিছুটা সময় কাটল তার। তারপর করিডোর বেয়ে নীচে নিজের ঘরে ফেরার জন্য পা বাড়াল। সে যখন সিঁড়ি বেয়ে নামতে যাচ্ছে তখন তিনতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে একটা জিনিস দেখতে পেল। অঘোর তান্ত্রিকের সেই মিশমিশে কালো বিড়ালটা সিঁড়ি বেয়ে তিনতলার দিকে উঠে যাচ্ছে।

বিড়ালটার নামটা মনে পড়ে গেল তার! কুহকিনী! বেশ অদ্ভুত নাম! এই তান্ত্রিকটান্ত্রিকদের সব ব্যাপারই বড় অদ্ভুত হয়। এমনকী পোষ্যর নামও। কথাগুলো ভেবে আবার সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল।

চার

সারারাত মালবিকার-ই স্বপ্ন দেখেছে নবারুণ। তার ফেলে আসা সোনালি দিনগুলোর স্বপ্ন। তখন সে মেডিকেল কলেজ আর মালবিকা প্রেসিডেন্সির। কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়া, কখনও আউট্রাম ঘাটে ঘুরে বেড়াত তারা। সেই স্বপ্নই সারারাত ঘুমের মধ্যে দেখেছে সে। ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠার পরই এরপর অদ্ভুতভাবে মনে পড়ে গেল শ্যামা নামের সেই মেয়েটার কথা। নবারুণ ভাবল, ওই মেয়েটার সঙ্গে মালবিকার সাদৃশ্যের কারণেই কি সে সারারাত স্বপ্ন দেখল মালবিকার?

BanglaBook.org

হতে পারে! ঘড়ির দিকে তাকাল নবারুণ। বেলা আটটা বাজে। বেশ দেরি হয়ে গেছে তার উঠতে। ঘড়ি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই বিছানা ছেড়ে নেমে জানলা খুলে সে দেখতে পেল ডাক্তার ঘটকের গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে দূরে, সেই অঘোর তান্ত্রিকের ঘরের সামনে। নবারুণ তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে মুখ ধুয়ে নিল। বেসিনটা সেখানেই আছে। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে নেমে পড়ল মাঠে। সে দেখতে পেল সেই গাছগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ডাক্তার ঘটক আর অঘোরবাবা। নবারুণ এগোল লক্ষ করে।

নবারুণ যখন তাঁদের কাছাকাছি পৌঁছোল তখন তাঁরা গাছের দঙ্গলের ভিতরের দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন। ডাক্তার ঘটককে বলা তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর একটা কথাই শুধু তার কানে এল—'এই ডাকিনীযজ্ঞের প্রধান উপচারই হল ওই জীবন্ত ব্রহ্ম উপবীত। সেটার অভাবেই কেউ এই যজ্ঞ করতে পারে না।'

আর এরপরই সম্ভবত নবারুণের পদশব্দে ঘুরে দাঁড়ালেন তাঁরা। অঘোরবাবার কোলে সেই মিশমিশে কালো বিড়ালটা। তাকে দেখতে পেয়ে ডাক্তার ঘটক বললেন, 'আরে তুমি এসে গেছ। বাবাকে প্রণাম করো।'

সত্যি কী এই অদ্ভুত পৃথিবী! একসময় চূড়ান্ত নাস্তিক মেডিকেল কলেজের প্রফেসর ডাক্তার ঘটক এখন গুরুবাদ, তন্ত্রসাধনায় বিশ্বাসী! সত্যিই মানুষকে সময় কত পালটে দেয়! মনে মনে ভাবল নবারুণ। পা ছুঁয়ে নয়, ডাক্তার ঘটকের কথায় তন্ত্রসাধকের উদ্দেশে হাতজোড় করে নমস্কার জানাল নবারুণ।

স্মিত হাসলেন সাধুবাবা।

ডাক্তার ঘটক অঘোর সন্ন্যাসীর উদ্দেশে বললেন, 'আপনি দিব্যজ্ঞানী, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। আমি না বললেও আপনি তো সবই জানেন ওর সম্পর্কে।'

সন্ন্যাসী মৃদু হেসে বললন, 'হ্যাঁ, জানি। শিশু মৃত্যুর কলঙ্ক লেগে আছে ওর।'

ডাক্তার ঘটক সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'কিন্তু ওর কোনও দোষ ছিল না।'

অঘোর তান্ত্রিক বললেন, 'হ্যাঁ, সে-ও জানি। ওর ভবিষ্যৎ আমি দেখতে পাচ্ছি। খুব উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। তবে...'

'তবে কী?' ডাক্তার ঘটক জানতে চাইলেন।

একটু চুপ করে থেকে সেই তান্ত্রিক সন্ন্যাসী বললেন, 'আমি ললাট-লিখন পড়তে পারি। ও সেই শিশুর মৃত্যুর কারণ না হলেও ওর ললাটে নরহত্যা

BanglaBook.org

লেখা আছে।'

কথাটা শুনে চমকে উঠল দুজনেই।

নবারুণ বেশ একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বলে উঠল, 'আপনি কি এসব আগাম জানতে পারেন? এ কথা কীভাবে বলছেন?'

তিনি হেসে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ পারি। এমনকী জন্ম-মৃত্যুও।'

নবারুণ বলল, 'নিজেরটাও?'

এবার যেন গম্ভীর হয়ে গেল অঘোর সন্ন্যাসীর মুখটা। তিনি বললেন, 'না। তৃতীয়বার ডাকিনী-যজ্ঞ না করলে সে-জ্ঞান অর্জন হয় না। সেই একটা কাজ-ই শুধু বাকি। তবে তিনদিনের মধ্যেই সে-জ্ঞান করায়ত্ত হবে আমার।' এই বলে তিনি হাঁটতে শুরু করলেন তাঁর ঘরের দিকে।

তাঁর ওইভাবে চলে যাওয়া দেখে মনে হয় একটু ভয় পেয়ে গেলেন ডাক্তার ঘটক। তিনি নবারুণকে বললেন, 'একটু সাবধানে কথা বোলো ওঁর সঙ্গে। বোঝোই তো সন্ন্যাসী মানুষ। এমনিতে উনি ঠান্ডা প্রকৃতির, কিন্তু এঁরা কুপিত হলে ভয়ংকর। অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।'

নবারুণ বুঝতে পারল তার সংযত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। সে বলল, 'আচ্ছা মনে রাখব।'

ডাক্তার ঘটকের গাড়িতেই নবারুণ ফিরে এল নার্সিংহোমে। রিসেপশনেই গত দিনের মতো বসল তারা। ডাক্তার ঘটকের সঙ্গে দু-একটা কথা বলার পরই নবারুণের হঠাৎ মনে পড়ে গেল শ্যামা নামের সেই মেয়েটার কথা—।

নবারুণ বলল, 'তিনতলার ঘরে একজন মহিলা পেশেন্ট আছে আমাকে বলেননি তো?'

'প্রশ্নটা শুনেই মৃদু চমকে উঠে ডাক্তার ঘটক বললেন, 'তোমার সঙ্গে তার কীভাবে দেখা হল? সে কিছু বলেছে নাকি তোমাকে?'

নবারুণ বলল, 'কাঁদছিল মেয়েটা। সেই শব্দ শুনে দোতলা থেকে তিনতলায় ওর ঘরে গিয়েছিলাম। না তেমন কিছু বলেনি। শুধু বলল তার বাচ্চা নাকি বাঁচে না। ব্যস, এইটুকুই কথা হয়েছে।'

ডাক্তার ঘটক বললেন, হ্যাঁ, পাঁচ-ছ-মাসেই অ্যাবরশন হয়ে যায়। গত দুবার তাই হয়েছে। ওর কথা তোমাকে বলিনি কারণ ও ফ্রি-পেশেন্ট। বাড়িতে বর মারধর করে। একবার সে ওর পেটে লাথি মেরেছিল গর্ভাবস্থায়। তার থেকেই এই কমপ্লিকেশন মনে হয়। কিছুদিন আগে এসেও

BanglaBook.org

আমার হাতে পায়ে ধরে বলল, 'ডাক্তারবাবু। বর মারধর করছে। তুমি এখানে আমাকে থাকতে দাও।' আগে এখানে দু'দুবার আসার কারণে সে আমাকে চেনে। আমি তাকে না-করতে পারলাম না। ভাবলাম ঘর যখন খালি তখন থাক না। আমিই তাকে মাঝে মাঝে দেখে আসি। দেখা যাক, এবার যদি তার পেটের বাচ্চাটা বাঁচে! তবে ওর মনে হয় একটু-আধটু মাথার গণ্ডগোলও আছে। মাঝে মাঝে আবোল-তাবোল বকে। কান্নাকাটি করে। ওকে তোমার পেশেন্ট হিসাবে গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই।'

এরপর প্রসঙ্গ পালটে ডাক্তার ঘটক বললেন, 'বুঝলে, আমার ওপর এখন ভীষণ চাপ। একে তো নার্সিংহোম নিয়ে জেরবার। তার ওপর সেই মহাযজ্ঞের জন্যও নানা জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে হবে। তবে যজ্ঞটা হয়ে গেলে নিশ্চিন্ত। তোমার কপালে নরহত্যা লেখা আছে, গুরুদেবের ও-কথাটাতে কিছু মনে কোরো না। ডাক্তারের হাতে তো অনিচ্ছাকৃতভাবে কত মানুষের প্রাণ যায়। হয়তো তিনি সে-কথাই বললেন। আমাকেও তো তিনি বলেছেন যে, আমারও নাকি শীঘ্রই একটা মৃত্যুযোগ আছে। তবে ডাকিনী যজ্ঞের পর সেটা কেটে যাবে।'

ডাক্তার ঘটক যজ্ঞের জন্য জিনিসপত্র সংগ্রহের কথা বলাতে নবারুণ এরপর বলল, 'আপনার গুরুদেব আপনাকে কী একটা জীবন্ত ব্রহ্ম উপবীতের কথা বলছিলেন, সেটা কী?'

নবারুণ প্রশ্নটা করতেই গম্ভীর হয়ে গেল ডাক্তার ঘটকের মুখ। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'ব্রহ্ম উপবীতের ব্যাপারটা তন্ত্র-সাধনার গূঢ় বিষয়। এটা তোমাকে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

এরপরই তিনি হেসে বললেন, 'বুঝলে নবারুণ। অসীম ক্ষমতা-সম্পন্ন আমার এই তন্ত্রসিদ্ধ যোগীপুরুষ। নইলে কি আমার মতো ঘোর নাস্তিকও তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে! ডাকিনী হাকিনী সবাই তাঁর বশীভূত।'

এ কথা শুনে নবারুণ মৃদু হেসে বলল, 'ওঁর পোষ্য আর তার নামটাও বড় অদ্ভুত, কুহকিনী!'

ডাক্তার ঘটক কিন্তু হাসলেন না তার কথায়। তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, 'কুহকিনী' নয়, 'কুহকিনী মা' বলবে। ও আসলে এক ডাকিনী। জানো উনি মানুষের মতো কথা বলতে পারেন।'

নবারুণের কথাটা শুনে বেশ হাসি পেলেও সে সেটা প্রকাশ করল না ডাক্তার ঘটকের সামনে। কারণ, সেটা অভদ্রতা হবে। সে শুধু বিস্মিত হল

BanglaBook.org

এই ভেবে যে, ডাক্তার ঘটকের মতো মানুষও এসব আজগুবি ব্যাপারে আজকাল বিশ্বাস করেন!

এসব প্রসঙ্গ থেকে দূরে সরে গিয়ে নবারুণ এরপর বলল, 'সময় কাটছে না। বইয়ের দোকানে কবে যাওয়া যেতে পারে?'

ডাক্তার ঘটক বললেন, 'আমি তোমাকে নিজে নিয়ে যেতে না পারলেও আমার ড্রাইভার সে-জায়গা চেনে। দেখি তাকে দিয়ে তোমাকে সেখানে পাঠানো যায় কিনা?'

এরপর নবারুণের সঙ্গে মামুলি কিছু কথা বলে নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে গেলেন ঘটক স্যার।

সারা দুপুরটা জেগেই কাটাল নবারুণ। বিছানায় শুলেও ঘুম এল না তার। আবারও বার বার ঘুরেফিরে তার মনে আসছে মালবিকার কথা। আর কেন জানি অদ্ভুতভাবে তার চোখে ভেসে আসছে শ্যামা নামের সেই গ্রাম্য রমণীর কথা। চেহারার সাদৃশ্যের জন্যই কি তাকে মনে পড়ছে নবারুণের? নইলে তো তাকে মনে পড়ার তেমন কোনও কারণ নেই তার।

শেষ বিকেল পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে মালবিকার কথাই ভাবল নবারুণ। তারপর পোশাক পালটে ঘর ছেড়ে পিছনের মাঠে নেমে ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করল। মাঠের শেষ পর্যন্ত গেল সে। অঘোর সন্ন্যাসীর ঘরটা ভিতর থেকে তালা-বন্ধ। গাছগুলোর দিকে তাকাল সে। অন্ধকার জমাট বাঁধতে শুরু করেছে গাছগুলোর ভিতরের জায়গাটাতে। ফেরার পথ ধরল নবারুণ। বাড়িটাতে ঢোকার মুখে আগের দিনের মতোই তার চোখ গেল তিনতলার ঘরের জানলাটাতে। আধো-অন্ধকারে সেখানে জেগে আছে একটা মুখ। নবারুণের কেন জানি মনে হল সে যেন একবার হাত নেড়ে ডাকল তাকে। সে যখন ঘরে ফিরল তখনই অন্ধকার নামল বাইরে।

ঘরে ফিরে আসার পর কেমন যেন খচখচ করতে লাগল নবারুণের মনটা। মেয়েটা তাকে ডাকল নাকি! একসময় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল নবারুণ। দেখতে পেল ডাক্তার দাস তাঁর পেশেন্ট দেখে নার্সিংহোম থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছেন। নিস্তব্ধ নার্সিংহোম। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে সে সোজা হাজির হল তিনতলার সেই ঘরের সামনে, তারপর টোকা দিল দরজার পাল্লায়। বউটা বলল, 'ভিতরে এসো।'

আগের দিনের মতো একইভাবে বেডে বসেছিল মেয়েটা। পাশে একটা কলাই করা পাত্রে মুড়ি রাখা। নবারুণ একটু ইতস্তত করে তাকে প্রশ্ন করল,

BanglaBook.org

'তুমি কি আমাকে ওপর থেকে ডাকছিলে?'

শ্যামা নামের মেয়েটা জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

'কেন? কোনও অসুবিধা হচ্ছে?' জানতে চাইল নবারুণ।

একটু ইতস্তত করে শ্যামা বলল, 'তুমি তো নীচে থাকো। কোনও লোককে দেখেছ? রোগা, কালো একটা হাত কাটা?'

নবারুণ বলল, 'না, তেমন কাউকে দেখিনি।'

'দেখোনি?' একটু বিষণ্ণভাবে কথাটা বলল বউটা।

নবারুণ বলল, 'কে লোকটা? কাকে খুঁজছ তুমি?'

শ্যামা জবাব দিল, 'আমার বর। সেই যে দিয়ে গেল, আর এল না।' যদি সে আসে তবে আমার সঙ্গে একটু দেখা করতে বোলো।'

নবারুণ জানতে চাইলে, 'কী করে সে?'

শ্যামা বলল, 'কিছু না। লেদ কলে কাজ করত। সেখানে হাতটা গেল...।'

নবারুণকে ডাক্তার ঘটক বলছিলেন যে বর একবার নাকি মেয়েটার পেটে লাথি মেরেছিল। তারপর থেকে এই অবস্থা মেয়েটার। অথচ তাকেই দেখার জন্য মেয়েটার কত আকাঙ্ক্ষা। একটু চুপ করে থেকে নবারুণ বলল, 'ঠিক আছে, তাকে দেখলে আমি কথাটা বলব। তোমাকে আর কেউ দেখতে আসে না? তাদেরকে দিয়ে তো খবরটা পাঠাতে পারো?'

শ্যামা জবাব দিল, 'না, কেউ আসে না। এরপর সে আরও কোনও কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ যেন আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার চোখ দুটো। আর এরপর নবারুণ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে পাশ থেকে মুড়ির পাত্রটা তুলে নিয়ে সজোরে ছুড়ে মারল দরজা লক্ষ্য করে। দরজার কাছে আছড়ে পড়ে ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল সেটা। মেয়েটা কি তবে সত্যি পাগল হয়ে গেছে? ডাক্তার ঘটক তো বলেছিলেন যে মেয়েটার একটু মাথার গন্ডগোলও আছে। নবারুন পিছনে দরজার দিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। কিন্তু শ্যামা ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, 'আবার সেই অপয়া বেড়ালটা এল! প্রতিবারই-ও আসে...।'

নবারুণ জানতে চাইল, 'কোন বেড়ালটা?'

শ্যামা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'সেই কালো বেড়ালটা! এবারও আমার পেটের বাচ্চাটা বাঁচবে না।'

গ্রামাঞ্চলে বেড়ালকে মা-ষষ্ঠীর বাহন ভাবলেও বেড়াল, বিশেষত কালো বেড়াল নিয়ে নানা সংস্কার আছে। মেয়েটা হয়তো সেই সংস্কার থেকেই

BanglaBook.org

কথাগুলো বলছে। তাকে আশ্বস্ত করার জন্য নবারুণ বলল, 'এসব বেড়াল-টেড়ালে কিছু হয় না। ডাক্তারবাবুরা নিশ্চয়ই দেখবেন যাতে তোমার বাচ্চাটা ভালোভাবে জন্মায় সে ব্যাপারে।'

নবারুণের কথায় সে কোনও জবাব দিল না। একইভাবে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদতে থাকল।

নবারুণের কিছু করার নেই। সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আর তারপরই সে দেখতে পেল তাকে। কিছুটা তফাতে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে আছে সেই কালো রঙের বেড়ালটা। শুধু তার চোখদুটো জ্বলছে। অঘোর তান্ত্রিকের সেই পোষা বেড়ালটা, 'কুহকিনী!'

নবারুণ তাকে তাড়া দিতেই প্যাসেজ ধরে সিঁড়ির দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

তার পিছন পিছন নবারুণও নেমে এল দোতলায়। দোতলায় সিঁড়ির মুখে একজন আয়া দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবত তিনতলার ঘরে মেয়েটার বাটি ছোড়ার শব্দ শুনে কেবিন ছেড়ে সে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। নবারুণকে দেখে সে মৃদু বিস্মিতভাবে বলল, 'স্যার, আপনি ওপরে ছিলেন!'

নবারুণ সংক্ষিপ্ত জবাব দিল 'হ্যাঁ।' তারপর বলল, 'ওপরে বেড়াল ওঠে, আপনারা খেয়াল করেন না? ইনফেকশন হতে পারে পেশেন্টদের।'

আয়া মাথা নীচু করে জবাব দিল, 'আমরা কোনও বেড়ালকে ওপরে উঠতে দিই না। কিন্তু কুহকিনী মা তো...।'

তার অসম্পূর্ণ কথা বুঝতে অসুবিধা হল না নবারুণের। কুহকিনী মা! গুরুদেবের পোষ্য বলে কথা। তাই তাকে কেউ বাধা দেয় না। নার্সিংহোমে অবারিত দ্বার তার। নবারুণ তাই আর কোনও কথা না বলে নীচে নামার জন্য পা বাড়াল।

পাঁচ

পরদিন সকালে নবারুণ যখন বিছানা ছাড়ল তখন আটটা বাজে। ঘর থেকেই বেশ কিছু লোকজনের কথাবার্তার হালকা আওয়াজ শুনতে পেল। রিসেপশনের দিক থেকে শব্দটা আসছে। ফ্রেশ হয়ে সে যখন রিসেপশনে

BanglaBook.org

এসে পৌঁছোল তখন দেখতে পেল সাত-আটজন লোককে। পেশেন্ট-পার্টি সব। ডাক্তার দাসও সেখানে আছেন। আরও একটা লোকও সেখানে আছে। সে পেশেন্ট পার্টিদের থেকে রসিদ কেটে পাওনা বুঝে নিচ্ছে। বুড়ো আর পা-ভাঙা লোকটাকেও স্ট্রেচারে করে নীচে নামিয়ে আনা হয়েছে। তবে শ্যামা বলে মেয়েটা সেখানে নেই।

নবারুণকে দেখে ডাক্তার দাস এগিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'গুড মর্নিং। পেশেন্টদের রিলিজ করে দেওয়া হচ্ছে। এরা চলে যাওয়ার পর আপনাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম আমি। ডাক্তার ঘটক কাজে ব্যস্ত। তিনি আমাকে বলেছেন আপনাকে বইয়ের দোকানে নিয়ে যেতে। এরা চলে গেলে আমার সঙ্গে আপনি বেরিয়ে পড়বেন। আমার একটা চেম্বার আছে পথে, আমি সেখানে নেমে যাব। আমার ড্রাইভার আপনাকে বইয়ের দোকানে নিয়ে যাবে। তারপর কাজ শেষ হলে আপনাকে আবার নামিয়ে দিয়ে যাব।'

নবারুণ বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ। আসলে এখানে আমার কোনও কাজ নেই তো। খাচ্ছি আর ঘুমোচ্ছি, একদম হাঁপিয়ে উঠেছি। বই থাকলে একটু সময় কাটানো যাবে।'

ডাক্তার দাস বললেন, 'আজকের দিন-কাটটাই শুধু অসুবিধা হবে। নতুন নার্সিংহোমে আপনার থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কাল সকালে ডাক্তার ঘটক এসে আপনাকে সেখানে থাকার জন্য নিয়ে যাবেন।'

পেশেন্ট-পার্টিরা গাড়ি নিয়েই এসেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা নিজেদের পেশেন্ট নিয়ে চলে গেল। নবারুণ একবার জিগ্যেস করতে যাচ্ছিল যে, সেই মেয়েটাও চলে গেছে কি না? কিন্তু প্রশ্নটা করতে গিয়েও সে করল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই নবারুণ ডাক্তার দাস আর তার সেই সঙ্গীর সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসল।

শহরের দিকে এগোবার সময় ডাক্তার দাস নবারুণের উদ্দেশে হেসে বলল, 'আপনাকে প্রথম দিন যেমন দেখেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি ফ্রেশ দেখাচ্ছে আজ। এটা দরকার ছিল আপনার। ক'দিনের মধ্যে আপনার এমন চাপ শুরু হবে যে দেখবেন এক ঘণ্টা বিশ্রামের ফুরসত পাচ্ছেন না। নতুন নার্সিংহোমে একশোটা বেড। সে অনুসারে কাজের চাপ থাকবে।' নতুন নার্সিংহোম প্রসঙ্গে আরও কিছু টুকটাক কথা বলতে বলতে শহরে

BanglaBook.org

ঢুকল নবারুণরা।

ছোট মফস্‌সল শহর। একটু ঘিঞ্জিও বটে। রাস্তায় সাইকেল রিকশা। লোকজনের ভিড়। শহরে ঢুকে রাস্তার পাশে এক জায়গাতে নেমে গেলেন তার সঙ্গী। তারপর গাড়িটা শহরের আরও একটু ভিতরে ঢুকে তাকে নামাল একটা বইয়ের দোকানের সামনে।

দোকানে ঢুকল নবারুণ। মফস্‌সল শহরের বইয়ের দোকান। একই-সঙ্গে র‍্যাকগুলোতে পাশাপাশি শোভা পাচ্ছে পাঠ্যপুস্তক, গল্প-উপন্যাসের বই, রামকৃষ্ণ কথামৃত থেকে শুরু করে বাৎসায়ন পর্যন্ত। সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, খাতা-পেনও বিক্রি হয় দোকানটাতে। র‍্যাকগুলোর দিকে তাকিয়ে তার পছন্দের বইয়ের সন্ধান করতেই পরিচিত লেখকদের বেশ কয়েকটা গল্প-উপন্যাসের সন্ধান পেয়েও গেল নবারুণ। দোকানদারকে বইগুলো দিতে বলল।

লোকটা বইগুলো নামিয়ে বিল করতে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় সামনের র‍্যাকটাতে হঠাৎ-ই একটা বইয়ের ওপর নজর পড়ল তার। বেশ মোটা বই—'বৃহৎ তন্ত্র সাধনা।'—এ ধরনের বই রেল স্টেশনের কিয়স্কে, বাসস্ট্যান্ডে অনেকবার দেখেছে নবারুণ। কিন্তু এসব বশীকরণ, তন্ত্রসাধনা-গুপ্তবিদ্যা বইয়ের ওপর কোনওদিনই কোনও আগ্রহ ছিল না তার। থাকার কথাও নয়।

কিন্তু হঠাৎই যেন আগ্রহ হল বইটার প্রতি। হয়তো বা এ প্রসঙ্গে ডাক্তার ঘটকের কাছে নানা উদ্ভট ব্যাপার শোনার জন্যই বা তাঁর সেই তন্ত্রসিদ্ধ গুরুদেবকে দেখার জন্যই। সে এসব ব্যাপার বিশ্বাস না করলেও এই বইটা বলেই হয়তো সেই উদ্ভট ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে জানা যেতে পারে। বইয়ের কথা পড়ে চমকে দেওয়া যেতে পারে ডাক্তার ঘটককে, সবচেয়ে বড় কথা হল সময়টা কাটবে—এই ভেবে সে দোকানদারকে প্রথমে বলল তার হাতে বইটা দেওয়ার জন্য। তারপর বইটা হাতে নিয়ে একটু উলটেপালটে দেখে সে দোকানদারকে বলল, বইটা দিয়ে দিতে।

দোকানদার যেন একটু বিস্মিত হল তার কথা শুনে। অনেকদিন কোনও খবরের কাগজও পড়েনি নবারুণ। বেশ কয়েকটা দৈনিক সংবাদপত্রও কিনল সে। তারপর দোকান ছেড়ে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। কিছু সময়ের মধ্যেই সে আবার ফিরে এল তার থাকার জায়গায়।

BanglaBook.org

দুপুরটা নবারুণ চার-পাঁচটা খবরের কাগজ পড়েই কাটিয়ে দিল। একসময় বিকেল হয়ে এল। নবারুণ ভাবল পিছনের জমিটা থেকে একবার ঘুরে আসা যাক। সেইমতো কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘর ছেড়ে পিছনের জমিটাতে নামল সে। হাঁটতে হাঁটতে নবারুণ গিয়ে উপস্থিত হল জমিটার শেষ প্রান্তে। অঘোর তান্ত্রিকের ঘরটা ভিতর থেকে বন্ধ। সে এরপর এগোল গাছগুলোর দিকে। সেদিকে এগোতেই গাছের মাথায় বসে থাকা একঝাঁক কাক হঠাৎ ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠে পাক খেতে থাকল। তারপরই এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল তার। গাছের একটা গুঁড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ডাক্তার ঘটকের কুহকিনী মা। সে কামড়ে ধরে আছে একটা পাখির ডানা। সদ্য মনে হয় সেই পাখিটাকে ধরেছে সে।

ঘুঘুর মতো দেখতে একটা পাখি। হয়তো বা হরিয়াল। ডানা ঝাপটাচ্ছে পাখিটা। রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে তার ডানা থেকে। বীভৎস দৃশ্য। হয়তো বা বেড়ালটার মুখ থেকে সেই সুন্দর পাখিটাকে এখনও বাঁচানো যাবে— এই ভেবে নবারুণ মাটিতে পড়ে থাকা একটা ঢেলা কুড়িয়ে নিয়ে বেড়ালটাকে মারতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ-ই পিছন থেকে একটা কর্কশ চিৎকার শুনল সে, 'খবরদার, ওকে আঘাত করলে তোমার ক্ষতি হবে। থামো...।'

থমকে দাঁড়িয়ে পিছনে তাকাল নবারুণ। সেই অঘোর সন্ন্যাসী কখন যেন দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর চোখে স্পষ্ট অসন্তোষের ছাপ। নবারুণ তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি ক্রুদ্ধভাবে বলে উঠলেন, 'তুমি কুহকিনীকে আঘাত করতে চাইছ কেন?'

নবারুণ বলল, 'ও ওই সুন্দর পাখিটাকে মারছে। পাখিটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি।'

অঘোর তান্ত্রিক বললেন, 'কিন্তু ওটা ওর স্বাভাবিক খাদ্য।'

প্রভুকে দেখতে পেয়েই কুহকিনী ছুটে গেল অঘোর তান্ত্রিকের পায়ের কাছে। পাখিটা তখনও মৃদু ছটফট করছে। নবারুণ বলে উঠল, 'পাখিটাকে ওর মুখ থেকে ছাড়িয়ে দিন। হয়তো বা এখনও বেঁচে যাবে পাখিটা। ও মেরে ফেলবে পাখিটাকে।'

একটা অদ্ভুত হাসি এবার ফুটে উঠল অঘোর তান্ত্রিকের মুখে। তিনি বললেন, 'পাখিটাকে খাদ্য হিসাবে হত্যা করছে কুহকিনী। কিন্তু তোমার হাতে যে নরহত্যা লেখা আছে। আবারও কথাটা বলছি তোমাকে।'

BanglaBook.org

তাঁর কথা শুনে এবার স্তম্ভিত হয়ে গেল নবারুণ। সে কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। পাখিটার জীবন শেষ হয়ে এসেছিল। ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে কুহকিনীর মুখে নেতিয়ে পড়ল সে। সেই অবস্থাতেই তাঁর আদরের কুহকিনীকে কোলে নিয়ে ঘরে ফিরে গেলেন সন্ন্যাসী।

অঘোর তান্ত্রিকের কথা শুনে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নবারুণ। লোকটা কি পাগল, নাকি ওসব কথা বলে নবারুণের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছে? বেশ কিছুক্ষণ নবারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল। তারপর এগোলো বাড়িটাতে ফেরার জন্য। অন্ধকার প্রায় হয়ে এসেছে। তবে বাড়িটাতে ঢোকার সময় ওপরের দিকে জানলাটা আজ বন্ধ। নবারুণ নিজের ঘরে এসে ঢুকল।

ঠিক সেই সময় রিসেপশনের বাইরে থেকে একটা চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দ তার কানে এল। নবারুণ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এগোলো রিসেপশনের দিকে। না, ঠিক রিসেপশন নয়, রিসেপশনের বাইরে মেইন গেটের কাছে চিৎকার-চেঁচামেচি হচ্ছে। গেটটা বন্ধ। ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে গেটম্যান ননীগোপাল। আর গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে এক হাতে সেটা ধরে ঝাঁকাচ্ছে একজন। সেই লোকটাই চিৎকার করছে।

রিসেপশনের দরজার সামনে থেকে নবারুণ দেখল লোকটাকে। ক্ষয়াটে চেহারার মাঝবয়সি একটা লোক। তার একটা হাত কবজি থেকে কাটা। লোকটা টলছে। অর্থাৎ নেশা করে আছে। শ্যামা নামে মেয়েটার বলা-কথা মনে পড়ে গেল নবারুণের। তাহলে এ লোকটাই শ্যামার বর। লোকটা গেট ধরে ঝাঁকাচ্ছে আর জড়ানো গলায় বলছে, আমারই বউ, আর তার সঙ্গে দেখা হবে না। এ কেমন নিয়ম গা...।

আর ননীগোপাল বলছে, 'বলছি তো বড় স্যারের বারণ আছে। তোমাকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। তার ওপর তুমি মদ খেয়ে আছ। তুমি স্যারের সঙ্গে দেখা করো।'

হাতকাটা লোকটা বলল, 'দেখা করতে গিয়েছিলাম তো কিন্তু ঘটক ডাক্তারকে পেলাম না। অন্য সময় তো বাড়ি গিয়ে বলে যে, বউকে বাচ্চা বিয়াও! আর এখন চার দিন ধরে তার পাত্তা নেই। এদিকে টাকা যা দিয়েছিল সব শেষ...

নবারুণ কথাটা শুনে বেশ অবাক হল। ডাক্তার ঘটক এ-লোকটাকে

BanglaBook.org

সন্তানের জন্ম দিতে বলেছেন? কী বলছে লোকটা? পরক্ষণেই অবশ্য মনে হল যে, লোকটা মাতাল। নেশার ঘোরে লোকটা কী বলছে ঠিক নেই। লোকটা আবারও গেট ঝাঁকিয়ে বলে, 'ঢুকতে দাও। ঢুকতে দাও আমাকে। নিজের ইস্ত্রি, তাকে দেখতে পাব না?'

গেটম্যান ননীগোপাল কঠিন স্বরে বলল, 'না, দেব না।'

লোকটা এরপর কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'যেতে পারি। তবে কুড়িটা টাকা দাও। মাল খাব। নইলে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব আর গেট ঝাঁকাব।'

ননীগোপাল আপদটাকে বিদায় করার জন্য কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'টাকা দিলে ঠিক যাবি তো?'

হাতকাটা লোকটা সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক যাব।'

ননীগোপাল এরপর তার পকেট থেকে দুটো দশ টাকার নোট বার করে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে বাড়িয়ে দিল তার দিকে। লোকটা খপ্ করে টাকাটা নিল। যেন স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য নয়, এই টাকার জন্যই এখানে এসেছিল সে। কারণ, টাকাটা হাতে নিতেই হাসি ফুটে উঠল লোকটার মুখে। সে ননীগোপালের উদ্দেশ্যে বলল, 'বেঁচে থাকো বাবা, বেঁচে থাকো। আর ঘটক ডাক্তারকে বোলো যে, দুটো বাচ্চা তো নষ্ট হল। এবার যেন আমার একটা ছেলে হয় বাবা।'—এই বলে সে টলতে টলতে গেট ছেড়ে এগোল বড় রাস্তার দিকে।

লোকটাকে বিদায় করে পিছনে ফিরতেই ননীগোপাল দেখতে পেল নবারুণকে। সে মনে হয় আন্দাজ করল যে, নবারুণ ঘটনাটা দেখেছে। তাই সে একটু অসহায়ভাবে বলল, 'কী করব স্যার? লোকটা ভিতরে ঢুকতে চাইছিল, এদিকে বড় স্যারের কড়া হুকুম যে তিনি না-থাকলে যেন ওকে নার্সিংহোমে ঢুকতে না দেওয়া হয়। তার ওপর লোকটা গলা পর্যন্ত মদ খেয়ে আছে। ওপরে উঠে যদি সে কোনও কাণ্ড ঘটায় তবে আমার চাকরি যাবে। আমি কী করব স্যার?'

ননীগোপালের কথা শুনে নবারুণ বুঝতে পারল তার মানে মেয়েটা এখনও সেখানে আছে। হয়তো এখন সে তিনতলার একলা ঘরে বসে তার স্বামীর প্রতীক্ষা করছে। কেয়ারটেকার ননীগোপালের কিছু করার নেই। ডাক্তার ঘটকের কড়া হুকুম আছে এ-ব্যাপারে। তবে তার বর যে তাকে একেবারে ভুলে যায়নি, তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, এটা জানতে

BanglaBook.org

পারলে হয়তো কিছুটা শান্তি পাবে মেয়েটা। খবরটা তাকে দিতে পারলে ভালো হয়।

মনে মনে এ-কথা ভেবে নিয়ে নবারুণ গেটম্যানকে বলল, 'হ্যাঁ, তোমার কিছু করার নেই। তারপর দরজা ছেড়ে রিসেপশনের ভিতরে উঠে এগোলো সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ির ঠিক মুখটাতেই একটা কোলাপসিবল গেট বসানো আছে। অন্যদিন সেটা হাট করে দু'পাশে সরানো থাকে। আজ সেটা টানা। তবে তালা দেওয়া নেই। নবারুণ গেটটা খুলে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল ওপরদিকে। ঠিক সেইসময় অন্ধকার নামল বাইরে।

নবারুণ তিনতলায় উঠে ওই ঘরটার সামনে পৌঁছে গেল। আজ কিন্তু ঘরের দরজাটা ভেজানো নেই, ভেতর থেকে বন্ধ করা। দরজায় টোকা দিতেই সেই নারীর কাঁপা কণ্ঠস্বর শোনা গেল—কে? কে এসেছ?'

নবারুণ জবাব দিল, 'আমি ডাক্তার।'

নবারুণের কণ্ঠস্বর মনে হয় চিনতে পারল মেয়েটা। দরজাটা খুলে গেল তারপর। বাইরে কয়েক হাত তফাতে দাঁড়িয়ে আছে নবারুণ। শ্যামা দরজার বাইরে অন্ধকার প্যাসেজের দিকে গলা বাড়িয়ে একবার দেখে নিয়ে একটু ভয়ার্তভাবে বলল, 'ও নেই তো?' তার দৃষ্টি অনুসরণ করে নবারুণ প্যাসেজের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কে? কার কথা বলছ?'

মেয়েটা বলল, 'ওই কালো বেড়ালটা!'

নবারুণ বলল, 'না, সে এখানে নেই।'

মেয়েটা এবার তাকে তাড়া দিয়ে বলল, 'ভেতরে এসো, ভেতরে এসো।'

নবারুণ ঘরে ঢুকতেই সে সঙ্গে সঙ্গে দরজার ছিটকিনি তুলে দিল। এ ব্যাপারটাতে নবারুণের একটু অস্বস্তি হলেও সে মুখে কিছু বলল না। তবে সম্ভবত নবারুণের অস্বস্তিটা আন্দাজ করেই শ্যামা বলল, 'ওই বেড়ালটা অপয়া। ও আমার বাচ্চা খেয়েছে। ওর ভয়েই দরজা-জানলা সব বন্ধ করে বসে আছি।'

কোনও কোনও সময় ভাগাড়ে মৃত পরিত্যক্ত বাচ্চার মৃতদেহ কুকুর-বেড়াল খায় নবারুণ শুনেছে। একবার খবরের কাগজে বেরিয়েও ছিল সে ছবি। তা নিয়ে খুব হইচইও হয়েছিল। কিন্তু পেটের বাচ্চাকে বেড়াল খাবে কীভাবে, বউটার পেটে যে আছে সে তো এখনও ভূমিষ্ঠ হয়নি! শ্যামা সম্ভবত সংস্কার মতোই কথাটা বলছে মনে হয় নবারুণের। সে তাকে শান্ত

BanglaBook.org

করার জন্য বলল, 'শোনো, তোমার বর আজ একটু আগে এসেছিল তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য। কিন্তু গেটম্যান তাকে ভিতরে ঢুকতে দেয়নি। কারণ, ডাক্তার ঘটকের নিষেধ আছে আর তাছাড়া সে মদ খেয়ে আছে।'

শ্যামা তার বরের ফিরে যাবার কথাটাতে আজ যেন তেমন গুরুত্ব দিল না। সে বিড়বিড় করে বলল, 'সে-ই তো প্রতিবার ডাক্তারবাবুর কথা শুনে আমাকে জোর করে এখানে আনে। যখন ফিরিয়ে নিয়ে যায় তখন সব শেষ হয়ে গেছে। ডাক্তারবাবুর থেকে টাকা নেয় ও।'

মেয়েটার শেষের কথাটা বুঝতে না পেরে নবারুণ সে সম্বন্ধে তাকে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই কান্নায় ভেঙে পড়ল শ্যামা। 'আমাকে তুমি বাঁচাও ডাক্তার। আমার পেটের বাচ্চাকে এবারের জন্য বাঁচাও।' কথাটা বলতে বলতে হঠাৎ-ই সে জড়িয়ে ধরল নবারুণকে।

মুহূর্তের জন্য নবারুণের মনে হল তাকে যে জড়িয়ে ধরেছে সে শ্যামা নয়, সে মালবিকা। ঠিক এভাবেই সে নবারুণকে জড়িয়ে কেঁদে উঠেছিল, হাসপাতালের ঘটনাটা ঘটার পর শেষবারের জন্য যেদিন তাদের একান্তে দেখা হয়েছিল! সে-ও বলেছিল 'তুমি আমাকে বাঁচাও।' যার অন্তর্নিহিত অর্থ ছিল যে, 'তোমার কিছু হলে আমার কী হবে?'

নবারুণকে জড়িয়ে ধরে মেয়েটা কেঁদে চলেছে, 'আমাকে তুমি বাঁচাও, আমার সন্তানটাকে বাঁচাও' বলে।

বিহ্বল হয়ে পড়েছিল নবারুণও। কিন্তু সে সম্বিৎ ফিরে পেল। নার্সিংহোম জনশূন্য। বন্ধ ঘরে তাকে জড়িয়ে ধরেছে এক রমণী। কখন কী ঘটে যায় কে বলতে পারে? হয়তো এই মেয়েটাই শেষে বলল যে...। তখন মেয়েটার কথাই সবাই বিশ্বাস করবে।

কোনওরকমে আলিঙ্গনমুক্ত করে নবারুণ বাইরে বেরিয়ে এল। এবং দরজাও বন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু সেই বন্ধ, ঘরের ভিতর থেকে মেয়েটার করুণ আর্তি শোনা যেতে লাগল, 'ডাক্তার তুমি আমাকে বাঁচাও। আমার সন্তানকে বাঁচাও...।'

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে যাচ্ছিল নবারুণ। ঠিক সেইসময় সে দেখল, সেই বেড়ালটা—কুহকিনী সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে ওপর দিকে। নবারুণকে দেখে বিড়ালটা কিন্তু পিছিয়ে গেল না। বরং নবারুণের মনে হল সে একবার তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে নবারুণের দিকে তাকিয়ে পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠতে যাচ্ছিল। নবারুণের তাকে দেখে মাথাটা কেমন গরম হয়ে গেল।

BanglaBook.org

সে সপাটে একটা লাথি কষাল কুহকিনীকে লক্ষ্য করে। একটা অদ্ভুত চিৎকার করে নীচে ছিটকে পড়ল বেড়ালটা। তারপর কোথায় যেন মিলিয়ে গেল!

ঘরে ফিরে এল নবারুণ। কানে এখনও বাজছে মেয়েটার আর্তনাদ। বেশ কিছুক্ষণ সে চুপচাপ বসে রইল। একসময় খেয়াল হল, বেশ ঠান্ডা লাগছে। নবারুণ উঠে গিয়ে দাঁড়াল জানলাটা বন্ধ করার জন্য। ঠিক সেই সময় সে জানলার কিছুটা তফাতে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে-থাকা অঘোরবাবাকে দেখতে পেল। তিনি তাকিয়ে আছেন নবারুণের দিকে। তাঁর চোখ দুটো যেন জ্বলছে। মুহূর্তখানেক, আর তার পরই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন অন্ধকারের মধ্যে।

তিনি কি ঘরের ভেতর থাকা নবারুণকেই লক্ষ করছিলেন? নাকি তাঁর পোষ্যের সন্ধানে তিনি এসেছিলেন তা বুঝতে পারল না নবারুণ। রাত আটটা নাগাদ ননীগোপাল খাবার দিতে এসে বলে গেল, আপনি তো কাল স্যার চলে যাবেন। আপনি চলে যাওয়ার পর কাল থেকে তিন-চারদিনের জন্য আমারও ছুটি। বাড়ি যাব। কাল সকালের পর আবার নতুন নার্সিংহোমে দেখা হবে আপনার সঙ্গে।

রাতের খাওয়া সেরে শুয়ে পড়ল নবারুণ। কিন্তু সারারাত ধরে আবারও সে মালবিকার স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। তবে এ-রাতের স্বপ্নটা বেশ অদ্ভুত। স্বপ্নের মধ্যে সে কখনও দেখতে পেল মালবিকার মুখ, আবার কখনও শ্যামার মুখ। দুটো মুখ যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে লাগল তার স্বপ্নে।

ছয়

সাতটা নাগাদ ঘুম ভাঙল নবারুণের। তার পরও বেশ কিছুক্ষণ ধরে স্বপ্নটা অনুরণিত হতে লাগল তার মনের মধ্যে। দুটো মুখ কেমন যেন মিলেমিশে যাচ্ছে তার মনে। একসময় বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল নবারুণ। মুখ ধুয়ে মাঠে নামার সময় একবার সে তাকাল জানলাটার দিকে। পাল্লাটা খোলা। সেদিকে তাকিয়ে নিয়ে সে অন্যদিনের মতোই হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেল জমিটার শেষ প্রান্তে।

BanglaBook.org

অঘোর তান্ত্রিকের ঘরের দরজাটা বন্ধ। এরপর সে এগোল গাছে-ঘেরা জায়গাটার দিকে। পাতার ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছে বেদিটার ওপর। সেটা জল দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করেছে কেউ। বেদি সংলগ্ন জমির আগাছাগুলো পরিষ্কার করা হয়েছে। আজই তো অঘোর তান্ত্রিকের সেই মহাযজ্ঞ করার কথা। নবারুণ বুঝতে পারল সেজন্যই পরিষ্কার করা হয়েছে ওই জায়গা।

কিছুক্ষণ সেদিকে থাকার পর নবারুণ ফিরতে শুরু করল। বাড়িটার ভিতরে ঢোকার আগেই সে দেখতে পেল শ্যামাকে। জানলার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রভাতি সূর্যকিরণ এসে পড়েছে তার মুখে। নবারুণের মনে হল, ঠিক যেন মালবিকা বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। এর পরেই মনে মনে হাসল নবারুণ। না, মালবিকা আর কোনওদিন-ই ফিরবে না। তবে যাওয়ার আগে শেষ একবার মেয়েটার সঙ্গে দেখা করে তাকে ভরসা দিয়ে যাবে মনে মনে ভেবে নিল নবারুণ।

ঘরে ঢুকে তার টুকটাক যেসব জিনিস ঘরের মধ্যে ছিল তা গুছিয়ে নিয়ে স্নান সেরে তৈরি হয়ে ন'টা নাগাদ বিচসপগানে এসে দাঁড়াল। ডাক্তার ঘটক নিশ্চয়ই কিছুক্ষণের মধ্যে আসবেন। তার আগে একবার মেয়েটার সঙ্গে দেখা করে আসবে, এই ভেবে সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু সে দরজার বাইরে তাকিয়ে দেখল যে, ডাক্তার ঘটকের গাড়িটা বাইরের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ তিনি চলে এসেছেন। আর তারপরই ওপর থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন ডাক্তার ঘটক। তাঁর মুখ যেন ঈষৎ গম্ভীর। নীচে নেমে তিনি প্রথমে সিঁড়ির মুখের কোলাপসিবল গেটটা টানলেন। তারপর পকেট থেকে তালাচাবি বার করে তাতে তালা লাগালেন। নবারুণ বুঝতে পারল, তার ওপরে ওঠার পথ বন্ধ হয়ে গেল। সে বলল, 'মেয়েটাকে তো জানলায় দেখলাম। তবে তালা দিয়ে দিচ্ছেন কেন?'

ডাক্তার ঘটক কয়েক মুহূর্ত তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তাকে পালটা প্রশ্ন করলেন, 'কাল কি তুমি কুহকিনী মাকে আঘাত করেছিলে?'

নবারুণ একটু বিস্মিত হল কথাটা শুনে। তখন তার আশপাশে তো কেউ ছিল না। ব্যাপারটা তিনি জানলেন কীভাবে? একটু ইতস্তত করে

BanglaBook.org

সে জবাব দিল, হ্যাঁ। বেড়ালটা ওপরে উঠছিল। মেয়েটা খুব ভয় পায় বেড়ালটা দেখে...

নবারুণের কথা শেষ হওয়ার আগেই ডাক্তার ঘটক একটু ভর্ৎসনার সুরে বললেন, 'কাজটা তুমি ঠিক করোনি। কুহকিনী মা ফিরে গিয়ে কথাটা বলেছেন বাবাকে। তিনিই কথাটা বলেছেন আমাকে। তিনি বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তোমার ওপর। আমি তোমার হয়ে তাঁর কাছ ক্ষমা চেয়ে তাকে ঠান্ডা করেছি। নইলে ক্ষতি হত তোমার।'

ডাক্তার ঘটকের কথা শুনে হঠাৎ নবারুণের মনে পড়ে গেল গতকাল রাতের সেই দৃশ্য। জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে তার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছেন অঘোর তান্ত্রিক। তাহলে কি তিনি সে কারণেই ছুটে এসেছিলেন? ওই কালো বেড়ালটা কি সত্যি তাকে খবরটা দিয়েছিল? কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব?

ডাক্তার ঘটকের কথার কী জবাব দেবে তা বুঝে উঠতে পারল না নবারুণ। সে চুপ করে রইল।

ডাক্তার ঘটক অবশ্য এরপর নিজেকে সামলে নিলেন। মৃদু হেসে নরম গলায় তিনি প্রথমে বললেন, 'থাক, এসব ব্যাপার নিয়ে আর ভেবো না। আমি সামলে নিয়েছি ব্যাপারটা। চিয়ার আপ মাই বয়। তুমি তৈরি তো? এখনই কিন্তু আমি তোমাকে নিয়ে বেরোব। আজ আমার অনেক কাজ। আজ ভূতচতুর্দশীর রাতে ডাকিনী মহাযজ্ঞে বসবেন গুরুদেব। তার জন্য সারাদিন নানা ব্যবস্থা করতে হবে।'

এ কথা বলার পর তিনি কোলাপসিবল গেটটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তালা দিয়ে দিলাম। আমরা তো সবাই এখন চলে যাব। দিনকাল ভালো নয়, তাই দিলাম।'

নবারুণ এবার বলল, এভাবে একা একা থাকবে মেয়েটা? অন্য দুজন পেশেন্ট তো চলে গেল। ওকে ছাড়লেন না কেন?

ডাক্তার ঘটক বললেন, 'বেশিক্ষণ নয়। ঘণ্টাখানেকের জন্য মাত্র। আমি তো আবার এখানে ফিরেই আসছি। তারপর সারা দিন সারা রাত এখানে কাটাব। আর মেয়েটাকে তো ওর বর নিতে এল না। কোনও ভাটিখানায় পড়ে আছে হয়তো। দেখি আজ রাতে যজ্ঞের কাজটা মিটলে ও-ব্যাটাকে খুঁজে এনে বউটাকে তার হাতে তুলে দেব।'

BanglaBook.org

কথাটা শুনে নবারুণ বলল, 'কাল সন্ধ্যায় লোকটা এসেছিল। আপনার বারণ থাকায় ননীগোপাল তাকে ভিতরে ঢুকতে দেয়নি।'

নবারুণের কথা শুনে ডাক্তার ঘটক মৃদু বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, 'তাই নাকি! লোকটা এলে তার সঙ্গে বউটাকে ছেড়ে দিতে বলে যাওয়া উচিত ছিল আমার। আসলে লোকটা মাতাল অবস্থায় থাকে। তাই তাকে আমি না থাকলে ভিতরে ঢুকতে বারণ করে দিয়ে গিয়েছিলাম ননীগোপালকে। এর আগে লোকটা একবার অন্য পেশেন্টের কেবিনে ঢুকে ঝামেলা পাকিয়েছিল।'

এ কথা বলার পর ডাক্তার ঘটক ঘড়ি দেখে বললেন, 'এবার তোমার ব্যাগট্যাগ নিয়ে এসো। আজ আমার অনেক কাজ...'

নবারুণ আর দাঁড়াল না। সে এগোল ঘরের দিকে। ঘরে ঢুকে সে ব্যাগটা নিয়ে তাকাল জানলার দিকে। সে দেখতে পেল ননীগোপালকে। মাঠ পেরিয়ে জানলার কাছে এসে পড়েছে। লোকটা এ-কদিন খাবারের ব্যবস্থা করেছে নবারুণের। সে ইশারায় ডাকল তাকে। তারপর পকেট থেকে একশো টাকার দুটো নোট নিয়ে জানলা দিয়ে তার দিকে বাড়িয়ে বলল, 'এটা রাখো। আমি চলে যাচ্ছি। নতুন নার্সিংহোমে আবার দেখা হবে।'

ননীগোপাল খুশি হয়ে টাকাটা নিয়ে বলল, 'আপনারা বেরিয়ে যাওয়ার পর আমিও বেরোব। বড় সাহেব একটা ট্রলি-বেড সাধুবাবার ঘরে রেখে আসতে বললেন, সেটা রেখে এলাম।'

ট্রলি-বেড কেন? ও-ঘরে কি বিছানা নেই? প্রশ্নটা মনে এল নবারুণের। তবে সে প্রশ্নটা করল না ননীগোপালকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নার্সিংহোম ছেড়ে ডাক্তার ঘটকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল নবারুণ।

শহরে এসে ঢুকল নবারুণরা। পরদিন কালীপুজো। তাই বাজারে লোকজনের কেনাকাটার বেশ ভিড়। জায়গায় জায়গায় কালীপুজোর প্যান্ডেল। মাইক বাজছে। ডাক্তার ঘটক নবারুণকে নিয়ে নামলেন শহরের ঠিক প্রাণকেন্দ্রে নার্সিংহোমের সামনে।

ঝা-চকচকে বিশাল পাঁচতলা নার্সিংহোম। বেশ কয়েক কোটি টাকার প্রজেক্ট হবে। নবারুণ বিস্মিতভাবে তাকিয়ে রইল বাড়িটার দিকে। তাকে নিয়ে নার্সিংহোমের ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে ডাক্তার ঘটক বললেন, 'এসব যা দেখছ তা সবই গুরুদেবের কৃপায়। তাঁর ওপর ভরসা রাখলে একদিন

BanglaBook.org

তোমারও এমন হবে।'

নবারুণকে নিয়ে ডাক্তার ঘটক উপস্থিত হলেন বাড়ির পিছনের অংশে। ডক্টরস কোয়ার্টার্স। সার সার এসি বসানো ঘর সেখানে। কেয়ারটেকার গোছের একজন লোক এসে সেলাম ঠুকল তাঁদের সামনে। তাকে দেখিয়ে ডাক্তার ঘটক নবারুণকে বললেন, 'এ তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা করবে। কোনও চিন্তা নেই। সব বলা আছে।'

একটা ঘর খুলে দিল লোকটা। নবারুণরা প্রবেশ করল সে-ঘরে, ওয়েল ফার্নিসড্ ঘর। খাট-আলমারি সবই আছে। ঘরের সঙ্গেই একটা ছোট কিচেন আর বাথরুম। সেঘরে ঢুকে মামুলি কিছু কথাবার্তার পর ডাক্তার ঘটক বললেন, 'আমি এবার যাচ্ছি। কাল সকালে আবার দেখা হবে। আজ সারারাত যজ্ঞ হবে। সে-কাজ শেষ হলে গুরুদেবকে ভোরবেলা যাত্রা করিয়েই আমি এখানে ন'টা নাগাদ চলে আসব।'—এই বলে নবারুণের ঘর ছেড়ে, নার্সিংহোম ছেড়ে মহাযজ্ঞের প্রস্তুতির জন্য রওনা হয়ে গেলেন ডাক্তার ঘটক।

সাত

দুপুরে ঠিক সময়েই খাবার এসে গিয়েছিল নবারুণের। তারপর টানা ঘুম দিয়ে নবারুণ যখন উঠল তখন সন্ধ্যা নেমেছে। জানলার সামনে এসে দাঁড়াল নবারুণ। নার্সিংহোমের অনুচ্চ প্রাচীরের ওপাশে রাস্তায় লোক চলাচল করছে। জানলা ধরে দাঁড়িয়ে লোক চলাচল দেখতে লাগল সে। এই নার্সিংহোমেই নতুন জীবন শুরু করতে চলেছে সে। আস্তে আস্তে এখানকার রাস্তাঘাট, লোকজন সবার সঙ্গেই পরিচিত হবে। কলকাতা থেকে অনেক দূরে এখানকার জনজীবনের সঙ্গে মিশে যাবে সে। রাস্তার লোক চলাচল দেখতে দেখতে এসবই ভাবছিল নবারুণ।

একসময় আশপাশের কয়েকটা বাড়ির ছাদে প্রদীপের আলো জ্বলে উঠল। ভূতচতুর্দশীর রাত। এ-রাতে নাকি প্রেতাত্মারা জেগে ওঠে। আর তাদের দূরে সরাবার জন্যই নাকি আলো জ্বালানো হয়, এ-কথা শুনেছে নবারুণ।

এরপর কোথায় যেন ঢাক বাজতে শুরু করল। নিশ্চয়ই কাছের কোনও

BanglaBook.org

পুজো প্যান্ডেল থেকে ভেসে আসছে ওই শব্দ। কালীপুজো ব্যাপারটা মনে আসতেই নবারুণের ধীরে ধীরে আবারও মনে পড়ে যেতে লাগল দু-বছর আগের সে-রাতের ঘটনাটা। আর তার সঙ্গে মনে পড়ে যেতে লাগল মালবিকার স্মৃতি। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ নবারুণের ঘরে এসে রাতের খাবার দিয়ে লোকটা বলে গেল তার বাড়িতে কিছু কাজ আছে বলে আজ সে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে। যদি নবারুণকে কোনও কাজে বাইরে বেরোতে হয় তার জন্য সদর দরজার একটা চাবিও সে দিয়ে গেল নবারুণকে। রাতটা এই নতুন নার্সিংহোমে একলাই কাটাতে হবে নবারুণকে। পরদিন ভোরেই আবার ফিরে আসবে লোকটা।

সে চলে যাওয়ার পর আবারও যেন পুরোনো কথাগুলো ঘিরে ধরতে লাগল নবারুণকে। সে-ভাবনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নবারুণ ভাবল যে, বইগুলো একবার নেড়েচেড়ে দেখা যাক। তন্ত্রের ব্যাপার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নেই তার। দেখা যাক বইটা কী বলে? এই ভেবে বইটা নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল সে।

সত্যিই বইটার মধ্যে কিছুক্ষণের মধ্যে ডুবে গেল সে। সত্যিই কী অদ্ভুত বিষয় সব! বশীকরণ, বাণমারা, প্রেতাত্মাকে জাগানো কত কিছুর পদ্ধতি লেখা আছে সেখানে। ব্যাপারগুলো নবারুণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে না হলেও সেগুলো বেশ অদ্ভুত বলে পড়তে বেশ আগ্রহও লাগছিল। কখনও কখনও তার বেশ মজাও লাগছিল। এক জায়গায় যেমন লেখা আছে যে, শকুনির ডিম পারদপূর্ণ করে মুখে দিয়ে নির্দিষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ করলে নাকি শুক্লপক্ষের শেষ রাতে শূন্য মার্গে বিচরণ করা যায়। আবার মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে জলের ওপর হাঁটার কৌশলও লেখা আছে। বিভিন্ন যজ্ঞের জন্য, তন্ত্রসাধনার জন্য নানা উপকরণও লেখা আছে সে বইতে।

শবসাধনার জন্য নরদেহের কথা তো আছেই, আছে বিভিন্ন সাধনার জন্য ব্যবহার্য নরকরোটিসহ বিভিন্ন মানব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপচারের কথা। আছে কালো বেড়ালের হাড়, কাকের চঞ্চু, বানরের চামড়াসহ কর্তিত হাত-এসব অদ্ভুত উপকরণের কথা। মোটা বইটার পাতার পর পাতা উলটে পড়ে যেতে লাগল নবারুণ। বাইরে রাত বাড়তে লাগল। স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল রাস্তার কোলাহল।

বইটা পড়তে পড়তে একসময় একটা অধ্যায়ে এসে উপস্থিত হল

BanglaBook.org

নবারুণ। 'ডাকিনী মহাযজ্ঞ' সম্বন্ধে সেখানে লেখা আছে। এ যজ্ঞই তো আজ করতে চলেছেন ডাক্তার ঘটকের অঘোর তান্ত্রিক। ব্যাপারটা বোঝার জন্য সে উৎসাহভরে অধ্যায়টা পড়তে শুরু করল। আর সেখানেই সে পেয়ে গেল জীবন্ত 'ব্রহ্ম উপবীতে'র ব্যাপারটা। যা এ-যজ্ঞের প্রধান উপচার। যা ধারণ করে এ-যজ্ঞে বসতে হবে। আর সেটা পড়েই খাট ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বসল নবারুণ। তার কাছে মুহূর্তের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেল ব্যাপারটা। তার কানে বেজে উঠল শ্যামা নামের মেয়েটার কাতর কণ্ঠস্বর—আমাকে তুমি বাঁচাও! আমার পেটের বাচ্চাটাকে তুমি বাঁচাও...! কেঁপে উঠল নবারুণের শরীর। বইতে যা লেখা আছে তা সংগ্রহের জন্যই কি মেয়েটাকে রাখা?

মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল নবারুণের। তার চোখে খালি ভেসে উঠতে লাগল মেয়েটার মুখটা। আর তারপর সেই মুখ বদলে গেল মালবিকার মুখে। সে যেন বলছে, 'তুমি আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও...!'

তার ডাক আর সহ্য করতে পারছে না নবারুণ। সে এক সময় চিৎকার করে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, আমি বাঁচাব তোমাকে। আমি আসছি, আমি আসছি। এ ঘটনা আমি কিছুতেই ঘটতে দেব না।'

ঘর ছেড়ে পাগলের মতো ছিটকে বেরোল নবারুণ। তারপর কোনও রকমে দরজা খুলে নার্সিংহোম থেকেও। মালবিকা যে ডাকছে তাকে। নবারুণকে বাঁচাতে হবে। বাঁচাতে হবে তার পেটের বাচ্চাটাকে।

কিন্তু কীভাবে সে পৌঁছোবে সেখানে? রাত এগোরোটা বাজে। মফস্‌সলের রাত। পথঘাট সব শুনশান হয়ে গিয়েছে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে সে একসময় পেয়ে গেল এক মাতাল সাইকেল রিকশওলাকে। নবারুণ তার পকেট থেকে একটা পাঁচশো টাকার নোট বার করে দিতেই সে-জায়গায় পৌঁছে দিতে রাজি হয়ে গেল লোকটা। নবারুণ চড়ে বসল তার রিকশায়। সারা পৃথিবী যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। দু-একটা কুকুর ছাড়া কেউ জেগে নেই রাস্তায়। নবারুণ খালি লোকটাকে তাড়া দিতে লাগল। 'আরও জোরে, আরও জোরে চালাও...।'

তাড়া দেওয়া সত্ত্বেও প্রায় চল্লিশ মিনিট লেগে গেল তার সে-জায়গায় পৌঁছোতে। নার্সিংহোমের কিছুটা তফাতে তাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল রিকশটা।

BanglaBook.org

ভূতচতুর্দশীর রাত্রি। আকাশে চাঁদ নেই। একটা আবছা আলো শুধু আছে। তার মধ্যে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। নবারুণ এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল গেটের সামনে। কোনও শব্দ বাড়িটার ভিতর থেকে না এলেও ডাক্তার ঘটকের গাড়িটা অন্ধকারে মিশে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ তিনি আছেন এখানে। গেটটা সন্তর্পণে খুলে ভিতরে ঢুকল নবারুণ। রিসেপশনের দরজাও খোলা। সে ভিতরে ঢুকে দেখল সিঁড়ির মুখের কোলাপসিবল গেটটাও খোলা। তবে কি ডাক্তার ঘটক ওপরে গেছেন? আর সময় নষ্ট না করে নবারুণ দ্রুত উঠতে শুরু করল ওপরে। সে-ঘরটাতে পৌঁছে গেল নবারুণ।

কিন্তু শূন্য ঘর। সেখানে কেউ নেই। জানলাটাও খোলা। সে তাকাল বাইরের দিকে। অন্ধকারে ডুবে আছে মাঠটাও, তবে তারই মধ্যে সেই গাছের জটলার ভিতর একটা আলো দেখল সে। তার মানে হয়তো তারা সেখানেই আছে। আবার দ্রুত ফিরতে শুরু করল নবারুণ। নীচে নেমে পিছনের জমিটাতে গিয়ে প্রাচীরের গা ঘেঁষে এগোতে লাগল মাঠের শেষ প্রান্তে সেই গাছে-ঘেরা জায়গার দিকে। হ্যাঁ, আলোটা ওর ভিতর থেকেই আসছে। ইলেকট্রিক বাতি নয়, মশালজাতীয় কোনও কিছুর আলো। যজ্ঞাগ্নিও হতে পারে।

নবারুণ উপস্থিত হল জায়গাটার কাছে। সে একবার তাকাল সেই ঘরটার দিকে। দরজা বন্ধ। কিন্তু ভেতর থেকে একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ মুহূর্তের জন্য যেন কানে এল তার। ব্যাপারটা নবারুণের মনের ভুলও হতে পারে। নবারুণ গাছগুলোর কাছে গিয়ে গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে উঁকি দিল ভিতরে।

বেদির ওপর বসে আছেন অঘোর তান্ত্রিক। তাঁর দেহের নিম্নাংশে রক্তাম্বর। দেহের উর্ধ্বাংশ উন্মুক্ত। গলায়, বাহুতে রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে রক্ততিলক। তার সামনেই বেদিতে যজ্ঞাগ্নি জ্বলছে। সেই আলোই ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে গাছে-ঘেরা সেই বৃত্তাকার জায়গার মাঝে। যেখানে আগুন জ্বলছে তার চারপাশে চারটে নরকরোটি রাখা। বেদির ওপর সাজানো যজ্ঞের নানা উপকরণ। বেদির গায়েই অঘোর সন্ন্যাসীর হাতের নাগালের মধ্যেই মাটিতে প্রোথিত আছে ধারালো একটা ত্রিশূল। আর অন্যপাশে কিছুটা তফাতে আধো অন্ধকারে বসে আছে অঘোর সন্ন্যাসীর সেই কুহকিনী।

BanglaBook.org

সন্ন্যাসী মাঝে মাঝে ধুনো ছেটাচ্ছেন আগুনে। তাতে দপ্ করে জ্বলে উঠছে আগুনের শিখা। আর সেই আলোতে জ্বলজ্বল করছে প্রাণীটার চোখ দুটো। কীসের জন্য সে যেন প্রতীক্ষা করছে। সেটা কী তা বইটা পড়ে জেনে গিয়েছে নবারুণও। আলো এসে পড়েছে অঘোর তান্ত্রিকের মুখেও। তিনি মাঝে মাঝে ডান হাত দিয়ে আগুনে ধুনো ছুড়ছেন ঠিকই, কিন্তু দৃষ্টি তাঁর সেই ঘরটার দিকে। তিনিও যেন কীসের একটা প্রতীক্ষা করছেন।

তাহলে কি ওই ঘরেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে বউটাকে? শ্যামাকে? ট্রলি-বেডটা কি তার জন্যই ওঘরে পাঠানো হয়েছিল? যাতে অপারেশন টেবিলের মতো ওটাকে ব্যবহার করা যায়...।

সে গাছের আড়াল থেকে এগোতে যাচ্ছিল ঘরটার দিকে। ঠিক সেইসময় ডাক্তার ঘটক সেই ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হলেন গাছের আড়ালে থাকা ফাঁকা জায়গাটার মধ্যে। ডাক্তার ঘটকের পরনেও লুঙ্গির মতো রক্তবস্ত্র। ঊর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত। তাঁর কোলে ধরা আছে লালচে রঙের কী যেন একটা জিনিস। তাঁকে দেখেই অঘোরতান্ত্রিক উঠে দাঁড়িয়ে ব্যগ্রভাবে বললেন, 'দাও দাও। ওর মধ্যে প্রাণ থাকতেই ওকে ধারণ করতে হবে।'

শিষ্যের কাছ থেকে জিনিসটা নিয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেটা ধারণ করলেন অঘোর তান্ত্রিক। ডাকিনী যজ্ঞের প্রধান উপচার—ব্রহ্ম উপবীত।

নবারুণ দেখল, হ্যাঁ, এই উপবীতের কথাই তো লেখা ছিল সেই বইতে। মাতৃগর্ভ থেকে পাঁচ মাসের সন্তান বা ভ্রূণকে উৎপাটিত করতে হবে মায়ের সঙ্গে বাচ্চার সংযোগস্থাপনকারী নাড়ি বা কডসমেত। সেই নাড়িটাই ধারণ করতে হবে উপবীত বা পৈতের মতো। সেই সন্তানের দেহে তখনও প্রাণ থাকবে। স্পন্দিত হবে সে। তার সঙ্গে স্পন্দিত হবে সেই ব্রহ্ম উপবীত—জীবন্ত উপবীত। সেই কম্পন থেমে যাওয়ার আগেই ডাকিনী যজ্ঞের মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করতে হবে। আবির্ভাব হবে ডাকিনীর। তাকে শুধু দেখতে পাবে ব্রহ্ম উপবীতধারী। সে মনস্কাম পূর্ণ করবে তান্ত্রিকের। যজ্ঞ শেষে হোমাগ্নিতে প্রথমে সমর্পণ করতে হবে সেই উপবীত। তারপর সেই শিশুর অর্ধদগ্ধ মাংস উৎসর্গ করতে হবে কোনও কালো বেড়ালকে। এমনই কথা লেখা ছিল বইটাতে।

হ্যাঁ, ওই তো যজ্ঞের আগুনে নবারুণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সেই নাড়ি

BanglaBook.org

বা কর্ডটাকে উপবীতের মতো গলায় ধারণ করে অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসে পড়লেন অঘোর তান্ত্রিক।

এক বীভৎস দৃশ্য। তাঁর পেটের কাছে নাড়ি থেকে লকেটের মতো ঝুলছে ভ্রূণটা। শেষ মুহূর্তে স্থির হয়ে যাওয়ার আগে থরথর করে কাঁপছে সে। তার সঙ্গে স্পন্দিত হচ্ছে নাড়ি-ব্রহ্ম উপবীতটাও। তার থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ছে অঘোরবাবার সর্বাঙ্গে। মন্ত্রোচ্চারণ করতে শুরু করেছেন অঘোর তান্ত্রিক।

আকাশের দিকে লাফিয়ে উঠছে যজ্ঞের আগুন। সে-আগুনে ভয়ংকর লাগছে অঘোর তান্ত্রিকের মুখটা। তার চোখদুটো যেন জ্বলছে। জ্বলছে কুহকিনীর চোখও। লোলুপ দৃষ্টিতে সে চেয়ে আছে তার প্রভুর উপবীতের দিকে। তার সঙ্গে ঝুলতে থাকা সেই নরম লাল মাংসপিণ্ডের দিকে।

দৃশ্যটা দেখে কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন পাথর বনে গিয়েছিল নবারুণ। তার হুঁশ ফিরল একটা ভয়ংকর চিৎকারে। সেখানে ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করল এক নারী। সম্পূর্ণ উলঙ্গ সে। কৃষ্ণবর্ণ, মাথার চুল উড়ছে। সাক্ষাৎ রণচণ্ডী কালীমূর্তি যেন। তার পেটের কাছটা ফাঁক হয়ে আছে। রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে সেখান থেকে। তার এক হাতে ধরা আছে একটা স্ক্যালপল বা অস্ত্রোপচারের ছুরি। যে ছুরি দিয়ে সম্ভবত ডাক্তার ঘটক তার পেট চিরে বাচ্চাটাকে বার করে এনেছিলেন তার নাড়িসমেত।

সেই নারী চিৎকার করে বলে উঠল, 'দে, দে, আমার বাচ্চাটাকে ফিরিয়ে দে। আমি এবার আর তোদের নিতে দেব না ওকে।' আর এরপরই সম্ভবত শ্যামার চোখ গেল অঘোর তান্ত্রিকের দিকে। সন্তানকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য সে এগোতে লাগল তার দিকে। মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছেন অঘোর তান্ত্রিক। মেয়েটা বেদির উপর উঠতে যাচ্ছিল। সেসময় আটকাতে গেলেন ডাক্তার ঘটক।

কিন্তু আজ আর কোনও বাধা মানবে না সেই রণচণ্ডী নারী। ডাক্তার ঘটক তার পথ আটকে দাঁড়ালেন ঠিকই। কিন্তু সেই সন্তানহারা নারীমূর্তি প্রচণ্ড আক্রোশে তার হাতের স্ক্যালপলটা চালিয়ে দিল ডাক্তার ঘটকের কণ্ঠনালী লক্ষ্য করে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল ডাক্তার ঘটকের গলা থেকে। পিছু হটে তিনি ছিটকে পড়লেন বেদির ওপর। ছত্রখান হয়ে গেল অঘোর তান্ত্রিকের সামনে সাজিয়ে রাখা যজ্ঞের উপচারগুলো।

BanglaBook.org

অগ্নিকুণ্ড থেকে দু-একটা জ্বলন্ত কাঠও ছিটকে পড়ল এদিক-ওদিক। ব্যাপারটা দেখে কুহকিনী আতঙ্কে লাফ দিল বেদিতে উঠে প্রভুর কাছে যাওয়ার জন্য। কিন্তু সে গিয়ে পড়ল ঘিয়ের সরার উপর। পাশেই ছিল একটা জ্বলন্ত কাঠ। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন লেগে গেল কুহকিনীর ঘি-মাখা রোমশ শরীরে। একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডর মতো সে ছোটাছুটি করতে লাগল চারপাশে। এদিকে শ্যামার শরীরও অবসন্ন হয়ে এসেছে। তার চেরা পেট দিয়ে রক্ত ঝরছে। বেদিটাতে উঠতে গিয়েও সে আর উঠতে পারল না সেখানে। টলতে টলতে সে পড়ে গেল বেদির একটু তফাতে। জীবন শেষ হয়ে এসেছে তার। হাত থেকে ছিটকে পড়ল স্ক্যালপলটা।

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন অঘোর তান্ত্রিকও। একবার তিনি তাকালেন চারপাশে ছুটন্ত সেই অগ্নিগোলকের দিকে। তারপর আর্তনাদ করে উঠলেন 'কুহকিনী' বলে!

বেদি থেকে লাফিয়ে নামলেন অঘোরবাবা। তুলে নিলেন পায়ের সামনে পড়ে থাকা স্ক্যালপলটা। তারপর তিনি এগোতে থাকলেন কিছুটা তফাতে মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা মেয়েটার দিকে। যার জন্য তাঁর যজ্ঞ পণ্ড হল, তাঁর আদরের কুহকিনীর মৃত্যু হতে চলেছে, তাকে তিনি কিছুতেই বাঁচতে দেবেন না। আদিম জিঘাংসা ফুটে উঠেছে তাঁর চোখে-মুখে। নিভে যাবার আগে দপদপ করছে সেই অগ্নিকুণ্ড, বেদির ওপর পড়ে আছে ডাক্তার ঘটকের কণ্ঠনালী ছিন্ন মৃতদেহ। মৃত্যুযন্ত্রণায় চিৎকার করতে-করতে চারপাশে অগ্নিগোলকের মতো ছোটাছুটি করছে কুহকিনী, মাথার ওপরের গাছ থেকে ডানা ঝাপটে অন্ধকারে আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে ভয়ার্ত পাখির দল। সব মিলিয়ে এক বীভৎস নারকীয় পরিবেশ চারদিকে। আর অস্ত্রটা উঁচিয়ে ধরে মাটিতে পড়ে থাকা মেয়েটার দিকে এক পা-এক পা করে এগোচ্ছে এক নরপিশাচ।

উত্তেজনার বশে নবারুণ কখন যেন গাছের আড়াল থেকে বেদির কাছে চলে এসেছে খেয়াল নেই তার। তাকে খেয়াল করেননি অঘোর সন্ন্যাসী। তার দিকে পিছন ফিরে তিনি এগোচ্ছেন মেয়েটার দিকে। শেষ মুহূর্তে একবার উঠে বসার চেষ্টা করল সেই মেয়েটা। অঘোর সন্ন্যাসীর গলায় ঝুলতে থাকা তার সন্তানকে দেখতে পেয়ে সে বলে উঠল, 'দে, দে, আমার সন্তানকে ফিরিয়ে দে...!'

BanglaBook.org

অট্টহাস্য করে উঠলেন অঘোর তান্ত্রিক। বীভৎস সেই হাসি। স্ক্যালপলটা তিনি বাগিয়ে ধরেছেন তাঁর সামনের দেহটা ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার জন্য। তাঁর পৈশাচিক হাসি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গাছের প্রাচীরে। শেষ মুহূর্তে হয়তো মেয়েটা দেখতে পেয়ে গেল বেদির কাছে এসে দাঁড়ানো নবারুণকে। তাঁর উদ্দেশে সে অন্তিম আর্তনাদ করে উঠল, 'আমাকে তুমি বাঁচাও। আমার বাচ্চাটাকে তুমি রক্ষা করো।'

নবারুণ তার দিকে তাকিয়ে দেখল, আরে, মাটিতে যে পড়ে আছে সে তো মালবিকা! আর তার দিকে শ্বাপদের মতো এগোচ্ছে অঘোর তান্ত্রিক। এবার আর অপেক্ষা করল না নবারুণ। হয়তো এটা তার দৃষ্টিবিভ্রম। তবু এসব ভাবার সময় এখন আর নেই। বেদির পাশেই মাটিতে গাঁথা ছিল ত্রিশূলটা। সেটা তুলে নিল নবারুণ। অঘোর তান্ত্রিক তখন ঝাঁপাতে যাচ্ছে মাটিতে পড়ে থাকা মেয়েটার ওপর। ঠিক সেই মুহূর্তে অঘোর তান্ত্রিকের উন্মুক্ত পিঠ লক্ষ্য করে সে দেহের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে আঘাত হানল। ত্রিশূলের তিনটে ফলাই এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল অঘোর তান্ত্রিকের বুক-পিঠ। মাটির ওপর পড়ে স্থির হয়ে গেল তাঁর দেহ। এই প্রথম সজ্ঞানে মানুষ খুন করল নবারুণ।

হয়তো তান্ত্রিকের কথাই সত্যি হল। নবারুণ এরপর ঝুঁকে পড়ল সেই নারীদেহের ওপর। তবে নবারুণ এবার বুঝতে পারল সে-নারী মালবিকা নয়, সে শ্যামাই। সে-দেহেও তখন প্রাণ নেই। এরপর একটা কাজ করল নবারুণ। অন্তিম ইচ্ছাপূরণের জন্য সে তান্ত্রিকের দেহ থেকে বাচ্চার মৃতদেহটা নিয়ে পুরে দিল মায়ের জঠরে। এরপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল নবারুণ।

আগুনটা নিভে গিয়েছে। চারপাশে শুধু জমাট-বাঁধা অন্ধকার। মাঠ অতিক্রম করে একসময় নার্সিংহোমের বাইরে বড় রাস্তায় উঠে এল নবারুণ। দুটো আলোকবিন্দু দূর থেকে এগিয়ে আসছে। সেটা থামাবার জন্য নবারুণ এগোলো। কেউ কিছু জানবার আগে এ-জায়গা ছেড়ে তাকে অনেক দূরে চলে যেতে হবে।

BanglaBook.org

রোলাং

পাইনবনের মাথার ওপর তুষারধবল পর্বতশৃঙ্গের আড়াল থেকে ধীরে ধীরে ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়তে লাগল রেশমপথের ওপর। যেমন রোজ ছড়িয়ে পড়ে হাজার বছরের প্রাচীন পথের ওপর। অন্যদিন আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ড্রাম বেজে ওঠে। তার গম্ভীর শব্দ প্রতিধ্বনিত হয় আশপাশের পর্বতশৃঙ্গগুলোতে। সেই শব্দে মঠের ছোট ছোট বাচ্চারা ঘুম ভেঙে উঠে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে প্রার্থনার জন্য সমবেত হয় মঠের সামনে তুষারাবৃত চত্বরটাতে। শুরু হয়ে যায় মঠের দৈনন্দিন কাজ।

কিন্তু আজ ড্রাম বাজল না। যদিও তুষারঝড় থেমে গিয়েছে শেষ

BanglaBook.org

রাতেই, আর তারও আগে মেশিনগানের র‍্যাট...র‍্যাট শব্দ। কিন্তু বলা যায় না, আবারও হয়তো গুলি ছুটে আসতে পারে উত্তরদিকের ওই পাহাড়গুলোর মাথার ওপর থেকে।

ওটা অন্য দেশ। একসময় এ-মঠের প্রায় সবাই ওদেশেই থাকত। তারপর শরণার্থী হয়ে উপস্থিত হয়েছে এদেশে। আশ্রয় নিয়েছে এ-মঠে। তিব্বতী শরণার্থী তারা। সিল্করুট বা রেশমপথে চীন সীমান্তে ভারতীয় ভূখণ্ডে অবস্থিত এই লাকাং মঠ এখন তাদের আশ্রয়স্থল।

সারা মঠ গত রাত জেগে কাটিয়েছে দরজা-জানলা বন্ধ করে। নির্বাণের তো ঘুমোবার কোনও প্রশ্নই ছিল না। সারারাত সে আর কয়েকজন লামা মিলে কোনওরকমে ধরে রেখেছিল রবিনকে। সারারাত ধরে রবিন আপ্রাণ চেষ্টা করেছে তাদের হাত ছিটকে মঠ ছেড়ে সামনের চত্বরটায় বেরোবার জন্য। কখনও সে ধস্তাধস্তি করেছে, গালাগালি করেছে, কখনও বা বাচ্চা ছেলের মতো কান্নাকাটি করেছে তাকে মঠের বাইরের চত্বরটাতে যেতে দেওয়ার জন্য। তারপর শেষরাতের দিকে মানসিক-শারীরিকভাবে বিধ্বস্ত অবসন্ন হয়ে কেমন যেন নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছে। একদম ভেঙে পড়েছে সে।

ভোরে আলো ফোটার পর নির্বাণরা যে-ঘরে আছে তার জানলাটা একজন লামা একটু ফাঁক করল। ঘরটার এক কোণে সিলিং-এর দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে আছে রবিন। নির্বাণ জানলার কাছে গিয়ে তাকাল বাইরের চত্বরটার দিকে। বরফাবৃত চত্বরটার ঠিক মাঝখানে যেখানে সেই অদ্ভুতদর্শন, বলা ভালো সেই ভয়ালদর্শন তিব্বতি দেবতার মূর্তিটা দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক তার নীচেই মাটিতে কী যেন পড়ে আছে! যদিও সেটা প্রায় বরফে ঢাকা, তবুও নির্বাণ অনুমান করল কী পড়ে আছে সেখানে। নির্বাণ চেয়ে রইল বাইরের দিকে।

গতকাল বিকেলে গ্যাংটক থেকে তারা যখন এই লাকাং মঠে এসে পৌঁছেছিল তখন তারা কেউ-ই ভাবতে পারেনি যে এক রাতের মধ্যেই এমন কোনও ভয়ংকর ঘটনা ঘটে যেতে পারে। হাজার বছরের প্রাচীন রেশমপথের অতুলনীয় সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে এই প্রাচীন তিব্বতী মঠে উপস্থিত হয়েছিল তারা। মঠাধ্যক্ষও তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। সূর্য ডোবার আগে পর্যন্ত নির্বাণরা মঠের চারপাশে ঘুরেছে, সারা মঠে

BanglaBook.org

ছড়িয়ে থাকা অদ্ভুত দর্শন মূর্তিগুলোর ছবি তুলেছে, ছোট ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে খেলেছে।

জুলিয়া তো একদম আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল এখানে এসে। যদিও এখানে আসার আগে একটা অস্বস্তিবোধ কাজ করছিল জুলিয়ার মনে। কারণ, এখানে আসার পথে একবার রেশমপথে একটা দোকানে চা খেতে গাড়ি দাঁড় করিয়েছিল নির্বাণরা। তারা এই লাকাং মঠে আসছে শুনে বৃদ্ধ তিব্বতি দোকানি তাদের বলেছিল যে হাজার বছরের প্রাচীন এই মঠ নাকি তিব্বতি তন্ত্রসাধনার পীঠস্থান। এ মঠ নাকি শবসাধনার কেন্দ্র। জুলিয়ার ভয় ছিল যে এ মঠে এলে হয়তো মৃতদেহ-টেহ দেখতে হতে পারে। কিন্তু এখানে পৌঁছে তারা অনেক ভয়াল-দর্শন মূর্তি দেখলেও কোনও মৃতদেহ দেখেনি। অথচ সেই জুলিয়া নিজেই এখন...

আলো ছড়িয়ে পড়তে লাগল মঠের চারপাশে। চারপাশে কাছে-দূরে একসময় সব কিছু স্পষ্ট হয়ে গেল। রেশমপথের পাকদণ্ডী, তার গায়ের পাইনবন, নীল আকাশের বুকে সার সার তুষারধবল পর্বতশৃঙ্গ। বাইরের দিকেই তাকিয়েছিল নির্বাণ। মাঝে মাঝেই তার চোখ চলে যাচ্ছিল সেই মূর্তিটার নীচে পড়ে থাকা জিনিসটার দিকে।

বেশ কিছু সময় আরও কেটে গেল। নির্বাণ খেয়াল করল মঠের অন্য অংশের জানলাগুলোও খুলতে শুরু করেছে। জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে থাকা লামারাও তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করছে মূর্তির নীচে পড়ে-থাকা জিনিসটাকে। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের ঘরের দরজার বাইরে খড়মের শব্দ শুনে ফিরে দাঁড়াল নির্বাণ। রবিন যাতে কোনওভাবেই ঘর থেকে গুলিবর্ষণের মধ্যে বাইরে বেরোতে না পারে সেজন্য দরজাটা বাইরে থেকেও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। দরজা খুলে গেল। ঘরে প্রবেশ করলেন মঠাধ্যক্ষ লামা পেংবু। মুণ্ডিত মস্তক, অসংখ্য বলিরেখাময় মুখ দেখে তাঁর সঠিক বয়স আন্দাজ করা যায় না। গতকাল এখানকার একজন লামা নির্বাণদের বলেছিলেন যে মঠাধ্যক্ষর বয়স নাকি একশো বছর!

তাছাড়া এখানে আরও একজন অতি প্রাচীন লামা নাকি আছেন যাঁর বয়স নাকি পাঁচশো বছর! তার নাম চোগস সাঙ। লামা চোগস সাঙ নাকি ভূগর্ভস্থ তাঁর কক্ষে থাকেন। কক্ষ ছেড়ে বাইরে বেরোন না। নির্বাণরা ব্যাপারটা বিশ্বাস না করলেও মঠাধ্যক্ষ পেংবু লামা বয়সে যে অতিবৃদ্ধ

BanglaBook.org

তা তাঁকে দেখলে বোঝা যায়। তবে সদাহাস্যময় লোকটির মুখে এখন আর হাসি নেই। রবিনের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে তিনি নির্বাণের উদ্দেশে বললেন, 'চলুন, এবার ওকে বাইরে নিয়ে যেতে হবে।'

ঘরে আরও তিনজন লামা ছিল। তারা ধরাধরি করে উঠে দাঁড় করাল রবিনকে। তারপর তাকে নিয়ে ঘর ছেড়ে, মঠের ভিতর থেকে বাইরে বেরোল তারা। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন লামা মূর্তিটার কাছে পৌঁছে গিয়ে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে জায়গাটাকে। রবিনকে নিয়ে ধীর পায়ে সেদিকে যখন নির্বাণরা এগোচ্ছে তখন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে থেকে ওপরে উঠে এল ইন্দো-টিবেটিয়ান বর্ডার ফোর্সের কয়েকজন লোকও। নির্বাণদের সঙ্গে একই সময় তারাও উপস্থিত হল মূর্তিটার নীচে। নির্বাণরা সেখানে উপস্থিত হতেই লামার দল একপাশে একটু সরে দাঁড়াল।

ইতিমধ্যে তার ওপর থেকে বরফের আবরণ সরিয়ে ফেলেছে লামারা। নির্বাণদের চোখের সামনে মাটিতে পড়ে আছে একটা দেহ—জুলিয়ার লাশ! তবে তার মুখে যন্ত্রণার কোনও চিহ্ন নেই। খোলা চোখ, তার ঠোঁটের কোণে যেন আবছা হাসির ছোঁয়াও লেগে আছে। যেন এখনই সে উঠে বসে বলবে—'গুড মর্নিং।' এমনই জীবন্ত তার দেহ! সামনে সে কিছু বোঝার আগেই মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়েছে তার জীবন। যে জন্য কোনও যন্ত্রণার ছাপ ধরা পড়েনি তার মুখে।

খুব ভালো করে দেখার পর নির্বাণ জুলিয়ার বুকের বাঁদিকে একটা যেন ছিদ্র দেখতে পেল। সম্ভবত ওই একটাই গুলি লেগেছিল তার দেহে। আর লেগেছিল একদম মর্মস্থলে। আর তাতেই মুহূর্তের মধ্যেই প্রাণহীন হয়ে যায় তার দেহ। নির্বাকভাবে সবাই চেয়ে রইল জুলিয়ার মৃতদেহের দিকে। সেদিকে তাকিয়ে যেন পাথরের মূর্তি বনে গেছে রবিন।

২

নির্বাণ পিঠের ওপর পিছন থেকেই একটা হাতের স্পর্শ অনুভব করতেই সে ফিরে তাকিয়ে দেখল ইন্দো-টিবেটিয়ান ফোর্সের একজন অফিসার ইশারায় তাকে একটু বাইরে আসতে বলছেন সামনে থেকে। নির্বাণ সরে

BanglaBook.org

এল জটলার বাইরে। নির্বাণ দেখল ভদ্রলোকের বুকের নেমেপ্লেটে লেখা আছে ডুকপা। পদমর্যাদায় লেফটেন্যান্ট। সম্ভবত এই অফিসারও জন্মসূত্রে তিব্বতি। তিনি চাপা স্বরে নির্বাণের উদ্দেশে বললেন, 'আপনি তো এই ব্রিটিশ দম্পতির সঙ্গী হয়ে এখানে এসেছেন তাই না? আমাকে গতকালই বর্ডার চেকপোস্টের লোকেরা খবর দিয়েছিল যে এক ব্রিটিশ দম্পতি আর একজন বাঙালি লাকাং মঠে গিয়েছে। আপনারা এখানে এসেছিলেন কেন?'

নির্বাণ বলল, 'আমি কলকাতা থেকে এই সিল্করুটের ছবি তুলতে এসেছিলাম। গ্যাংটকের হোটেলে আসার সময় রবিন আর জুলিয়ার সঙ্গে পরিচয়। জুলিয়ার একটা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আছে যার কাজ বিশ্বে নানা প্রান্তের শরণার্থী শিশুদের ওষুধ, খাবার ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করা। সে কাজেই ওরা এখানে এসেছিল। আমি ওদের সঙ্গী হয়ে যাই। কাল বিকেলে আমাদের গাড়ি এসে এখানে নামিয়ে দিয়ে যায়। কথা ছিল আগামীকাল আমরা আবার ফিরে যাব। কিন্তু...'

অফিসার শুনে বললেন, 'বুঝলাম। সীমান্তের ওপার থেকে যারা এমঠের ওপর গুলি চালিয়েছে তাদের এমঠের ওপর রাগ আছে কারণ, এমঠ এখন তিব্বতি শরণার্থী শিশুদের আশ্রয়স্থল বলে। মাঝে অবশ্য কয়েকমাস গোলাগুলি বন্ধ ছিল, কাল আবার হল। আমরাও অবশ্য পাল্টা জবাব দিয়েছি, কিন্তু শুধু এই মহিলার গায়েই বা গুলি লাগল কীভাবে?

নির্বাণ জবাব দিল—রাতের খাওয়া সেরে আমরা একটা ঘরে বসে গল্প করছিলাম। খোলা জানলা দিয়ে চাঁদের আলোয় বাইরেটা দেখা যাচ্ছিল। অপূর্ব দেখাচ্ছিল বাইরেটা! জ্যোৎস্না যেন চুইয়ে পড়ছিল পর্বতশৃঙ্গ থেকে। এইসময় তারই মধ্যে পেঁজা তুলোর মতো তুষারপাত শুরু হল। সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখে জুলিয়া বলল যে, সে একবার বাইরের চত্বরে বেরিয়ে ভালো করে দেখবে চারপাশের দৃশ্য। আমি আর রবিন ঘরেই রইলাম। সে ঘর ছেড়ে বেরোল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই খোলা জানলা দিয়ে আমরা দুজনেই দেখলাম যে জুলিয়া মঠের বাইরে বেরিয়ে এগোচ্ছে এক দিকে। নির্দিষ্ট জায়গাতে যখন সে পৌঁছোল ঠিক তখনই হঠাৎ পাহাড়ের মাথা থেকে খটখট শব্দ শুরু হল! ছিটকে উঠতে লাগল এই চত্বরের বরফ। আর তারপরই দেখলাম জুলিয়া পড়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হল সারা মঠ

BanglaBook.org

জুড়ে। দরজা-জানলা সব দুমদাম করে বন্ধ হতে লাগল। আমি আর রবিন যখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে মঠের বাইরে বেরোবার দরজার সামনে এলাম তখন সেই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মঠাধ্যক্ষ আর অন্য লামারা বললেন যে, কিছুতেই আর বাইরে বেরোনো যাবে না। বেরোলেই নির্ঘাত মৃত্যু। সীমান্তের ওপার থেকে মঠ লক্ষ্য করে গুলিবৃষ্টি শুরু হয়েছে! বাইরে বেরিয়ে কিছুতেই তারা মরতে দেবেন না আমাদের। এদিকে বাইরে পড়ে রয়েছে জুলিয়া। রবিন আপ্রাণ চেষ্টা করছিল বাইরে যেতে। অতিকষ্টে তাকে ঘরবন্দি করা হয়!

অফিসার বললেন, 'মৃত মহিলা বিদেশি নাগরিক। আর্মির তত্ত্বাবধানেই আমরা দেহ ফিরিয়ে নিয়ে যাব। ব্রিটিশ এম্বাসিকেও সরকার মারফত ব্যাপারটা জানাতে হবে। চলুন এবার কথা বলা যাক মঠাধ্যক্ষ আর রবিন নামের ওই ব্রিটিশ যুবকের সঙ্গে।'

কয়েক পা এগিয়ে এরপর নির্বাণ আর সেনা অফিসার গিয়ে দাঁড়াল সেই জটলার মাঝে। রবিন তখনও পাথরের মূর্তির মতো তাকিয়ে আছে তার সঙ্গিনীর মৃতদেহের দিকে। নির্বাণ আর সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অফিসার ডুকপাও তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। ডুকপা চাপা স্বরে মঠাধ্যক্ষর কানের কাছে নির্বাণের কাছ থেকে শোনা কথাগুলো বলে জানতে চাইলেন ব্যাপারটা সত্যি কি না?

সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন মঠাধ্যক্ষ। ঘটনা সম্বন্ধে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তিব্বতি বংশোদ্ভব অফিসার এবার নিশ্চিত হলেন। এরপর একটু ইতস্তত করে তিনি নিশ্চল রবিনের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আমরা সবাই খুব দুঃখিত। কিন্তু আপনার সঙ্গিনীর মৃতদেহ নিয়ে এবার ফিরতে হবে নীচে। আপনাকে আর আপনার ভারতীয় সঙ্গীকেও আমরা নীচে নিয়ে যাব। আপনার সঙ্গিনীর মৃতদেহ যাতে আপনি দেশে নিয়ে যেতে পারেন তার সব ব্যবস্থা করবে ভারত সরকার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন এ ব্যাপারে। আপনারা এদেশের অতিথি ছিলেন। কোনও অমর্যাদা হবে না আপনার বা আপনার সঙ্গিনীর মৃতদেহের।'

—এই বলে অফিসার তাঁর সঙ্গীদের উদ্দেশে জুলিয়ার মৃতদেহটা মাটি থেকে ওঠাবার ইঙ্গিত করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তা শুনে হঠাৎ-ই থরথর করে কেঁপে উঠল রবিন। তারপর তার পাশে দাঁড়ানো মঠাধ্যক্ষ বৃদ্ধ লামা

BanglaBook.org

পেংবুর দু'কাঁধ ধরে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'তোমরা শঠ—প্রবঞ্চক! মিথ্যাবাদী! তোমরা বলেছিলে যে এ-মঠে এলে আমাদের কোনও ক্ষতি হবে না। তোমাদের অনাথ শিশুদের সাহায্য করার জন্য কতদূর থেকে ছুটে এসেছিল জুলিয়া, আমরা! তার প্রতিদান এই হল? এই মূর্তিটা দেখিয়ে তুমি কাল বলেছিলে যে এই মূর্তি সবাইকে রক্ষা করে। কারও কোনও ক্ষতি হয় না এ-মঠে এলে। এ মঠ নাকি তন্ত্রসাধনার পীঠস্থান! সমস্ত অশুভ শক্তি দূরে থাকে এই মঠ থেকে! এ-মঠ আগলে রাখেন তোমাদের তন্ত্রসাধনার এই দেবতা! এর মধ্যে মৃতদেহও নাকি পুনর্জন্ম লাভ করতে পারে...'

রবিনের কথা মিথ্যা নয়। সত্যিই এই কথাগুলো গতকাল বিকেলে বলেছিলেন মঠাধ্যক্ষ পেংবু। নির্বাণও তার সাক্ষী। এই মঠ যে একদা সত্যিই তিব্বতিদের শব-সাধনার পীঠস্থান ছিল, এ কথাও নির্বাণদের তখন কথাপ্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন বৃদ্ধ মঠাধ্যক্ষ পেংবু। এরপর রবিন মঠাধ্যক্ষের কাঁধ ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'তোমরা যদি মিথ্যাবাদী না হও, তোমাদের দেবতা যদি মিথ্যা না হয় তবে বাঁচিয়ে তোলো আমার জুলিয়াকে। বাঁচিয়ে তোলো...।'

বৃদ্ধ মঠাধ্যক্ষর কাঁধ ধরে তাকে পাগলের মতো ঝাঁকাতে শুরু করল রবিন। নিশ্চুপ বৃদ্ধ লামা, তাঁর সঙ্গী অন্য লামারা, নির্বাণ, সীমান্তরক্ষী অফিসার ডুকপাও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বৃদ্ধ মঠাধ্যক্ষের কাঁধ ঝাঁকিয়ে রবিন পাগলের মতো বলে চলেছে—'অন্তত একবারের জন্য, কিছুক্ষণের জন্য তোমরা বাঁচিয়ে তোলো আমার জুলিয়াকে। তবে বুঝব তোমাদের কথা সত্যি, তোমাদের সাধনা, তোমাদের দেবতা সত্যি...।'

হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর কানে এল সবার—'না, আমাদের দেবতা মিথ্যা নয়, আমাদের সাধনা মিথ্যা নয়।' চমকে উঠে সবাই তাকাল সেই কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে। এমনকী রবিনও থেমে গিয়ে তাকাল সেদিকে। তাদের কিছুটা তফাতে কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছেন অতিবৃদ্ধ এক লামা। তাঁরও মুণ্ডিত মস্তক, লোল চর্মাবৃতদেহ, পরনে সামান্য রক্তবস্ত্র। নির্বাণ খেয়াল করল যে দীর্ঘদিন না-কাটার ফলে তাঁর হাতের নখগুলো পুরু হয়ে বাজপাখির নখের মতো বেঁকে গিয়েছে। তবে অতিবৃদ্ধ হলেও তাঁর চোখের জ্যোতিটা যেন খুব উজ্জ্বল!

BanglaBook.org

নির্বাণের মনে হল, 'এই কি তবে সেই এ মঠের অতিপ্রাচীন লামা? এই কি সেই চোগস সাঙ? মঠাধ্যক্ষসহ সবাই তাঁকে দেখামাত্রই মাথা নীচু করে দাঁড়াল।

রবিন তাঁর দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর বলে উঠল, 'পারবে? পারবে তুমি আমার জুলিয়ার প্রাণ ফিরিয়ে দিতে? অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও?'

অতিবৃদ্ধ লামা ধীর-শান্ত কণ্ঠস্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, পারব। অন্তত আজ রাতের জন্য হলেও পারব। কিন্তু তুমি এই মৃতের পুনরুত্থান সহ্য করতে পারবে তো?'

রবিন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'হ্যাঁ পারব। নিশ্চয়ই পারব। তুমি একবারের জন্য অন্তত জীবন্ত করে তোলো আমার জুলিয়াকে। দোহাই তোমার...।'

সেই অতিবৃদ্ধ লামা বললেন, 'আচ্ছা বেশ। কিন্তু একটা শর্ত আছে আমার।'

রবিন বলে উঠল, 'তোমার সব শর্ত পূরণ করতে রাজি আমি। শুধু একবারের জন্য জীবিত করে তোলো জুলিয়াকে। আমায় শেষ একবার চুম্বন করতে দাও তাকে।'

অতিবৃদ্ধ লামা বললেন, 'এক রাতের জন্য আমি জীবিত করে তুলব এই মৃত নারীকে। তবে শর্ত একটাই, তার দেহের অতি ক্ষুদ্র অংশ কিন্তু আমি রেখে দেব আমার কাছে। কাল ভোরবেলায় মৃতদেহে তুমি তা ফেরত পাবে না।'

রবিনের কথা শুনে অতিবৃদ্ধ লামার ঠোঁটের কোণে যেন আবছা হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'তবে মৃতদেহ মঠের ভিতর নিয়ে যেতে হবে।'

রবিন সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আপনি যা করতে বলবেন তাই করব। এ মৃতদেহ এখানেই থাকবে। দেখি আপনি তাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারেন কি না!'

লামা চোগস সাঙ এরপর মঠাধ্যক্ষ পেংবুর উদ্দেশে তিব্বতি ভাষায় সম্ভবত বললেন মৃতদেহটাকে মঠের ভিতর নিয়ে যাওয়ার জন্য। কারণ, তাঁর কথা শুনে মঠাধ্যক্ষ পেংবু সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অফিসার ডুকপার উদ্দেশে বললেন, 'তোমরা ফিরে যাও। কাল সকালে এসো।'

BanglaBook.org

ডুকপা নিজে জন্মসূত্রে তিব্বতি। কাজেই মঠাধ্যক্ষের আদেশের বিরোধিতা করল না হয়তো বা তার ধর্মভাবের জন্য। সে শুধু নির্বাণের উদ্দেশে বলল, 'আপনি কি আমাদের সঙ্গে নীচে ফিরে যাবেন? নাকি কাল ফিরবেন?'

নির্বাণ বলল, 'না, আমি কাল রবিন আর জুলিয়ার মরদেহের সঙ্গে নীচে নামব। আমরা একসঙ্গে এসেছিলাম, একসঙ্গেই ফিরব। রবিনের পাশে থাকাটা এখন জরুরি।'

তার জবাব পেয়ে অগত্যা মঠের সামনের চত্বর ছেড়ে নীচে নামার পথ ধরলেন সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অফিসার ও তার জওয়ানরা। অতিবৃদ্ধ লামা চোগস সাঙ তিব্বতি ভাষায় কী যেন নির্দেশ দিলেন মঠাধ্যক্ষকে। তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে মঠের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এরপর মঠাধ্যক্ষ পেংবুর নির্দেশে বরফের চাদরের ওপর থেকে কয়েকজন লামা ধরাধরি করে জুলিয়ার দেহটাকে উঠিয়ে নিয়ে এগোল মঠের ভিতরে যাওয়ার জন্য। তাদের অনুসরণ করল নির্বাণ আর রবিনসহ মঠাধ্যক্ষ। নির্বাণের সঙ্গেই হাঁটছিলেন মঠাধ্যক্ষ পেংবু। নির্বাণ তাঁকে প্রশ্ন করল, 'সত্যি কি আপনারা জীবিত করে তুলতে পারবেন এই মৃতদেহকে?'

মঠাধ্যক্ষ বললেন, 'লামা চোগস সাঙ যখন বললেন, তখন নিশ্চয়ই কাজটা করতে পারবেন তিনি। লামা চোগস সাঙ প্রেতসিদ্ধ পুরুষ। তিনি জানেন কীভাবে প্রেতাত্মাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হয় মৃতের শরীরে।'

নির্বাণ বলল, 'কীভাবে তিনি বাঁচিয়ে তুলবেন মৃতাকে?'

মঠাধ্যক্ষ বললেন, 'তিব্বতি তন্ত্রসাধনার এই পদ্ধতির নাম "রোলাং"। চোগস সাঙ মিলিত হবেন ওই মৃতদেহের সঙ্গে। তারপর মৃতদেহে আত্মা প্রবেশ করিয়ে আবার তাকে জাগিয়ে তুলবেন একরাতের জন্য।' —এ কথা বলার পর মঠাধ্যক্ষ বললেন, 'শব-সাধনার ব্যবস্থা করে দিয়েই আমরা সবাই নীচে অন্য একটা মঠে নেমে যাব। বলা যায় না, রাতে আবার গুলিবৃষ্টি হতে পারে, সীমান্তের ওপার থেকে কামানের গোলাও ছোড়া হতে পারে। তাছাড়া রাতে যখন ওই প্রেতাত্মা জীবিত হয়ে উঠবে তখন এখানে বেশি লোকের থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

তিব্বতি তন্ত্রসাধনার শবসাধনা নিয়ে নানা গল্প শোনা যায় বটে। নির্বাণও এমন গল্প কিছু শুনেছে। কিন্তু সত্যি কি মৃত মানুষের মধ্যে আবার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সম্ভব? ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না নির্বাণ। কিন্তু মুখে কিছু না বলে সে অনুসরণ করল অন্যদের।

BanglaBook.org

৩

জুলিয়ার শবদেহ নিয়ে মঠের ভিতর প্রবেশ করা হল। মঠাধ্যক্ষ রবিনকে বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই চান যে আপনার সঙ্গিনীকে জীবিত করে তুলুন লামা চোগস সাঙ? আমরা তার আয়োজন শুরু করব এখন। কিন্তু তার জন্য কিছু শর্ত মানতে হবে আপনাকে।'

রবিন আচ্ছন্নর মতো বলল, 'হ্যাঁ, মানব, মানব। শুধু জুলিয়াকে আপনারা ফিরিয়ে দিন।'

মঠাধ্যক্ষ বললেন, 'কিছু সময়ের মধ্যেই জুলিয়ার দেহ নিয়ে সাধনকক্ষে সাধনা শুরু করবেন প্রেতসিদ্ধ লামা। বাইরে থেকে দরজা ধাক্কা দিয়ে বা চিৎকার করে তাঁর ধ্যানভঙ্গ করা যাবে না। তাতে সাধক ও আপনার দুজনেরই বিপদ হতে পারে। আপনি সারাদিন এ-ঘরেই থাকবেন। আর দ্বিতীয় কথা হল, লামা চোগস সাঙ যে-জিনিসটা নেবেন সেটা ফেরত পাওয়ার কোনও চেষ্টা করবেন না। তাতে আপনার মৃত্যুও ঘটতে পারে।'

রবিন বলল, 'আমি সব মানতে রাজি আছি, সব মানতে। শুধু আপনারা ওকে একবার বাঁচিয়ে তুলুন।'

পেংবু বললেন, 'তাই হবে। আপনি ঘরে গিয়ে থাকুন। অন্ধকার নামলে যখন আপনার সঙ্গিনী জীবন্ত হয়ে উঠবেন তখন আপনি ঠিক জানতে পারবেন।'

কথাগুলো শুনে বিধ্বস্ত রবিন টলতে টলতে চলে গেল মঠের যে-ঘরে তারা রাত কাটিয়েছে সে ঘরের দিকে। আর মঠাধ্যক্ষ পেংবুর নির্দেশে জুলিয়ার মৃতদেহটাকে অন্য লামারা নিয়ে চলল সাধন কক্ষের দিকে। মঠাধ্যক্ষর সঙ্গে নির্বাণও তাদের অনুসরণ করল। বেশ কয়েকটা অলিন্দ পেরিয়ে তারা এসে প্রবেশ করল একটা ঘরে। তার সিলিং থেকে নেমে এসেছে ভয়ংকর চিত্রশোভিত নানা ধরনের প্রাচীন থাংকা বা রেশমের কাপড়। পাথর আর কাঠের দেওয়ালগুলোতে খচিত আছে তিব্বতি অপদেবতার বীভৎস সব মূর্তি।

ঘরের এক প্রান্তে একটা নীচু বেদি মতো জায়গা। তার চারপাশে

BanglaBook.org

সাজানো রয়েছে নরকরোটি, মানুষের হাড়গোড়। আর জমে রয়েছে যুগ যুগ যুগ ধরে জমে থাকা ধূপের ছাই।

ওই ছাইয়ের স্তূপ আর একটা অদ্ভুত গন্ধ বুঝিয়ে দিচ্ছে ও-ঘরটা বহু প্রাচীন। ঘরে ঢোকার পর মঠাধ্যক্ষ পেংবু চাপা স্বরে বললেন, 'এই ঘরটাকে কেন্দ্র করেই নির্মিত হয়েছে এই মঠ। যুগ যুগ ধরে এ-ঘরে শব-সাধনা করেছেন প্রাচীন লামারা। যাঁরা এ-ঘরে শব-সাধনা করেছেন তাদের মধ্যে এখন কেবল জীবিত আছেন লামা চোগস সাঙ। এ-ঘরে আমরা ট্যুরিস্টদের ঢুকতে দিই না। ঘটনাচক্রে আপনি ঘরটা দেখতে পেলেন।'

ঘরে ঢুকে প্রথমে জুলিয়ার মৃতদেহ মাটিতে নামিয়ে রাখা হল। একদল লামা গোছা গোছা ধূপ জ্বালাতে শুরু করল বেদিটার চারপাশে। অন্যদিকে জুলিয়ার পোশাক খুলতে শুরু করল। সম্পূর্ণ নিরাভরণ করা হল তাকে। একটা সুতোও তার দেহে রাখা হল না। নির্বাণ দেখল, হ্যাঁ, শুধুমাত্র একটাই ক্ষতচিহ্ন তার দেহে। ঠিক বাঁ-দিকের বুকে। তাছাড়া তার সারা দেহ একদম নিখুঁত। কোথাও নতুন বা পুরোনো আঁচড়ের দাগও নেই তার শরীরে। কী সুন্দর এই যুবতীর দেহ! এখনও যেন তা কোনও পুরুষকে আকৃষ্ট করতে পারে!

জুলিয়ার দেহটাকে উন্মুক্ত করার পর তার দেহটাকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে চিৎ করে শোয়ানো হল বেদির ওপর। তার হাত-দুটো টান টান করে ছড়িয়ে দেওয়া হল দু'পাশে। পা-দুটোও দু-পাশে যথাসম্ভব সরানো হল। ঘরের জানলাগুলো আগে থেকেই বন্ধ ছিল। ঘরে শুধু আলো ঢুকছিল দরজা দিয়ে। জুলিয়ার শবদেহ ঘরে রেখে দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালেন সবাই।

কিছুক্ষণের মধ্যে একটা অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল। আধো অন্ধকার অলিন্দপথে এসে দাঁড়ালেন অতিবৃদ্ধ লামা চোগস সাঙ। তাঁকে দেখে এবার বেশ চমকেই গেল নির্বাণ। তার দেহে এখন একখণ্ড বস্ত্রও নেই। হাড়ের ওপর শুধু যেন চামড়ার আচ্ছাদন দেওয়া দেহ। একটানা পাতলা কাপড়ের চামড়াটা টেনে খসিয়ে দিলেই যেন তার কঙ্কালটা বেরিয়ে পড়বে। বুকের কাছে তিনি একটা চাল মাপার কুনকির মতো রুপোর কৌটো ধরে আছেন। দীর্ঘদিন না-কাটার ফলে তার হাত-পায়ের নখগুলো লম্বা হয়ে বাজপাখির নখের মতো বেঁকে গিয়েছে।

BanglaBook.org

কিন্তু এই অতিবৃদ্ধ লামার দেহেও পোশাক নেই কেন? জুলিয়ার দেহও তো নিরাভরণ করা হল। তবে মঠাধ্যক্ষর বলা 'মিলিত হওয়া' কথাটার মানে কী—প্রশ্নটা মুহূর্তের জন্য মৃদু ঘুরপাক খেল নির্বাণের মনে। চোগস সাঙ দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই তাকে দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নত করল মঠাধ্যক্ষসহ অন্যারা। নির্বাণও করল।

চোগস সাঙ তাঁর হাতে-ধরা ঢাকনাওলা রুপোর পাত্রটা মঠাধ্যক্ষর হাতে ধরিয়ে দিয়ে সাধনকক্ষে প্রবেশ করলেন। বাইরে থেকে একজন লামা ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। অন্ধকার ঘরটার মধ্যে শুধু রইল লামা চোগস সাঙ আর সেই শবদেহটা।

সঙ্গীদের নিয়ে মঠাধ্যক্ষ এবার সেই দরজার কিছুটা তফাতে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর অন্য লামাদের উদ্দেশে তিব্বতি ভাষায় কী যেন বললেন। কিন্তু তার কথা শুনে মাথা নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল অন্য লামারা। মঠাধ্যক্ষর ভ্রূহীন মুখ যেন ধীরে ধীরে কুঞ্চিত হয়ে উঠল। তিনি এরপর নির্বাণকে বললেন, 'একটা সমস্যায় পড়া গেল। এই পাত্রটা নিয়ে রাতে কাউকে উপস্থিত থাকতে হবে। চোগস সাঙ সাধনা শেষ করে বেরিয়ে ঠিক সময়ে তিনি একটা জিনিস রাখবেন এই কৌটার ভিতর। কিন্তু প্রচলিত নিয়ম হল যে, এই কৌটোটা রাতের জন্য ধারণ করবে যে, তাকে এই কৌটোটা সূর্যোদয়ের পর মঠে রেখে এ-মঠ ছেড়ে চলে যেতে হবে। তিনি আর কোনওদিন মঠে প্রবেশ করতে পারবেন না।'

নির্বাণ জানতে চাইল, 'এ নিয়ম কেন?'

মঠাধ্যক্ষ বললেন, 'কারণ, এর ভিতর বৃদ্ধ লামা যে-জিনিসটা রাখবেন তার অসীম ক্ষমতা। যে পাত্রটা ধারণ করবে সে যাতে ভবিষ্যতে জিনিসটা হস্তগত করার চেষ্টা না-করে, তার প্রতি লোভ না করে সেজন্য এ-প্রথা চলে আসছে। কাজেই স্বাভাবিক নিয়মে এখানে উপস্থিত লামারা কেউ এ-মঠের প্রবেশাধিকার হারাতে চান না।'

নির্বাণ ব্যাপারটা শুনে আশ্চর্য হয়ে বলল, 'আচ্ছা, আমি যদি কৌটোটা নিয়ে আজ রাতে এখানে থাকি? আমি তো আর কোনওদিন এখানে ফিরে আসব না।'

বৃদ্ধ মঠাধ্যক্ষ কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন নির্বাণের দিকে। তারপর বললেন, 'আপনার সাহস আছে? ওই মহিলার মৃতদেহ যখন জীবন্ত

BanglaBook.org

হয়ে চলাফেরা করবে তখন আপনি সে-দৃশ্য সহ্য করতে পারবেন তো?'

মৃতদেহ যে সত্যি জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে সেকথা ঠিক বিশ্বাস হয় না নির্বাণের। তবে রাতে কী ঘটতে চলেছে তার সাক্ষী হতে চায় সে। তাছাড়া রবিনকে এ-অবস্থায় মঠে একা রেখে যাওয়াও ঠিক নয়। তাই সে বলল, 'হ্যাঁ, আমি পারব। আপনি ওটা আমার হাতে দিন।'

লামা আর কোনও উপায় না দেখে নির্বাণের হাতে কৌটোটা তুলে দিয়ে বললেন, 'সাধনা শেষে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আপনাকে ঠিক সময় ডাকবেন চোগস সাঙ। আপনি সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের কাছে কৌটোটা ধরবেন। চোগস সাঙ কৌটোর ভিতর জিনিসটা মুখ থেকে রাখলেই সঙ্গে সঙ্গে কৌটোর মুখ বন্ধ করে দেবেন। কোনওভাবেই আর কৌটোর মুখ খুলে জিনিসটা দেখার চেষ্টা করবেন না। তাহলে আপনার বিপদ হবে। মৃত্যুও হতে পারে। কাল ভোরে আমি এসে কৌটোটা নেব।'

নির্বাণ প্রশ্ন করল, 'লামা কী রাখবেন এই কৌটোতে?'

মঠাধ্যক্ষ বললেন, 'তা আপনাকে এখন বলা যাবে না। চোগস সাঙ জিনিসটা কৌটোতে রাখার সময় যদি দৈবাৎ জিনিসটা আপনি দেখতে পারেন তখন চিনলে চিনবেন। নচেৎ নয়। আবারও আপনাকে সাবধান করছি জিনিসটা রাখার পর কৌটো খুললে বিপদ হবে। এবার ঘরে ফিরে যান। আমরাও মঠ ত্যাগ করব।'

কৌটোটা নিয়ে আবার নিজেদের সেই ঘরে ফিরে এল নির্বাণ। ঘরের মেঝেতে আচ্ছন্নর মতো শূন্য দৃষ্টিতে বসে আছে রবিন। সে কোনও কথা বলল না। নির্বাণ তাকে বিরক্ত করল না। সে গিয়ে দাঁড়াল জানলার ধারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে দেখতে পেল ছোট শিশুদের নিয়ে লামার সার বেঁধে মঠ ছেড়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। জনশূন্য হয়ে গেল মঠ। রয়ে গেল তারা চারজন। তিনজন জীবন্ত মানুষ, আর একটা লাশ।

৪

সারাটা দিন বলতে গেলে সে ঘরেই কেটে গেল নির্বাণের। রবিন সারাদিন পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল মেঝেতে। নির্বাণ তাকে একবার বিস্কিট

BanglaBook.org

আর জল খাওয়াতে গেলে শুধু বোতল থেকে কয়েক ঢোক জল খেল রবিন। তারপর অস্পষ্টভাবে শুধু একবার জানতে চেয়েছিল, 'জুলিয়া আবার প্রাণ ফিরে পাবে তো?'

সঙ্গীনীহারা বিপর্যস্ত রবিনকে আশ্বস্ত করার জন্য নির্বাণ শুধু জবাব দিয়েছিল, 'লামারা তো তাই বলছেন। জুলিয়ার মরদেহ নিয়ে ধ্যানে বসেছেন লামা চোগস সাঙ। অন্ধকার নামার পর তিনি নাকি একরাতের জন্য ফিরিয়ে দেবেন জুলিয়ার প্রাণ।' মাঝে অবশ্য শেষ দুপুরে একবার কিছুক্ষণের জন্য সেই ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল নির্বাণ। অলিন্দ পেরিয়ে সে উপস্থিত হয়েছিল সেই সাধনকক্ষের আসনে। দরজা আগের মতো বন্ধ ছিল। কিন্তু সেখানে পৌঁছোতেই কেমন যেন অস্বস্তিবোধ হতে শুরু করেছিল তার। শূন্য এ-মঠে কোথাও কোনও শব্দ নেই। নির্বাণের মনে হচ্ছিল সেই দরজার বাইরে আশপাশের দেওয়ালের গায়ে পাথর বা কাঠখোদাই মূর্তিগুলো যেন জীবন্ত হয়ে চারপাশ থেকে তাকিয়ে তাকে দেখছে! কিম্ভূতকিমাকার বীভৎস সব মূর্তি! অস্বস্তি এড়াতে নির্বাণ ফিরে এসেছিল ঘরে।

অন্ধকারটা এদিন যেন বেশ তাড়াতাড়িই নামল রেশমপথের এই প্রাচীন তিব্বতি গুম্ফার বাইরে। বিকেল হতে না হতেই নির্বাণ জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দেখল আকাশটা যেন কেমন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল আর তার সঙ্গে সঙ্গে ঝিরঝিরি তুষারপাত শুরু হল। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসতে লাগল এই অচেনা-অজানা পরিবেশের বুকে।

অন্ধকার নামার পর সঙ্গে আনা চার্জার লাইটটা জ্বালিয়ে ফেলল নির্বাণ। আর তার কিছুক্ষণ পরই আস্তে আস্তে অবসাদ ভেঙে উঠে দাঁড়াল রবিন। বাইরে একসময় বাতাসের শব্দ শোনা গেল। সেই বাতাস হয়তো বা মেঘকে সরিয়ে দিল। চাঁদ উঠল আকাশে। গোল থালার মতো বেশ বড় চাঁদ। তবে বাতাসের শব্দ আর তুষারপাত কিন্তু থামল না।

নির্বাণ জানলার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সেই দৃশ্য। আর রাত যত বাড়তে লাগল ততই যেন উত্তেজনা পেয়ে বসতে লাগল রবিনকে। অস্থিরভাবে সে ঘরের এমাথা থেকে ওমাথা পায়চারি শুরু করল আর বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'আর কতক্ষণ? আর কতক্ষণ? জুলিয়া তুমি ফিরে আসবে তো?'

BanglaBook.org

জুলিয়া ফিরে আসতে পারে নির্বাণ এ-কথা বিশ্বাস করলেও শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা কী ঘটে তা দেখার ব্যাপারে নির্বাণের কৌতূহলের সীমা নেই। মাঝেমধ্যেই সে তার কোটের পকেটে রাখা সেই কৌটোটার অস্তিত্ব হাত দিয়ে অনুভব করতে লাগল আর প্রতীক্ষা করতে লাগল, কখন তাদের ডাক আসে।

রাত বেড়ে চলল। সাতটা-আটটা-ন'টা। আর তার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলল তাদের উত্তেজনা আর বাইরে বাতাস-তুষারপাত। এ এক অসহনীয় প্রতীক্ষা! রুপোর কৌটোটা কোটের পকেট থেকে বার করে নাড়াচাড়া শুরু করল নির্বাণ।

তবে শেষপর্যন্ত প্রতীক্ষার অবসান হল। কোথায় যেন প্রথমে একটা অস্পষ্ট শব্দ হল। তারপর ধীরে ধীরে একটা পদশব্দ এগিয়ে এসে থামল দরজার বাইরে। আর উৎকণ্ঠা সহ্য হচ্ছিল না রবিন বা নির্বাণের। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলল রবিন। বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন লামা চোগস সাঙ। তার এক হাতে ধরা বেশ বড় একটা প্রদীপ। সেই আলো ছড়িয়ে পড়েছে লামার মুখমণ্ডলে। সে মুখের দিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত জিনিস খেয়াল করল নির্বাণ। লামার গাল দুটো একবার এপাশে অন্যবার ওপাশে ফুলে উঠছে। ওভাবে লামা গাল ফুলিয়ে নাচাচ্ছে কেন? ভালো করে লামার মুখের দিকে তাকিয়ে নির্বাণের পরমুহূর্তেই মনে হল, লামা আসলে গাল নাচাচ্ছে না। তার মুখের ভিতর কিছু আছে। আর সেটাই লামার মুখের ভিতর থেকে বাইরে বেরোবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। আর তারই ধাক্কায় অতিবৃদ্ধ লামার চর্মসার গাল ফুলে উঠছে!

মুখের ভিতর কী ধরে রেখেছেন লামা? জীবন্ত কিছু কি? নির্বাণ কোনও বইতে যেন পড়েছিল যে, অনেক সন্ন্যাসী নাকি মুখে জীবন্ত কই মাছ পুরে কৃচ্ছসাধন করে তপস্যা করেন! তেমন কিছু কি?

বৃদ্ধ লামাকে দেখার পর রবিন বলে উঠল, 'কোথায়, জুলিয়া কোথায়?'

হাতের ইশারায় চোগস সাঙ অনুসরণ করতে বললেন তাঁকে। প্রদীপের আলোয় ধীর পায়ে অন্ধকার অলিন্দগুলো দিয়ে এগোতে লাগলেন। সেই ম্লান আলোয় প্রাচীন মঠের দেওয়ালের গায়ে পড়া নিজেদের ছায়াগুলোও যেন অদ্ভুত মনে হতে লাগল। বিশেষত, শীর্ণ-উলঙ্গ চোগস সাঙের ছায়াটা দেখে মনে হতে লাগল ঠিক যেন একটা কঙ্কালের ছায়া!

BanglaBook.org

সাধনকক্ষের কিছুটা তফাতে এসে থামলেন লামা। কক্ষের দরজা খোলা। ভিতরে জমাট বাঁধা অন্ধকার। সেদিকে তাকিয়ে রবিন বলে উঠল, 'কই, জুলিয়া কই?'

রবিন প্রশ্নটা করার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ শোনা গেল ঘরের ভিতর। আর সেই শব্দটা ক্রমশ দরজার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। এরপর অন্ধকার ঘরের ভিতর থেকে যে আত্মপ্রকাশ করল তাকে দেখে নির্বাণের এতদিনের বিশ্বাস-অবিশ্বাস সব মাথার মধ্যে এলোমেলো হয়ে গেল।

হ্যাঁ, ঘরের বাইরে যে এসে দাঁড়িয়েছে সে জুলিয়াই। সম্পূর্ণ নগ্ন দেহ তার। বুকের মধ্যে গুলির ছিদ্রটাও যেন দেখা যাচ্ছে! আর একটা ক্ষীণ রক্তধারা যেন তার মুখের কষ গড়িয়ে নামছে।

তবে কি লামা সত্যিই তার মৃতদেহে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন? কিন্তু তা কী করে সম্ভব? নির্বাণ তার মনকে এই বলে আপ্রাণ প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করল যে, হয়তো জুলিয়া তখনও মরেনি আর সেটা বুঝতে পেরেছিলেন লামা। তারপর বন্ধ ঘরে কোনও ওষুধ বা অন্য কিছুর সাহায্যে তার জ্ঞান ফিরিয়ে তাকে উঠে দাঁড় করিয়েছেন।

জীবন্ত জুলিয়াকে দেখে কয়েক মুহূর্তের জন্য হতবাক হয়ে গিয়েছিল রবিনও। তারপর সে ছুটে গিয়ে জুলিয়াকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল—'তুমি বেঁচে আছ জুলিয়া! তুমি সত্যিই বেঁচে আছ! চলো আমরা এখনই বেরোব। এই ভয়ংকর জায়গা, এই দেশ ছেড়ে দেশে ফিরে যাব।'

তার কথার প্রত্যুত্তরে জুলিয়া গোঁ গোঁ আর্তনাদ করে কী যেন বলার চেষ্টা করতে লাগল।

লামার কয়েক পা তফাতে দাঁড়িয়েছিল নির্বাণ। লামার মুখের ভিতরের সেই জিনিসটা যেন তার গাল ফুঁড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বৃদ্ধ লামা আর সেটাকে মুখের ভিতর ধরে রাখতে পারছেন না। মুখ লাল হয়ে উঠেছে তাঁর, চোখের কোটর থেকে মণিদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আলিঙ্গনরত রবিন আর জুলিয়ার দিক থেকে নির্বাণ দৃষ্টি ফেরাতেই লামা চোগস সাঙ নির্বাণের হাতে-ধরা কৌটোটার দিকে তাকিয়ে তাকে কাছে ডাকলেন।

ওদিকে তখন রবিন জুলিয়াকে জাপটে ধরে বলছে, 'তোমার কি খুব

BanglaBook.org

কষ্ট হচ্ছে? কোথায় কষ্ট? কীসের কষ্ট?'

নির্বাণ, লামার নির্দেশ পালন করে তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে কৌটোর ঢাকনাটা সরাল। লামা ঝুঁকে পড়ে কৌটোর ভিতর মুখ থেকে জিনিসটা রাখতে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় রবিন চিৎকার করে বলে উঠল, 'জুলিয়া, তোমার এ ক্ষতি করল! কে করল?

তার চিৎকার শুনে চমকে উঠে নির্বাণ আর লামা চোগস সাঙ ফিরে তাকাল আলিঙ্গনরত যুগলের দিকে। রবিনের প্রশ্নের জবাবে জুলিয়া করুণ স্বরে গুঙিয়ে উঠে হাতের ইশারায় দেখিয়েছিল চোগস সাঙকে। আর সঙ্গে সঙ্গে জুলিয়াকে ছেড়ে দিয়ে রবিন লামার উদ্দেশে চিৎকার করে বলে উঠল, 'শয়তান, তুই এতবড় ক্ষতি করলি কেন জুলিয়ার? এ কথা বলেই সে ছুটে এসে সজোরে ঘুসি মারল জীর্ণ লামার পেটে।

লামার হাত থেকে খসে পড়ল প্রদীপটা। আর ঘুসির আঘাতে চোগস সাঙের মুখ থেকে ফাঁক হয়ে কী যেন একটা ছোট্ট জিনিস সোজা ছিটকে বেরিয়ে কাকতালীয়ভাবে সোজা ঢুকে গেল সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নির্বাণের জামার ভেতর।

বাতিটা পড়ে নিভে গিয়েছে। চারপাশে একটা ঝটাপটি শুরু হল অন্ধকারের মধ্যে। নির্বাণের জামার ভেতর জিনিসটা বাইরে বেরোবার জন্য ছটফট করছে! নির্বাণ অন্ধকারের মধ্যেই নিজের জামার ভেতর হাত ঢুকিয়ে জিনিসটা খপ করে ধরে ফেলল। জিনিসটাকে ধরে তার মনে হল সেটা ছোট মাছের মতো কোনও কিছু হবে। মাছের মতোই সেটা পিচ্ছিল আর ঠান্ডা। তার হাতের মুঠির মধ্যে ছটফট করছে।

হঠাৎ একইসঙ্গে অন্ধকারে আর্তনাদ করে উঠল লামা আর রবিন। আর তার পরমুহূর্তেই শোনা গেল নারীকণ্ঠের রক্তজল-করা এক অদ্ভুত হাসি। জুলিয়ার হাসি! অট্টহাস্য করছে জুলিয়া!

ব্যাপারটা কী হচ্ছে বুঝতে পারছে না নির্বাণ। সে চেষ্টা করতে লাগল তার হাতের জিনিসটা কৌটোতে ভরে ফেলার। অন্ধকারের মধ্যে কাজটা করতে একটু সময় লাগল তার। জুলিয়ার হাসি তখন অলিন্দ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে বাইরের দিকে। তার সঙ্গে ভারী কোনও জিনিস মেঝের উপর দিয়ে ঘসটে টেনে নিয়ে যাওয়ার শব্দ!

কোনওক্রমে জিনিসটাকে কৌটোর মধ্যে পুরে সেই ভয়ংকর হাসিকে

BanglaBook.org

অনুসরণ করল নির্বাণ। সে মঠের দরজার বাইরে বেরিয়ে এসে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল। তুষারপাত আর বাতাস বইছে বাইরে। আর সেই ঝোড়ো বাতাস আর তুষারপাতের মধ্যে চাঁদের আলোয় জুলিয়া কোনও অমানুষিক দানবীয় শক্তিতে দু-হাতে চোগস সাঙ আর রবিনের গলা দুটো ধরে মাটির ওপর তাদের দেহ দুটোকে টানতে টানতে এগিয়ে চলেছে! বলা ভালো উড়ে চলেছে। দেখে মনে হয় ও-দেহদুটোতে আর প্রাণ নেই। চত্বরের যে পাশটায় খাদ সেখানে পৌঁছে গেল জুলিয়া।

এই বীভৎস দৃশ্য আর সহ্য করতে না পেরে নিজের অজান্তেই যেন আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল নির্বাণ। আর সেই চিৎকার শুনেই সম্ভবত দেহদুটোকে নিয়ে খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে নির্বাণের দিকে ফিরে তাকাল জুলিয়া। কী বীভৎস তার মুখমণ্ডল! মুখের দু'পাশের কষ গড়িয়ে তাজা রক্ত পড়ছে! চোখের মণিদুটো জ্বলছে হিংস্র শ্বাপদের মতো! সত্যি যেন সে প্রেতলোকের বাসিন্দা!

নির্বাণকে দেখে সে একরাশ ঘৃণা-হিংস্রতা নিয়ে যেন এগোতে যাচ্ছিল নির্বাণের দিকে। কিন্তু এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল নির্বাণের হাতে ধরা কৌটোটার দিকে তাকিয়ে। জ্ঞান হারাবার আগে নির্বাণ দেখল, শেষ একটা আর্তনাদ করে জুলিয়া দেহদুটোকে শূন্যে উড়িয়ে নিয়ে ঝাঁপ দিল খাদে।

৫

তিনদিন পর সকালে আর্মি হাসপাতালের জানলার সামনে দাঁড়িয়েছিল নির্বাণ। সেই টিবেটিয়ান সীমান্তবাহিনীর অফিসার ঘটনার পরদিন ভোরে মঠ চত্বর থেকে তুষারে প্রায় চাপা পড়া অচৈতন্য নির্বাণকে উদ্ধার করে এই হাসপাতালে এনে ভরতি করেন। তার জ্ঞান ফিরতে আরও একদিন সময় লেগেছিল। তবে এখন সে সুস্থ। আর একটু পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

কাঠের তৈরি হাসপাতালের দোতলার জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল নির্বাণ। তার জানলার ঠিক নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নাম না-জানা একটা পাহাড়ি নদী। ওপর থেকে রেশমপথের পাকদণ্ডীটাও চোখে পড়ছে। তার

BanglaBook.org

দু'পাশে ঘন পাইন বন, মাথার ওপর উত্তুঙ্গ তুষার শৃঙ্গগুলো সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। আরও দূরে যেখানে রেশমপথের পাকদণ্ডীগুলো ও ওপরদিকে উঠে ঘন কুয়াশার আড়ালে হারিয়ে গিয়েছে সেদিকে তাকিয়ে নির্বাণ ভাবছিল হয়তো বা ওই কুয়াশার আড়ালেই কোথাও দাঁড়িয়ে আছে সেই প্রাচীন মঠ। যেখানে রয়ে গেল রবিন-জুলিয়া আর তার দেখা সেই ভয়ংকর ঘটনার স্মৃতি। সে স্মৃতিকে অবশ্য মন থেকে মুছে ফেলতে চায় নির্বাণ।

ভাবছিল নির্বাণ। এমন সময় ঘরে প্রবেশ করলেন ইন্দোটিবেটিয়ান ফোর্সের সেই অফিসার ডুকপা। তার হাতে ধরা ফুলের স্তবকটা নির্বাণের হাতে দিয়ে তিনি বললেন—'আজ তো আপনি চলে যাবেন তাই দেখা করতে এলাম। নীচে আর্মির গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তারা আপনাকে গ্যাংটকে পৌঁছে দেবে।'

এ কথা বলার পর ডুকপা বললেন, 'আপনি এতদিন অসুস্থ ছিলেন বলে প্রশ্নটা করিনি। আসলে সেদিন রাতে ব্যাপারটা কী ঘটেছিল বলুন তো?'

একটু চুপ করে থেকে নির্বাণ সংক্ষেপে প্রথমে মোটামুটি বলল ব্যাপারটা। তারপর তাকে প্রশ্ন করল, আচ্ছা, "রোলাং" কাকে বলে আপনি জানেন? মঠাধ্যক্ষ বলেছিলেন, লামা চোগস সাঙ যে পদ্ধতিতে মৃতাকে পুনর্জন্ম দেবেন তার নাম নাকি 'রোলাং'।'

ভদ্রলোক তার কথার জবাবে বললেন, 'ব্যাপারটা সত্য-মিথ্যা না জানলেও যেহেতু আমি জন্মসূত্রে তিব্বতি, তাই তিব্বতি শব-সাধনার এই পদ্ধতির কথা আমিও শুনেছি। মৃতদেহের শরীরে আত্মা প্রবেশ করিয়ে কিছু সময়ের জন্য আবার নাকি জীবন্ত করা হয় দেহকে। এ সাধনা সম্বন্ধে যতটুকু শুনেছি তাতে সাধক মৃতদেহ নিয়ে অন্ধকার ঘরে সারাদিন সাধনা করেন। এ পদ্ধতিতে মৃতদেহকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে চিৎ করে শুইয়ে তার ওপর সাধক শুয়ে পড়েন মৃতের প্রত্যেকটা অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গ মিলিয়ে। মৃতদেহ যদি নারীর হয় তবে সাধক লিঙ্গ প্রবেশ করান মৃতার যোনীতে। তারপর মৃতের মুখে মুখ লাগিয়ে সাধক বীজমন্ত্র জপ করতে থাকেন।

ভদ্রলোক একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন, একসময় মন্ত্রের জোরে মৃতদেহে আত্মা প্রবেশ করে। দেহটা জীবন্ত হয়ে উঠে সাধককে

BanglaBook.org

তার ওপর থেকে ছিটকে ফেলতে চায়। এ সময় যখন সেই শবাত্মা জিভ বার করে তখন সেই সাধক কামড়ে সেই জিভ কেটে নিজের মুখে নিয়ে নেন। সেই জিভ নাকি জীবন্ত। তার মধ্যেই আত্মার ক্ষতিকর শক্তি আবদ্ধ থাকে। জিভটাকে এরপর পুরে ফেলতে হয় মন্ত্রপূত পাত্রে। যা পরে শুকিয়ে তন্ত্রসাধনার কাজে ব্যবহার করা হয়। যার কাছে ওই জিভের পাত্র থাকে কোনও আত্মা নাকি তার কোনও ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু কোনওভাবে সেই জিভ পাত্রে ভরার আগে সাধকের মুখ থেকে যদি পড়ে যায় তবে সেই মুহূর্তে সাধকের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় পুনরুত্থিত মৃতদেহের ওপর থেকে। মৃতদেহ তখন স্বমূর্তি ধারণ করে। হিংস্র হয়ে উঠে সেই প্রেতাত্মা হত্যা করে সাধক ও অন্যদের।' নির্বাণের প্রশ্নের উত্তর জানিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন তিনি।

নির্বাণকেও এবার বেরোতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পোশাক বদলে নিল সে। একজন হাসপাতাল কর্মী তার কোটটা দিয়ে গিয়েছে। সেটা গায়ে দিয়ে কোটের পকেটে হাত দিতেই নির্বাণের হাত ঠেকল একটা জিনিসে। সেটা বার করেই চমকে উঠল নির্বাণ। সেই রুপোর কৌটোটা! নিশ্চয়ই কৌটোটা তার দেহের পাশে পড়ে থাকতে দেখে তার কোটের পকেটে ভরে দিয়েছিল কেউ।

মুহূর্তের মধ্যে নির্বাণের মনে পড়ে গেল ঘটনাটা। তার দেহের ভিতর খেলা করছে—লাফাচ্ছে মাছের মতো পিচ্ছিল—ঠান্ডা একটা জিনিস! লামা চোগস সাঙের মুখ থেকে বেরিয়ে-আসা কামড়ে ছিঁড়ে আনা প্রেতাত্মা জুলিয়ার জীবন্ত জিভ! ব্যাপারটা মনে পড়তেই কেঁপে উঠল নির্বাণ। তারপর জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে ঢাকনাবন্ধ ছোট্ট রুপোর পাত্রটা নীচে নদীতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ফেরার জন্য ঘর ছাড়ল।

BanglaBook.org

বিল্লি মহল

১

ঐশিকা গাড়ি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিল। যদিও ডাক্তার তাকে এ অবস্থায় বেশি হাঁটতে বারণ করেছে কিন্তু এছাড়া কোনও উপায় নেই। কারণ, কবুতর মহল নামে সেই প্রাচীন হাবেলি-প্রাসাদে গাড়ি পৌঁছোয় না। চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন হর্ম্য প্রাসাদ, দেউলগুলোর ফাঁক গলে, সংকীর্ণ পথের নানা গোলকধাঁধা অতিক্রম করে তবে পৌঁছোতে হবে কবুতর মহলে। তবে সেখানে যাবার রাস্তা চেনে ঐশিকা। মাত্র মাস চারেক আগেই সে

BanglaBook.org

এসেছিল এখানে, মন্দির প্রাচীন হর্ম্য প্রাসাদশোভিত মধ্যভারতের এই মাণ্ডুতে। পরিচিত ট্যুরিস্ট স্পট এই মাণ্ডু। সারাদেশের লোকেরা আসে এই প্রাচীন প্রাসাদ-নগরী দেখতে, শুনতে আসে মাণ্ডুর রূপমতীর বিখ্যাত প্রেমকাহিনি। তবে এখন ট্যুরিস্ট সিজন নয়, এপ্রিল মাস, গরম পড়তে শুরু করেছে। ট্যাক্সি স্ট্যান্ড প্রায় ফাঁকাই বলা যায়। দু-একটা গাড়ি শুধু এদিক-ওদিক গাছের নীচে ঝিমোচ্ছে। স্ট্যান্ডের লাগোয়া যেসব ছোট ছোট দোকানঘরগুলো টুরিস্টদের জন্য পাথরের মূর্তি, ধাতুর গহনা, পিকচার পোস্টকার্ড ইত্যাদির পসরা সাজিয়ে বসে থাকে সেগুলোও এখন বন্ধ। শুধু দূর থেকে দুজন শ্বেতাঙ্গ নারী-পুরুষকে প্রাচীন প্রাসাদ-নগরীর গোলকধাঁধায় অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল ঐশিকা।

তাকেও ওদিকে যেতে হবে, কাজেই সঙ্গের ছোট্ট লাগেজটা কাঁধে নিয়ে ঐশিকা হাঁটতে শুরু করল। কয়েক পা এগোবার পর একটা বন্ধ দোকানের ঝাঁপের গায়ে বেশ কয়েকটা পোস্টার চোখে পড়ল তার। বেশ কয়েকটা দু-তিন বছর বয়সি বাচ্চার ছবি সাঁটানো সেখানে। স্থানীয় বাচ্চা সব। নিখোঁজের বিজ্ঞাপন। ঐশিকার মনে পড়ল রেল স্টেশন থেকে গাড়িতে আসার পথে কী একটা কথা প্রসঙ্গে ড্রাইভার বলছিল বটে, আজকাল দিনকাল বদলে গেছে ম্যাডাম। খবরের কাগজ আর টিভি খুললেই খালি খুন-জখম মারদাঙ্গার খবর। আমাদের মাণ্ডুতেও তো কয়েকমাস ধরে বেশ কয়েকটা বাচ্চাকে পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ বলছে বাচ্চাগুলোকে চুরি করে নাকি আরবদেশে পাঠানো হচ্ছে উটের দৌড়ে উটের গলায় ঝোলাবার জন্য, আবার কেউ বলছে তাদের নাকি মুম্বাইয়ের কোঠিবাড়ি বা সার্কাসের দলে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে।

ঐশিকার পোস্টারগুলো দেখে ড্রাইভারটার কথা মনে পড়ে গেল। তবে তার ভয়ের কোনও কারণ নেই। তার সঙ্গে একটা বাচ্চা আছে ঠিকই, কিন্তু তাকে কেউ চুরি করতে পারবে না। সে আছে ঐশিকার দেহের ভিতর। মাত্র তিনমাস বয়স তার। ক'দিন আগে সোনোগ্রাফি টেস্টে ধরা পড়েছে তার উপস্থিতি।

কিছুটা এগিয়েই প্রাসাদ নগরীর গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়ল ঐশিকা। সর্পিল পথের দু'পাশে নির্বাকভাবে দাঁড়িয়ে আছে ছোট ছোট প্রাসাদের মতো পাথর অথবা প্রাচীন ইটের তৈরি বাড়িগুলো। তাদের মাথাগুলো গম্বুজাকৃতির, পাথরের নক্সা-কাটা তোরণ, জাফরিঅলা ঝুলবারান্দা, খাঁজ-কাটা গোলাকৃতি স্তম্ভ। দেওয়ালের গায়ে এখনও কোথাও কোথাও জেগে আছে কাজ, ছবি বা মূর্তির আবছা উপস্থিতি।

BanglaBook.org

মাস তিনেক আগে মাণ্ডুর এই প্রাসাদ-নগরীরই ছবি তুলতে এখানে প্রথমবার এসেছিল পেশায় ফোটোগ্রাফার ঐশিকা। তখন তার জানা ছিল না এই আসা তার জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দেবে। তাকে আবার ছুটে আসতে হবে এখানে, হয়তো বা বার বার আসতে হবে, এমনকী হয়তো বা কলকাতার নগরজীবন ছেড়ে ঐশিকাকে জীবন কাটাতে হবে মধ্য ভারতের এই খণ্ডহর প্রাসাদ-নগরীতে। কারণ, সে যাকে পেটে ধারণ করেছে সে ছোটরাজা চান্দেল সিং-এর সন্তান।

তিনমাস পর আবার প্রিয়তমর সঙ্গে মিলিত হতে চলেছে ঐশিকা। এই তিনমাসের বিচ্ছেদকালে অবশ্য চোখবন্ধ করলেই তারে চোখে ভেসে উঠেছে টিকালো নাক, রক্তিম ওষ্ঠ, কটা চোখের সুঠামদেহের এক যুবাপুরুষের মুখ, ছোটরাজার মুখ। আবার আজ তার সঙ্গে মিলন হবে ঐশিকার।

কিন্তু সেই আনন্দের সঙ্গে একটা উৎকণ্ঠাও কাজ করছে তার মনে। কবুতর হাবেলির রানিমা, ঐশিকার হবু শাশুড়ি এবার তাকে মেনে নেবেন তো? ছোটরাজা যখন গতবার ঐশিকাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেছিল তখন তো তিনি হাবেলির ভিতরে প্রবেশও করতে দেননি ঐশিকাকে। সদর দরজা আটকে দাঁড়িয়ে কঠিন কণ্ঠে বলেছিলেন, তোমাকে আমি প্রবেশ করতে দেব না হাবেলিতে। তুমি যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও। আর কোনও দিন এখানে আসবে না। আমি তোমাকে পুত্রবধূ হিসাবে মানব না।

কিন্তু ছোটরাজা তাকে আশ্বস্ত করে বলেছিল, 'আমাদের ভালোবাসার মিলন ব্যর্থ হবে না। দেখবে সন্তান আসবে তোমার গর্ভে। তখন আর তিনি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না। আর যদি তিনি তা-ও না করেন, তবে তোমাকে নিয়ে "বিল্লি মহল"-এ চলে যাব। ও বাড়িটা আমাকেই দিয়ে গেছেন পিতৃদেব।'

হাঁটতে লাগল ঐশিকা। কিছুটা এগোবার পর রাস্তার পাশে একটা নির্জন বারান্দা থেকে মৃদু শব্দ শুনে সেদিকে তাকিয়ে একটা থামের আড়াল থেকে কিছুটা বেরিয়ে থাকা আলিঙ্গনরত বিদেশী নারী-পুরুষকে দেখতে পেল ঐশিকা। চারপাশে কোনও লোকজন না-থাকায় এই নির্জন প্রাসাদে মিলিত হচ্ছে ওই নারী-পুরুষ। তাদের দেহের সঞ্চালন দেখে বোঝা যাচ্ছে পরস্পরকে ভালোবাসা উজাড় করে দিচ্ছে।

তাদের দেখে মনে মনে হাসল ঐশিকা। ঠিক এইভাবেই এই নির্জন হাবেলির কত কোণে, কত অলিন্দে, থামের আড়ালে সে-ক'টা দিন ছোটরাজার সঙ্গে মিলিত হয়েছে ঐশিকা। যার ফলশ্রুতি তার গর্ভের সন্তান। বিশেষত ওই,

BanglaBook.org

বিল্লি মহলের প্রতিটা ক-ক্ষ অলিন্দেই তো জেগে আছে তাদের দুজনের ভালোবাসার মিলনের ছবি।

বিল্লি মহল। কথাটা ভাবতে ভাবতে এগোতে এগোতে একসময় বিল্লি মহলের কাছে পৌঁছে গেল ঐশিকা। রাস্তার গায়েই দাঁড়িয়ে আছে থাম আর মাথায় গম্বুজঅলা ওপর-নীচে অলিন্দ-ঘেরা বাড়িটা।

ঐশিকা থমকে দাঁড়াল বাড়িটার সামনে। কেউ থাকে না বাড়িটাতে। থাকে শুধু অগুনতি বিড়াল। কালো-সাদা-লাল-ডোরাকাটা নানারকম বিড়াল। এ জন্য স্থানীয় লোকেরা এই ছোট্ট হাবেলি বা বাড়িটাকে বলে 'বিল্লি মহল'। ঠিক যেমন প্রচুর পায়রা থাকায় ছোট রাজার হাবেলিকে ডাকা হয় 'কবুতর মহল' নামে। বিল্লি মহলের বারান্দায়, কার্নিসে সেদিনের মতো আজও অনেক ক'টা বিড়াল শুয়ে বসে আছে। এই বিল্লি মহলেই তো ছোট রাজার সঙ্গে কাকতালীয়ভাবে ঐশিকার প্রথম দেখা হয়েছিল।

সেই প্রথম সাক্ষাতের ব্যাপারটা ঐশিকার যতবারই মনে পড়ে ততবারই যেন রোমাঞ্চিত হয় ঐশিকার শরীর। আসলে মাণ্ডুর হাবেলিগুলোয় ছবি তুলতে তুলতে ঘুরতে ঘুরতে সেদিন হঠাৎ ওখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল ঐশিকা। সে-দিনও এমনই আলোছায়া খেলা করছিল এখানে। সাধারণ ট্যুরিস্টারা সাধারণত এখানে আসে না। তারা মাণ্ডুর রাজপ্রাসাদ, রূপমতীর প্রাসাদ এসব প্রাসাদগুলো দেখেই ফিরে যায়। কাজেই আজকের মতো সে-দিনও এ-জায়গা নির্জন-ই ছিল। বিড়ালগুলো যেন এ-স্থাপত্যের অঙ্গ। তাদের ছবি তোলার লোভ সামলাতে পারেনি ঐশিকা।

ছবি তুলতে তুলতে সে পৌঁছে গেছিল দোতলার বারান্দায়। কার্নিসে বসা একটা বিড়াল শীতের নরম রোদ পোহাচ্ছিল। তার ছবি তুলতে গিয়ে একটু বেশিই ঝুঁকে পড়েছিল সে। আর তারপরই ঘটল সেই ঘটনা বা দুর্ঘটনাটা। প্রাচীন হাবেলির অলিন্দে যে জায়গায় ঐশিকা দাঁড়িয়েছিল সেখানে হঠাৎ-ই তার পায়ের নীচের পাথরটা খসে পড়েছিল। হয়তো নীচেই পড়ে যেত সে। মুহূর্তের জন্য যেন মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছিল সে।

তবে তেমন কিছু ঘটেনি। পরমুহূর্তেই একটা শক্তসবল হাত পিছন থেকে ধরে ফেলেছিল ঐশিকার জ্যাকেটের কলার। শূন্য থেকে তুলে তাকে আবার দাঁড় করিয়েছিল অলিন্দর নিরাপদ জায়গাতে। ঐশিকা পিছন ফিরে দেখতে পেয়েছিল ক'টা চোখের এক সুন্দর যুবককে, ছোট-রাজাকে। ঐশিকার উদ্দেশ্যে সে বলেছিল, 'ম্যাডাম, একটু সাবধানে ছবি তুলবেন তো!'

BanglaBook.org

সদ্য মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে-আসা ঐশিকা তখন মৃদু মৃদু কাঁপছে। তার মুখ দেখে তাকে আশ্বস্ত করার জন্য এরপর মুক্তোর মতো দাঁতে হেসে ছোটরাজা চান্দেল বলেছিল, 'আর এমন কিছু ঘটবে না। ভয় পাবেন না। এটা আমার হাবেলি। চলুন আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাই বাড়িটা।' আর তারপর...

বাড়িটার দিকে তাকিয়ে সে-দিনের সেই স্মৃতি মনে পড়ে গেল ঐশিকার। বিড়ালগুলোকে দেখে হঠাৎ আরও একটা কথা মনে পড়ল তার। ইদানীং তার অ্যাপার্টমেন্টের যত বিড়াল এসে দাঁড়িয়ে থাকে তার চারতলার ফ্ল্যাটের দরজার সামনে। ঐশিকা দরজা খুললেই তারা তার পায়ে পায়ে ঘোরে।

আগে ঐশিকা বিড়াল একদম পছন্দ করত না। দেখলেই তাড়াত। কিন্তু এই বিল্লি মহল থেকে ফেরার পর থেকেই ফ্ল্যাটের দরজায় বিড়াল দেখলেই এখানকার স্মৃতি জেগে উঠতে তার মনে। ইদানীং সে ফ্ল্যাটের বিড়ালগুলোকে খাবার দেওয়াও শুরু করেছে। বিল্লি মহলের সামনে কয়েকমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকাল ঐশিকা। তারপর হাঁটতে শুরু করল। বাড়ি-মহলগুলোর গলিঘুঁজি অতিক্রম করতে করতে একসময় সে পৌঁছে গেল 'কবতুর মহল-এর' সামনে।

২

কবুতর মহল। মাঝারি আকারের সাদা রঙের এক হাবেলি। বাইরের দিকে পাথরের জাফরির ঝুলবারান্দা। কারুকাজ করা কার্নিস। দেওয়ালের গায়ে খোদিত দেব-দেবী। তলোয়ার হাতে ঘোড়সওয়ার রাজার ফ্রেস্কো। তবে বয়সের ভারে সবই কেমন বিবর্ণ বিষণ্ণ। তবে বাড়িটার বিশেষত্ব হচ্ছে অগুনতি-অজস্র পায়রা বসে আছে বাড়িটার বারান্দা আর ছাদের কার্নিসে। কিছু পায়রা আবার ওড়াউড়িও করছে বাড়িটার মাথায়। বকম বকম শব্দ ভেসে আসছে চারপাশ থেকে।

ছোটরাজারা মাণ্ডুরাজার বংশধর। পাঁচশো বছর আগে নাকি ও-বাড়ি বানিয়েছিলেন চান্দেল সিং-এর কোনও এক পূর্ব-পুরুষ। ঐশিকা জানে, এ-বাড়িতে মাত্র তিনজন লোক থাকে। ছোটরাজা, রানিমা আর ছোটরাজার বাবার আমলের বুড়ো চাকর যোধরাও। তাদের তিনজনকেই আগে দেখেছে ঐশিকা।

আর্চের মতো পাথরের তৈরি প্রবেশতোরণ। তার মাথায় পদ্মের কাজ করা

BanglaBook.org

শুঁড় ভাঙা গণেশমূর্তি। থামের দু-পাশেও খোদিত আছে তলোয়ার হাতে প্রহরীমূর্তি। তবে সময়ের থাবায় তাদের কারো তলোয়ার ভেঙে গেছে, মাথার পাগড়ি খসে গেছে। তবুও অতীতের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা।

তোরণের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল ঐশিকা। মনে মনে সে প্রথমে ভাবল, ছোটরাজা হাবেলিতে আছে তো? নইলে হয়তো হাবেলিতে তাকে ঢুকতেই দেবেন না রানিমা।

কিন্তু তারপর সে ভেবে নিল, আজ সে এ-বাড়িতে ঢুকবেই। কারণ এ-বাড়িতে প্রবেশ করার সামাজিক অধিকার আজ তার আছে। বাড়ির ভাবী উত্তরাধিকারীকে ঐশিকা আজ তার গর্ভে-ধারণ করছে। তার এ-বাড়িতে প্রবেশাধিকার আটকাতে পারেন না রানিমা। যে-কোনও পরিস্থিতির জন্য মনটাকে শক্ত করে নিল ঐশিকা। প্রবেশ-তোরণ অতিক্রম করে সে উঠে এল বারান্দায়। মাথার ওপর পায়রার ডাক, তাদের বিষ্ঠা আর পালক ছড়িয়ে আছে চারপাশে। অলিন্দ সোজা গিয়ে থেমেছে কারুকাজ-করা একটা ভারী কাঠের দরজার সামনে। যদিও যে দরজার রং এখন বিবর্ণ, গায়ের কাঠের প্যানেলও খসে পড়েছে কয়েক জায়গাতে। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। ভারী লোহার কড়া ঝুলছে দরজার গায়ে। অলিন্দ পেরিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ঐশিকা।

গতবার তাকে ঠিক এ-জায়গা থেকেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন রানিমা। কলিং বেলের কোনও ব্যবস্থা নেই। দরজার সামনে থমকে দাঁড়াল ঐশিকা। তারপর কড়া নাড়তে শুরু করল।

কয়েক মুহূর্ত পর দরজার ওপাশ থেকে একটা অস্পষ্ট পায়ের শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল। উত্তেজনায় এবার মৃদু মৃদু কাঁপতে শুরু করল ঐশিকা। কে খুলতে আসছে দরজা? ছোটরাজা? তাকে দেখতে পেয়ে সে কী করবে? তাকে দেখতে পেয়েই জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁটে ঠোঁট রাখবে? তার সেই লাল টুকটুকে ঠোঁট। যে-ঠোঁটের স্পর্শ পেলেই মুহূর্তের মধ্যে জেগে ওঠে ঐশিকার সারা শরীর। কে খুলবে কবুতর মহলের দরজা?

দরজা খুলল ঠিকই, তবে ছোটরাজা নয়, দরজা খুললেন রানিমা। রানিমার ষাটোর্ধ বয়স। পরনে ঘাগড়া, চোলি, হাতে-পায়ে ভারী রুপোর গহনা, গলায় কানে স্বর্ণালঙ্কার। চেহারাতে এমন একটা অভিজাত গাম্ভীর্য আছে যে দেখলেই বোঝা যায় তিনি সাধারণ পরিবারের নারী নন। ঐশিকা ছোটরাজার কাছে শুনেছে তার মাকেও নাকি রাজস্থানের কোনও এক রাজবংশ থেকে বিয়ে করে এনেছিলেন তার বাবা। রাজরক্তের আভিজাত্য বইছে এ-নারীর রক্তেও।

BanglaBook.org

প্রথম দর্শনে তাকে চিনতে পারলেন না রানিমা। গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন, 'কে তুমি? কী চাই?'

ঐশিকা জবাব দিল, 'আমি ঐশিকা। কলকাতা থেকে আসছি।'

'ঐশিকা!' নামটা শুনে এবার তাকে মুহূর্তের মধ্যে চিনে ফেললেন রানিমা। প্রথমে তাঁর চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল, তারপর তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। কঠিন স্বরে রানিমা বলে উঠলেন, 'তুমি আবার ফিরে এসেছ?' বলেছিলাম না এ-বাড়িতে তোমাকে কোনোদিন ঢুকতে দেব না। আজও এক-ই কথা বলছি। এখনই চলে যাও তুমি। চান্দেরের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ হতে দেব না আমি।'

ঐশিকা একটু চুপ করে থেকে শান্তভাবেই বলল, 'না, আমি যাব না। ভিতরে ঢুকব।'

কথাটা শুনেই রানিমা বললেন, 'ভিতরে ঢুকবে মানে? জোর করে ঢুকবে নাকি? এখনও বলছি, তুমি এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাও।' ঐশিকা আবারও শান্তভাবেই বলল, 'না, আমি যাব না। আমি ছোটরাজার কাছে এসেছি।'

রানিমা বলে উঠলেন, 'আমার কাছে কিন্তু লাইসেন্সড বন্দুক আছে। তুমি চলে না গেলে আমি বন্দুক বার করব। যাও বলছি...'

মাথা গরম করলে চলবে না। ঐশিকা তাই এ-কথা শুনে নিজেকে সংযত রেখে মৃদু হেসে বলল, 'আমাকে মারবেন আপনি? তবে শুধু আমাকে নয়, আমার সঙ্গে সঙ্গে আরও একজনকে মেরে ফেলবেন আপনি।'

ভুরু কুঁচকে রানিমা বললেন, 'তার মানে? কী আবোলতাবোল বোকছ তুমি?'

মুহূর্তখানেক চুপ করে থাকল ঐশিকা। তারপর সে তার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করল। সে বলল, 'আমার পেটে আপনাদের ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী আছে। ছোটরাজার সন্তান। তার অধিকার নিয়েই এ-বাড়িতে প্রবেশ করতে এসেছি আমি।'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য পাথরের মূর্তি বনে গেলেন রানিমা। বিড়বিড় করে শুধু একবার বললেন, 'সত্যি বলছ? তুমি নিশ্চিত?'

ঐশিকা বলল, 'হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত। ডাক্তারও দেখিয়েছি। মিথ্যা বলছি না আমি।'

BanglaBook.org

ঐশিকা খেয়াল করল দরজা ধরে দাঁড়িয়ে মৃদু কাঁপছেন মহিলা। ঐশিকা তাকিয়ে রইল তাঁর পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার জন্য। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্ভবত এ ঘটনার ধাক্কা সামলে উঠলেন রানিমা। ঐশিকার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'ভিতরে এসো।'

সন্তানের অধিকার নিয়ে কবুতর হাবেলির ভিতর পা রাখল ঐশিকা।

বাইরের অলিন্দটা যতটা অপরিষ্কার বাড়িটার ভিতরটা ততটাই পরিচ্ছন্ন। চোখধাঁধানো শ্বেতপাথরের মেঝে, চুনকাম করা মসৃণ দেওয়ালের গা থেকে ঝুলছে সোনালি ফ্রেমে আঁটা নানা তৈলচিত্র, হরিণের শিং, প্রাচীন তলোয়ার। কোথাও রাখা আছে পাথর অথবা ধাতুর মূর্তি।

তবে অদ্ভুত একটা গন্ধও মিশে আছে বাড়ির ভিতর। প্রাচীন আভিজাত্যের গন্ধ।

রানিমার পিছন পিছন ঐশিকা একটা অলিন্দ পেরিয়ে উপস্থিত হল একটা ঘরের মধ্যে। চামড়ার কৌচ রাখা আছে একটা নীচু বাঁকা থাবা পা-ওলা টেবিলের সামনে। মেঝেতে গালিচা পাতা, মাথাসহ একটা বাঘছাল সেখানে শুয়ে আছে। দেওয়ালের গায়ে ঝুলছে একটা বন্দুক, তার সঙ্গে টোটার বেল্ট। একপাশের দেওয়ালে শিং-সহ স্টাফ করা একটা হরিণের মাথাও টাঙানো আছে।

তবে ঘরে ঢোকার পর যে-জিনিসটা ঐশিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করল তা, হল একটা দেওয়ালে ঝোলানো তৈলচিত্র। ছোটরাজার? সেই ক'টা চোখ, টিকালো নাক, গোলাপের পাপড়ির পাতলা রক্তিম ঠোঁট। ঠিক ছোটরাজার মতো দেখতে! ছবিটা ঐশিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বুঝতে পেরে মৃদু কৌতুকের হাসি যেন ফুটে উঠল রানিমার মুখে। তিনি প্রথমে বললেন, 'না ওটা ছোটরাজার ছবি নয়। বড়রাজার ছবি। এ-বাড়ির বংশধররা সব একই রকম দেখতে হয়। বিশেষত ওই ক'টা চোখ, রক্তিম ঠোঁট। আর এ বাড়ির পুরুষদের স্বভাবও বংশানুক্রমে একইরকম হয়...।'

এ-কথা বলার পর তিনি ইশারায় ঐশিকাকে কৌচটা দেখিয়ে দিলেন তার বসার জন্য। ঐশিকা বসল সেখানে। বেশ কিছুক্ষণ তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর রানিমা বললেন, 'আবারও শেষ একবার জিগ্যেস করছি, সত্যি বলছ তো তুমি? এই বংশের উত্তরাধিকারী তোমার পেটে?'

ঐশিকা জবাব দিল, 'সত্যি বলছি। আপনার বিশ্বাস না হলে কোনও ডাক্তারকে দিয়ে ব্যাপারটা পরীক্ষা করাতে পারেন। ছোটরাজার রক্ত বইছে তার দেহে।'

BanglaBook.org

রানিমা আর কিছু বললেন না। যে দরজা দিয়ে ঐশিকা ঘরে ঢুকেছে ঠিক তার উল্টো দিকেই একটা দরজা আছে সম্ভবত অন্দরমহলে যাবার জন্য। ভারী পর্দা টাঙানো আছে সে দরজাতে। ঐশিকার সঙ্গে আর কোনও কথাও না-বলে সে-দরজা দিয়ে অন্তর্হিত হলেন রানিমা। একলা ঘরে বসে রইল ঐশিকা। সে ভাবতে লাগল ছোটরাজা কোথায়? এ-বাড়িতেই, নাকি অন্য কোথাও? রানিমা কি তাকেই ঐশিকার আসার খবর দিতে গেলেন?

ঘরের এক কোণায় একটা গ্রান্ডফাদার ক্লকও আছে। তার টিকটিক শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই ঘরে। ঐশিকা ভাবতে লাগল এবার তার কি করা উচিত?

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই অবশ্য ঘরে ফিরলেন রানিমা। পোশাকটা কিছুটা পরিবর্তন করেছেন তিনি। শীত চলে গেলেও গায়ে একটা মহার্ঘ শাল চড়িয়েছেন। হাতে একটা ভ্যানিটি ব্যাগও আছে। রানিমা ঘরে ঢুকতেই এবার উঠে দাঁড়াল ঐশিকা। হাজার হোক এখন তাকে শাশুড়িমাতাই বলা যায়। তিনি ঐশিকার উদ্দেশ্যে বললেন, আমি দশ মিনিটের মধ্যেই আসছি। কাছেই একটা দোকান আছে সেখান থেকে মিঠাই নিয়ে।

বরফ কি তবে গলছে? ঐশিকা প্রথমে বলল, 'না, না, ও-সবের কোনও দরকার নেই।'

রানিমা জবাব দিলেন, 'তা কি হয়? এমন সুসংবাদ দিলে তুমি।'

ঐশিকা একটু লজ্জিতভাবে বলল, 'বলছি তো ও সবের দরকার নেই। ছোটরাজা কোথায়?'

রানিমা জবাব দিলেন, 'দোতলায় আছে। সন্ধ্যা হলে নীচে নামবে। তবে তাকে এখন ডাকা যাবে না। হয়তো সে ঘুমোচ্ছে। এ বংশের কতগুলো নিয়ম আছে। পুরুষরা যখন বিশ্রাম নেন তখন তাকে ডাকা যায় না। তা তিনি সন্তানই হন, স্ত্রী-ই হন, পিতা-ই হন না কেন। এটাকে তুমি সামাজিক অনুশাসনও বলতে পারো এ বংশের। তুমি এখানেই থাকো, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরে থেকে আসছি।'

৩

চলে গেলেন রানিমা। একলা ঘরে চুপচাপ বসে রইল ঐশিকা। ঘরের বাইরে থেকে মাঝে মাঝে পায়রার ডাক স্পষ্টভাবে ভেসে আসছে। এছাড়া কোনও

BanglaBook.org

শব্দ নেই। ঐশিকার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল, এখনই সে ছুটে যায় ছোটরাজার কাছে। কিন্তু রানিমা বলে গেলেন যে, এ-বাড়িতে পুরুষদের বিশ্রামের সময় তাদের ডাকা যায় না। ঐশিকা এ-বাড়ির বধূ হতে চলেছে। পারিবারিক অনুসাশন তারও মেনে চলা উচিত। কাজেই সে-ঘরেই বসে রইল ঐশিকা।

রানিমা সত্যিই ফিরতে বেশি দেরি করলেন না। বাড়িতে ঢুকে তিনি সোজা চলে গেলেন অন্দরে। তারপর তিনি ঘরে ঢুকলেন হাতে একটা রুপোর রেকাবি আর বেশ বড় একটা শ্বেতপাথরের গ্লাস নিয়ে। রেকাবিতে রাখা বেশ কয়েকটা সন্দেশ আর গ্লাসে রয়েছে লালচে রঙের শরবত। পেস্তা, জাফরান ভাসছে তার ওপর। ঐশিকার সামনের টেবিলের ওপর সেগুলো নামিয়ে রেখে রানিমা বললেন, 'এগুলো খেয়ে নাও। আমি এখন বিশ্রাম নিতে যাব। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ আবার দেখা হবে। ছোটরাজা তার আগেই নিশ্চয়ই নীচে নামবে। ইচ্ছা করলে বাড়িটা তুমি ঘুরে দেখতে পারো। এখন এটা তোমারও তো বাড়ি। এ-বাড়ির উত্তরাধিকারীকে পেটে ধারণ করেছ তুমি...।'

শেষ কথাগুলো বলার সময় যেন আবছা হাসি ফুটে উঠল রানিমার ঠোঁটের কোণে। সম্পর্কের বরফ সত্যিই গলছে, নাকি তা শ্লেষের হাসি, ঠিক বুঝতে পারল না ঐশিকা। ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে গেলেন রানিমা।

মিষ্টি বা এই ঘোল জাতীয় শরবত কোনওটাই তেমন পছন্দ করে না ঐশিকা। তাছাড়া ইদানীং খেতে ভালো লাগে না তার। খিদেও নেই। তবে রানিমা যখন তাকে যত্ন করে দিয়েছেন তখন ঐশিকা না খেলে তিনি অসম্মানিত হতে পারেন তাই খাবারটা খেতে হবে তাকে। ঐশিকা ভাবল, সে পরে খেয়ে নেবে সন্দেশ আর শরবত, রানিমা তো আর সন্ধ্যার আগে আসবেন না। তার আগে হাবেলিটা একবার ঘুরে দেখা যাক।

কৌচ থেকে ঐশিকা উঠে পড়ল। রানিমা যেখান দিয়ে অন্তর্হিত হলেন সেই দরজার ভারী পর্দা সরিয়ে ঘরের বাইরে পা রাখতেই এ-বাড়ির অন্দরমহলটা দেখতে পেল ঐশিকা। শ্বেতপাথরের একটা বাঁধানো উঠোন মতো জায়গা। আর তাকে বেষ্টন করে মন্দির সংলগ্ন সার সার ঘর। দোতলাতেও অমনই ঘর আছে অলিন্দ সংলগ্ন। পাথরের নকশা-কাটা জাফরি দিয়ে দোতলার বারান্দাটা। শ্বেতপাথরের উঠোনে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা পেখম তোলা পায়রা।

অলিন্দ ধরে হাঁটতে শুরু করল ঐশিকা। নিস্তব্ধ অলিন্দ। এক পাশে দরজা বন্ধ সার সার ঘরগুলো ধীর পায়ে অতিক্রম করছিল ঐশিকা। সামনে অলিন্দর

BanglaBook.org

শেষ প্রান্তে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। তার এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রমাণ আকারের ব্রোঞ্জের মূর্তি। মূর্তিটা দেখার জন্যই সেদিকে ঐশিকা এগোচ্ছিল।

কিন্তু হঠাৎ এক ঝটাপট শব্দ শুনে ঐশিকা তাকিয়ে দেখল ভিতরের উঠোন থেকে অলিন্দে লাফিয়ে উঠেছে বেশ বড় একটা সাদা রঙের বিড়াল। তার মুখে ধরা একটি ময়ূরপঙ্খি পায়রা। সে ডানা ঝাপটিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে বিড়ালটার মুখ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য। বিড়ালটা অলিন্দে উঠে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে তাকাল ঐশিকার দিকে, তারপর অনেকটা ভ্রূক্ষেপহীন ভাবেই ঐশিকার কিছুটা তফাত দিয়ে সে এগোল সিঁড়ির দিকে। বিড়ালটা যখন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে যাচ্ছে ঠিক তখনই পায়রাটা একবার প্রচণ্ড জোরে ডানা ঝাপটিয়ে উঠল বাঁচার জন্য। আর তাতেই হুঁশ ফিরল ঐশিকার। ছোট রাজার শখের অত সুন্দর পেখম তোলা পায়রাটাকে মেরে ফেলতে চলেছে বিড়ালটা। ওর মুখ থেকে ছাড়িয়ে নিলে তখনও হয়তো বেঁচে যাবে পায়রাটা।

ঐশিকা তাই এগোল বিড়ালটার পিছনে। সিঁড়ি বেয়ে বিড়ালটার পিছন পিছন দোতলাতে উঠে গেল সে। বিড়ালটা এবার মনে হয় বুঝতে পারল, ঐশিকা তার মুখ থেকে খাবারটা কেড়ে নিতে এসেছে। সে লাফিয়ে দ্রুত ছুটতে শুরু করল সামনের দিকে। ঐশিকাও এগোল অলিন্দ বেয়ে। জাফরি ঢাকা অলিন্দে আঁধো আলো-ছায়া খেলা করছে। সামনে একটা ঘর। লাল রঙের মখমলের পর্দা ঝুলছে দরজায়। ঐশিকা পৌঁছে গেল সেই দরজার সামনে। অন্য ঘরগুলোর দরজা বন্ধ। এই একটি মাত্র ঘরেরই দরজা খোলা। বিড়ালটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। তবে কি এ ঘরেই ঢুকল?

কিন্তু এ কার ঘর? কে আছেন ঘরের ভিতর জানা নেই ঐশিকার। ঘরের ভিতর ঢোকা সমিচিন বোধ করল না ঐশিকা। সে এবার ফিরতে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় পর্দা ঠেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল একজন-ড্রেসিং গাউন পরা ছোটরাজা চান্দেল সিং!

মুহূর্তের দৃষ্টি বিনিময়। তার পরই ছোটরাজা বলে উঠল, 'তুমি এসেছ! আমি জানতাম তুমি আসবে।'

তাকে দেখে ঐশিকা বিহ্বলভাবে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, এসেছি। তোমার কথাই সত্যি হল। তোমার সন্তানের মাতৃত্বের অধিকার নিয়েই আজ কবুতর মহলের অন্দরে প্রবেশ করলাম।'

ঐশিকা হয়তো আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই ছোটরাজা

BanglaBook.org

জড়িয়ে ধরল ঐশিকাকে। তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকে ছুড়ে দিল পালকের গদি-আটা নরম পালঙ্কের ওপর। ঐশিকার শরীরটা ডুবে গেল পালঙ্কের ভিতর। তারপর ঐশিকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কপালে, গালে প্রচণ্ড আবেগে চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিতে লাগল ছোটরাজা।

এক সময় ছোটরাজার ঠোঁট এসে থামল ঐশিকার ঠোঁটের ওপর। মৃদু একটা আঁশটে গন্ধযুক্ত নোনতা স্বাদ আছে ছোটরাজার জিভে, ঠোঁটে। যে স্বাদ পাগল করে দেয় ঐশিকাকে। ছোটরাজা তার ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াতেই মুহূর্তের মধ্যে জেগে উঠতে শুরু করল ঐশিকার দেহ। জেগে উঠতে শুরু করল উপবাসী চান্দেলের দেহও। এক ঝটকায় নিজের ড্রেসিং-গাউনটা খুলে মেঝেতে ছুড়ে ফেলল ছোটরাজা। সম্পূর্ণ নিরাবরণ শরীর তার। ছোটরাজা এরপর খুলে ফেলতে লাগল ঐশিকার পোশাকও। বাঁধা দিল না ঐশিকা। একবার শুধু সে অস্পষ্টভাবে বলল 'দরজা খোলা, যদি কেউ চলে আসে?'

ছোটরাজা জবাব দিল, 'কেউ আসবে না, কেউ আসবে না....' সে ডুবে গেল ঐশিকার শরীরের ভিতর। ছোটরাজার ঠোঁট নেমে এল ঐশিকার ঠোঁটে। তারপর তা ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল ঐশিকার গলা ছুঁয়ে দুই স্তনবৃন্তে, সেখান থেকে নাভিতে, অবশেষে আরও নীচে তার দু পায়ের ফাঁকে। অস্ফুট চিৎকার করে ঐশিকা খামচে ধরল ছোটরাজার মাথার চুল। এরপর চূড়ান্ত সম্ভোগের জন্য প্রস্তুত হল ছোটরাজা। ঐশিকার পা দুটোকে দু-পাশে ফাঁক করে নিজের দেহকে ঐশিকার দেহের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে যাচ্ছিল সে। কিন্তু চূড়ান্ত ভালোবাসার কাজটা করতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সংবরণ করে নিল ছোটরাজা। ঐশিকার চোখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'না, এ কাজ করা ঠিক হবে না এখন। যদি আমাদের সন্তানের কোনও ক্ষতি হয়ে যায়!'

ছোটরাজার কথায় যেন পরম মমত্ব ঝরে পড়ল ঐশিকার গর্ভে সদ্য বিকশিত সন্তানের ওপর। এরপর সে ঐশিকার পেটে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'দেখবে ছেলে হবে তোমার। আমার মতো ফর্সা গায়ের রং, কটা চোখ, টিকালো নাক, পাতলা রক্তিম ঠোঁট। আমাদের বংশে শুধু ছেলেই জন্মায়। সকলেই তারা প্রায় একইরকম দেখতে আর একই স্বভাবের হয়। আমার বাবা-ঠাকুর্দা সবাই প্রায় একই চেহারার। স্বভাব চরিত্র আমার মতোই ছিল। যে আসছে সে-ও ঠিক আমারই মতো হবে...।'

এরপর ছোটরাজা ঐশিকাকে বলল, 'তোমাকে একটা মজার কথা বলি। যদি তোমাকে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করে এনে তারপর শারীরিকভাবে

BanglaBook.org

প্রথম মিলিত হতাম তবে কিন্তু প্রথম মিলিত হতাম ওই বিল্লি মহলেই। ওখানে প্রথম মিলনেই নাকি গর্ভ সঞ্চার হয়েছিল আমার মা-ঠাকুমাদের, আর প্রত্যেকেরই পুত্রসন্তান। বংশানুক্রমে এ-পরিবারের নারী-পুরুষরা মিলিত হয় ওখানে। এটাই প্রথা। সেজন্য আমি নিশ্চিত ছিলাম তোমার গর্ভে সন্তান আসবেই।

এ কথা বলে ঐশিকাকে জড়িয়ে ধরে বিছানায় শুয়ে পড়ল ছোটরাজা চান্দেল। ঐশিকার নগ্ন শরীর স্পর্শ করতে লাগল সে। না, যৌনতার স্পর্শ নয়; পরম মমতা, ভালোবাসা, নির্ভরতার স্পর্শ। ঐশিকাও তার বুকে মুখ গুজে শুয়ে পড়ল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল, তারপর সন্ধ্যাও নামতে শুরু করল।

এক সময় হুঁশ ফিরল ঐশিকার। সে উঠে বসে বলল, 'এবার নীচে নামতে হবে। রানিমা আসতে বারণ করেছিলেন, ঘটনাচক্রে চলে এসেছি। উনি জানতে পারলে ভুল বুঝবেন।'

ছোটরাজা উঠে বসে জানতে চাইলেন, 'তার সঙ্গে কী কথা হল তোমার?'

ঐশিকা তার জবাবে এই হাবেলিতে আসার পর রানিমার সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে তা বিস্তারিতভাবেই বলল।

ছোটরাজা শুনে বলল, 'মেঘ কেটে যাচ্ছে বলে মনে হয়। হাজার হোক তোমার পেটে যে আসছে সে এ-বাড়িরই সন্তান। তাকে তো আর ফেলে দিতে পারবেন না তিনি। এর আগে বহুবার আমার বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল, কিন্তু তা সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করেছিলেন রানিমা।'

ঐশিকা প্রশ্ন করল, 'বাতিল করেছিলেন কেন? আমার ব্যাপারেই বা তার আপত্তির কী ছিল? বংশগরিমা? নাকি বাঙালি, অন্য ভাষার মেয়ে বলে?'

প্রশ্নটা শুনে একটু চুপ করে থেকে ছোটরাজা জবাব দিল 'না, ঠিক তেমন ব্যাপার নয়। আসলে আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। সম্ভবত তিনি এই ভেবে ভয় পান যে হাবেলিতে বউ এলে সে হয়তো আমাকে তাঁর থেকে দূরে ঠেলে দেবে।'

ঐশিকা শুনে বলল, 'বুঝলাম'।

ছোটরাজা এরপর বলল, 'কিন্তু এখন তাঁকে খুশি রাখা, তাঁর আশঙ্কা দূর করা প্রয়োজন তোমার। আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করার জন্যও তাঁকে আমাদের দরকার। আচ্ছা, তুমি কফি বানাতে পারো?'

ঐশিকা বলল, 'হ্যাঁ, পারি। কেন পারব না?'

ঘরের কোণে একটা গ্র্যান্ডফাদার ক্লক রাখা আছে। সেদিকে তাকিয়ে

BanglaBook.org

ছোটরাজা বলল, 'এখন ছ'টা বাজে। ঠিক সাড়ে ছ'টায় ঘর থেকে বেরোন তিনি। তারপর রসুইঘরে ঢুকে কফি বানান নিজের জন্য। চিনি কম। ঘড়ি ধরে বাঁধাধরা নিয়ম। সিঁড়ি দিয়ে নেমেই তিন নম্বর ঘরটাই হল রসুইঘর। সব মজুত আছে সেখানে। শিকল খুলে ঢুকলেই বুঝতে পারবে। আর তার দুটো ঘর পর-ই রানিমার ঘর। তুমি কফি বানিয়ে রানিমার ঘরে নক করবে। হাতে থাকবে কফির পেয়ালা। রানিমা দেখে খুশি হবেন। তিনি বুঝতে পারবেন যে আমাকে তাঁর থেকে কেড়ে নিতে আসোনি তুমি।'

ঐশিকা বলল, 'ঠিক বলছো। আমি তাঁকে খুশি রাখার চেষ্টা করব। আমি তবে কফি বানাতে নীচে যাই।'

পালঙ্ক থেকে উঠে পোশাক পরে নিল ঐশিকা। ছোটরাজাও ড্রেসিং গাউনটা আবার গায়ে চাপিয়ে দিয়ে বলল, 'আজকের দিনটা তোমার শোয়ার জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করবেন রানিমা। তিনি ঠিক রাত ন'টায় খাওয়া সেরে নিজের ঘরে দরজা দেন। ওঠেন বেলা আটটায়। তিনি রাতে দরজা দিলেই তুমি আমার আছে চলে আসবে। আর তিনি জেগে ওঠার আগে নীচে নেমে যাবে।। সারা দিনে তো দেখাসাক্ষাৎ হবেই।'

ঘর থেকে বেরোল ঐশিকা। তার পিছন পিছন দরজার বাইরে বেরোল ছোটরাজা। অন্ধকার বারান্দা। কিন্তু খুট্ করে একটা শব্দ হল। আলো জ্বলে উঠল। বাতিটা জ্বালাল ছোটরাজার সেই বুড়ো চাকর যোধ রাও। তাকে গতবার দেখেছে ঐশিকা। এ লোকটারও ওই বিল্লি মহলে যাওয়া-আসা আছে। কাছে এসে দাঁড়াল বুড়োটা। সে কিন্তু বিস্মিত হল না ঐশিকাকে দেখে। ঐশিকাকে সরাসরি 'ছোটরানিমা' সম্ভাষণ করে বলল, 'আপনি এসেছেন জানি। ছোটরানিমা, আপনি যখন বিল্লি মহলের পাশ দিয়ে আসছিলেন তখন আমি ওই মহলের ভিতরেই ছিলাম।'

যোধ রাওয়ের কথাটা শুনে ছোটরাজা বলে উঠল, 'তুমি বিল্লি মহলে গেছিলে!'

যোধ রাও বলল, 'হ্যাঁ, গেছিলাম। কারণ জিনিসটা পাওয়া গেছে।'

কথাটা শুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ছোটরাজার চোখ। তারপর সে ঐশিকার উদ্দেশ্যে বলল, 'আজ রাতে আমি বাইরে থাকব। কাজ আছে। একটু পরেই বেরিয়ে যাব আমি।' তারপর যোধ রাওকে বলল, 'তুমি ছোটরানিমার খেয়াল রাখবে। যেন কোনও অসুবিধা না হয়।'

যোধ রাও জবাব দিল, 'যো হুকুম ছোটরাজা।'

ঐশিকা এবার পা বাড়াল সিঁড়ির দিকে।

BanglaBook.org

নীচে নেমে এল ঐশিকা। অলিন্দে বেশ কয়েকটা আলো জ্বলছে। যোধ রাও-ই সম্ভবত বাতি জ্বালাতে জ্বালাতে ওপরে উঠেছে। তবে এখানে ভোল্টেজ মনে হয় কম থাকে। আলোগুলো কেমন যেন ম্যাটম্যাটে বিবর্ণ। ছোটরাজার কথামতো রসুইঘরটার শিকল খুলে ভিতরে ঢুকল ঐশিকা। দেওয়ালে দরজার পাশেই সুইচ বোর্ড। ঐশিকা বাতি জ্বালিয়ে ফেলল। আগাগোড়া শ্বেতপাথর মোড়া একটা ঘর। ঐশিকার ফ্ল্যাটের বেডরুমও এত সুন্দর মহার্ঘ্য নয়। দেওয়ালের গায়ে অনেক তাক। তাতে থরে থরে সাজানো আছে রুপোর বাসন, পের্সিছের ডিনার সেট, কাট গ্লাসের পানপাত্র এসব। আর আছে পিতলের তৈরি বিরাট বিরাট কলস, গামলা, বারকোষ-থালা ইত্যাদি প্রাচীন বাসনপত্র।

ঘরের একপাশে বিরাট একটা শ্বেতপাথরের স্ল্যাব বসানো। রান্নার ব্যবস্থা সেখানেই। গ্যাস ওভেন বসানো আছে। আর জায়গাটার গায়ের দেওয়ালে তাকের মধ্যে ছোট-বড় বিভিন্ন মুখবন্ধ কাচের পাত্রে রাখা আছে রান্নার নানান উপকরণ। ঐশিকা গিয়ে দাঁড়াল সেখানে। ওভেনের কাছেই বেশ বড় একটা রুপোর বাটি রাখা। তার ভিতর লেগে থাকা অবশিষ্ট কিছু তরল। তার রং দেখে ঐশিকা বুঝতে পারল যে-তাকে দেবার জন্য এ পাত্রটাতেই শরবত বানিয়েছিলেন রানিমা। এবার তার খেয়াল হল, সেই শরবত বা সন্দেশ কোনওটাই খাওয়া হয়নি। রানিমা ব্যাপারটা দেখলে দুঃখ পাবেন। হয়তো বা অসম্মানিতবোধও করতে পারেন। কথাটা মনে হতেই ঐশিকা ভাবল, 'তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে গিয়ে সে জিনিসগুলো কিছুটা অন্তত খেয়ে তারপর এসে রানিমার জন্য কফি বানানো যাক।'

ঐশিকা জায়গাটা থেকে সরতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ একটা ছোট জিনিস চোখে পড়ল। একটা ওষুধের ফয়েল পড়ে আছে রুপোর বাটিটার ঠিক পাশে কীসের ওষুধ?

ফয়েলটা হাতে নিল ঐশিকা। তার ভিতরের ওষুধগুলো সব বার করে নেওয়া হয়েছে। সে সেটা আবার রেখে দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ-ই যেন অন্য একটা সত্ত্বা কাজ করে উঠল তার ভিতর। অন্য ফয়েলটা হাতে নিয়ে তার গায়ের খুদে খুদে হরফগুলো পড়তে লাগল সে। ওষুধটা কীসের তা

BanglaBook.org

না বুঝতে পারলেও ফয়েলের গায়ে একটা বিধিসম্মত সতর্কীকরণ দেখে চমকে উঠল সে। ইংরাজী কথাটার তর্জমা করলে দাঁড়ায়, 'গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার নিষিদ্ধ। গর্ভপাত ঘটতে পারে।'

লেখাটা পরে কেঁপে উঠল ঐশিকা। রানিমা কি তবে ওই শরবতে এই ওষুধ মিশিয়েছেন তার গর্ভস্থ ভ্রূণটাকে নষ্ট করে দেবার জন্য! নইলে এই শরবত গোলার পাত্রের পাশে এই ওষুধের শূন্য ফয়েল কেন?

কিন্তু এ-ও কি সম্ভব? হতে পারে রানিমা তাঁর ছেলের বিয়ে দিতে চান না বা ঐশিকাকে পছন্দ করছেন না। তা বলে তার জন্য এত বড় কাণ্ড ঘটাতে চলেছিলেন তিনি?

ঐশিকার মাথার ভিতরটা যেন কেমন করে উঠল। ফয়েলটাকে হাতের মুঠোতে নিয়ে টলতে টলতে রসুইঘর থেকে বেরিয়ে অলিন্দ অতিক্রম করে সে ফিরে এল সেই ঘরে। সেখানে টেবিলের ওপর তখনও রাখা আছে সেই সন্দেশের প্লেট আর শরবতের গ্লাসটা। কৌচটার ওপর ধপ্ করে বসে পড়ে দুহাতে মাথা চেপে ধরে সামনের টেবিলের খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল সে।

তার কী করা উচিত কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না ঐশিকা। একবার সে ভাবতে লাগল যে ওপরে উঠে গিয়ে ব্যাপারটা জানিয়ে আসে ছোটরাজাকে। আবার পরক্ষণেই তার মনে হতে লাগল, 'হয়তো এটা রানিমায়ের-ই কোনও ওষুধ হতে পারে। শরবতের পাত্রের পাশে ফয়েলটা পড়ে থাকাটা নেহাতই কাকতালীয় ঘটনা।' আবার কখনও তার মনে হতে লাগল, 'না, না, এটা কখনওই কাকতালীয় নয়। এমন সমাপতন কি সম্ভব? খবরের কাগজে তো নানা ঘটনা শোনা যায়, মা ছেলেকে খুন করছে, ছেলে বাবাকে খুন করছে। আর আমি তো রানিমার কাছে নেহাতই বাইরের লোক।' নানা পরস্পর বিরোধী ভাবনা ভাবতে লাগল সে। সময় এগিয়ে চলল।

রানিমা ঘরে ঢুকলেন অনেক পরে। তখন প্রায় রাত সাড়ে আটটা বাজে। তাঁর হাতে একটা রুপোর থালায় পুরি, সব্জি এবং আরও বেশ কিছু খাবার। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তিনি বললেন, 'তোমার জন্য একটা ঘর সাজিয়ে এলাম, আর রাতের খাবারও বানিয়ে আনলাম।' কিন্তু থালা নিয়ে টেবিলের কাছে এগিয়ে এসেই সন্দেশের প্লেট আর শরবতের গ্লাসটার দিকে তাকিয়ে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, 'এগুলো তুমি খাওনি কেন?'

ঐশিকা ঠিক কী বলবে তা বুঝে উঠতে না পেরে চুপ করে রইল।

BanglaBook.org

খাবারের থালাটা টেবিলের একপাশে নামিয়ে রেখে রানিমা আবারও প্রশ্ন করলেন, 'খাওনি কেন? শরীর খারাপ?'

কোনও জবাব দিল না ঐশিকা।

আঁতে ঘা লাগল রানিমার। বেশ একটু গলা চড়িয়ে তিনি বললেন, 'এত কষ্ট করে দুপুর রোদে বেরিয়ে তোমার জন্য মিঠাই আনলাম, শরবত বানালাম; তুমি খেলে না?'

ঐশিকা এবার মুখ খুলল। সে বলল 'না খেলাম না। ইচ্ছা করেই খাইনি।'

রানিমা আরও গলা চড়িয়ে বললেন, 'একে তো আমাকে বোকা বানিয়ে তোমরা চোরের মতো সম্পর্ক তৈরি করেছ। তার ওপর বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই এত অপমান?'

ঐশিকা 'চোরের মতো' শব্দটা শুনে উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'খাইনি বেশ করেছি। যে খাবার আনলেন তা-ও নিয়ে যান। আপনার দেওয়া কোনও খাবারই আমি খাব না।'

রানিমা আর ঐশিকার চিৎকার চেচামেচি শুনে পর্দা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল যোধ রাও। ঘরের ভিতর ঢুকে একটু জড়সড় হয়ে তাদের দুজনের দিকে তাকাল সে। রানিমা তাকে দেখলেও তেমন ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তিনি ঐশিকার উদ্দেশে বললেন, 'খাবে না মানে? কেন তুমি খাবে না সে কথা বলতে হবে।'

ঐশিকা এবার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। হাতের মুঠো খুলে ফয়েলটা রানিমাকে দেখিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, 'এটা কী? রসুইখানায় শরবতের পাত্রের পাশে এটা ছিল কেন? আপনি আমার সন্তানকে খুন করার চেষ্টা করেছিলেন। এই শরবত আর সন্দেশ আমি নিয়ে গিয়ে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করাব।'

ঐশিকার হাতের ফয়েলটা দেখে, তার কথা শুনে ফ্যাকাশে হয়ে গেল রানিমার মুখ। রানিমা সম্ভবত বুঝতে পারলেন যে, তিনি ধরা পড়ে গেছেন। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, ওই সন্দেশে আর শরবতে ওষুধ মিশিয়েছি আমি। তোমার পেটে যে আছে সে পৃথিবীর আলো দেখুক তা আমি চাই না। তোমাকে পুত্রবধূ হিসাবে মেনে নিতে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আমি চাই না তোমাদের সন্তান জন্মাক।'

ঐশিকা একথা শুনে হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আরও

BanglaBook.org

জোরে চিৎকার করে উঠল, 'কেন? কেন? কেন? আমার পেটের সন্তান আপনার কী ক্ষতি করেছে? কী ক্ষতি করবে?'

ঐশিকার দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন রানিমা। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, তোমাকে আমি সবকথা ছোটরাজার সামনেই বলব। যোধ রাও, ছোটরাজাকে ডাকো।'

যোধ রাও একটু আমতা আমতা করে জবাব দিল, 'তিনি নেই, বাইরে গেছেন।'

'বাইরে গেছেন? কোথায় গেছেন? তাকে তো রাতে বাইরে যেতে বারণ করেছিলাম আমি।' এই বলে রানিমা এবার ঘুরে দাঁড়ালেন।

তিনি এরপর মাধো রাওকে প্রশ্ন করলেন, 'ছোটরাজা কোথায় গেছে বল?'

যোধ রাও বলল, 'আমি জানি না।'

ছোটরাজার সামনে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া প্রয়োজন। তাই ঐশিকা বলে উঠল, 'আমি ওপরে গেছিলাম দুপুরে। ছোটরাজার সঙ্গে যোধ রাওয়ের কথা হচ্ছিল। যোধ রাও তাকে বলল সে কী একটা জিনিস রেখে এসেছে বিল্লি মহলে। তারপর ছোটরাজা বলল যে, সে আজ রাতে এই হাবেলিতে থাকবে না।'

কথাটা শোনামাত্র ঘরের দেওয়ালের দিকে এগিয়ে এলেন রানিমা। দেওয়াল থেকে দোনলা বন্দুক আর কার্তুজের বেল্টটা নামিয়ে দুটো টোটা ভরে ফেললেন বন্দুকে। তারপর বন্দুকের নলটা যোধ রাওয়ের গলায় ঠেকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'বল সে কোথায় গেছে?'

যোধ রাও আবারও জবাব দিল, 'জানি না রানিমা।'

রানিমা তাঁর বন্দুকের নলটা আরও জোরে তার গলায় চেপে ধরে বললেন, 'আমার শরীরেও রাজপুতের রক্ত আছে। দরকারে আমিও মানুষ মারতে পারি। আমি ঠিক তিন গুনব।'

রানিমা গুনতে শুরু করলেন, 'এক...দুই...।'

এবার ভয় পেয়ে গেল যোধ রাও। সে বলে উঠল, 'ছোটরাজা বিল্লি মহলে গেছেন।'

পরমুহূর্তেই রানিমা বন্দুকটা ঘুরিয়ে তার বাঁট দিয়ে আঘাত করলেন যোধ রাওয়ের মাথায়। ছিটকে পড়ল যোধ রাও। রানিমা এরপর যেন অনেকটা আর্তনাদের স্বরেই বলে উঠলেন, 'দুপুরে মিঠাইওয়ালার দোকানে খবরটা যখন শুনলাম তখন ঠিক এই আশঙ্কাই করছিলাম। আজ এর নিষ্পত্তি করতে হবে।'

BanglaBook.org

এ-কথা বলে তিনি ঐশিকার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি এসো আমার সঙ্গে, চান্দেলের কাছে যাব আমি। সেখানে গেলে তুমি জানতে পারবে কেন তোমার পেটের বাচ্চাকে মারতে চেয়েছি আমি।'

ঐশিকা পুরো ব্যাপারটাতে হতভম্ব। সে দাঁড়িয়ে রইল।

তা দেখে রানিমা ধমকের স্বরে বলে উঠলেন, 'এসো বলছি। ব্যাপারটা তোমার জানা দরকার।'

কিছুটা রানিমার হাতের উদ্যত বন্দুকের ভয়ে, আর কিছুটা ছোটরাজাকে সামনে রেখে রানিমার ওষুধ মেশানোর ব্যাপারটা ফয়সালা করার জন্য ঐশিকা বলল, 'ঠিক আছে চলুন।'

রানিমার সঙ্গে কবুতর মহল ত্যাগ করল ঐশিকা।

৫

আকাশে বেশ বড় চাঁদ উঠেছে। সেই আলোতে দাঁড়িয়ে আছে নির্জন পরিত্যক্ত প্রাচীন হাবেলিগুলো। কেমন যেন ভৌতিক অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা! কোথাও কোনও শব্দ নেই। হাবেলিগুলোর সর্পিল গলি বেয়ে বন্দুক হাতে রানিমা এগোতে থাকলেন। তাঁকে অনুসরণ করল ঐশিকা। অবশেষে রানিমা পৌঁছে গেলেন সেই বিল্লি মহলের সামনে।

বাড়িটার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন রানিমা। মনে হয় তিনি শোনার চেষ্টা করলেন, হাবেলির ভিতর থেকে কোনও শব্দ ভেসে আসছে কিনা?

না, কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না বাড়ির ভিতরে। অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে আছে বিল্লি মহলে। শুধু বিন্দু বিন্দু আলো যেন নড়ে বেড়াচ্ছে কার্নিসের মাথায়, দোতলার অলিন্দে, অথবা নীচের বারান্দায়। বিড়ালের চোখ।

রানিমা ইশারায় কোনও শব্দ না-করতে বললেন ঐশিকাকে। তারপর বন্দুকটা উঁচিয়ে ধরে ঐশিকাকে নিয়ে উঠে পড়লেন বিল্লি মহলের অন্ধকার অলিন্দে। একের পর এক ঘর, অলিন্দে ছোটরাজাকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন তিনি। এ-জায়গার প্রতিটা ঘর-অলিন্দ কত চেনা ঐশিকার। এ-জায়গার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ছোটরাজার সঙ্গে ঐশিকার মিলনের কত স্মৃতি। জায়গাটাই এখন কত যেন অচেনা লাগছে তার কাছে। কেমন এক অপার্থিব পরিবেশ বিরাজ করছে চারপাশে! শুধু মাঝে মাঝে সেই বিন্দু বিন্দু আলো নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে

BanglaBook.org

এখানে-সেখানে। অন্ধকারের সঙ্গে নিঃশব্দে পদচারণা করছে এ-হাবেলির বাসিন্দারা, মার্জারের দল।

যার খোঁজে রানিমা এসেছেন অবশেষে একসময় তার সন্ধান মিলল। নানা ঘর ঘুরে বাড়ির পিছনের অংশের অলিন্দে এসে একটা থামের কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়ালেন রানিমা। থামের আড়ালে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তিনি আঙুল দিয়ে থামের ও-পাশটা দেখালেন।

ঐশিকাও থামের আড়াল থেকে তাকাল সেদিকে। থামের ওপাশেই চারপাশ ঘেরা বাঁধানো একটা উন্মুক্ত জায়গা। মাথার ওপর থেকে চাঁদের আলো সরাসরি এসে পড়েছে সেখানে। একটা পাথরের বেদিতে বসে আছে ছোটরাজা চান্দেল সিং। বসার ভঙ্গিমাটা একটু অদ্ভুত। মাথাটা একদম কোলের ওপর ঝোঁকানো।

রানিমা যেন অনেকটা স্বগতির স্বরে বললেন, 'শেষপর্যন্ত বাপ-ঠাকুর্দার পথ-ই ধরল ও। শুধু পায়রাতে ওর সাধ মিটল না। ওর জন্যই তো এত পায়রা পোষা বাড়িতে।'

এরপর তিনি ঐশিকাকে বললেন, 'ভালো করে খেয়াল করো তোমার প্রেমিকের দিকে' ছোটরাজার দিকে।

ছোটরাজার কোলে যেন একটা কী আছে! ছোট পুতুলের মতো একটা পা ঝুলছে না ছোটরাজার কোল থেকে? শিশু, নাকি পুতুল, ছোটরাজা চান্দেলের কোলে? একটা ছোট্ট বাচ্চাই তো মনে হচ্ছে!

চান্দেল কি তবে বিবাহিত? সন্তান আছে তার? চান্দেল চুমু খাচ্ছে তাকে? এ জন্যই কি রানিমা ঐশিকার সঙ্গে ছোটরাজার বিয়েতে বা তার সন্তান ধারণে সম্মত নন? মুহূর্তের মধ্যে এ-প্রশ্নগুলো ঘুরপাক খেয়ে গেল ঐশিকার মনে। সে আর উত্তেজনার চাপ সহ্য করতে পারল না। থামের আড়াল থেকে লাফিয়ে নেমে এগোল ছোটরাজার দিকে...

ঐশিকার পায়ের শব্দে হুঁস ফিরল ছোটরাজার। কোলের থেকে মুখ উঠিয়ে ছোটরাজা চান্দেল তাকাল ঐশিকার দিকে। ছোটরাজার কটা চোখ এখন ঠিক বিড়ালের মতোই জ্বলছে। তার কোলে যে আছে সে একটা নগ্ন শিশু। হয়তো বা এক বছর বা তার কাছাকাছি বয়স হবে তার। ঐশিকাকে দেখামাত্রই ছোটরাজা শিশুটার নিস্পন্দ ছোট্ট শরীরটাকে বেদির ওপর রেখে উঠে দাঁড়াল। চাঁদের আলো এসে পড়েছে ছোটরাজা চান্দেলের মুখে। সেই আলোতে ঐশিকা স্পষ্ট দেখতে পেল ছোটরাজার ঠোঁটের কষের একপাশ বেয়ে একটা রক্তধারা চিবুক ছুঁয়ে নামছে গলার দিকে!

BanglaBook.org

নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না ঐশিকা। ব্যাপারটা সে এবার ধরে ফেলেছে। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে সে ছোটরাজাকে বলল, 'তুমি বাচ্চাটার রক্ত খাচ্ছ?'

মুহূর্ত খানেক চুপ করে থাকল ছোটরাজা। তারপর যেন একটু কাতর কণ্ঠে বলল, 'তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না। আমি তোমাকে সত্যি ভালোবাসি। এ ভালোবাসায় কোনও মিথ্যা নেই। আমি কোনও প্রেতাত্মা নই। আমিও মানুষ। এ আমাদের বংশের নেশা...।'

ঐশিকা তার কথা শুনে আর্তনাদ করে বলে উঠল, 'না! তুমি মানুষ নও। মানুষ হলে কেউ মানুষের রক্ত খেতে পারে?'

ছোটরাজা এরপর আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু পর মুহূর্তে বন্দুকের শব্দে কেঁপে উঠল চারপাশ। গুলি চালিয়ে দিয়েছেন রানিমা। আর তার আঘাতে ছোটরাজার দেহটা ছিটকে পড়ল কিছুটা তফাতে।

ঘটনাগুলোর অভিঘাতে যেন পাথরের মূর্তি বনে গেল ঐশিকা। রানিমাও এবার অলিন্দ ছেড়ে নীচে নেমে এলেন। জলের ধারা গড়াচ্ছে তাঁর চোখের কোণ বেয়ে। ঐশিকার কাঁধে হাত রেখে তিনি ছোটরাজার দেহটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাজ শেষ। শেষ পর্যন্ত আমাকে করতে হল। বাচ্চা নিখোঁজের ব্যাপারটা আমি দুপুরে বাইরে বেরিয়েই শুনেছিলাম...।'

আতঙ্কিত স্বরে ঐশিকা বলে উঠল, 'ছোটরাজা কি মানুষ? নাকি কোনও প্রেতাত্মা?'

রানিমা বললেন, 'না, মানুষ-ই। আমি ওকে গর্ভে ধারণ করেছিলাম। তবে বংশ পরম্পরায় ওরা বিশেষ ধরনের মানুষ। অনেকটা বিড়ালের স্বভাবজাত। কটা চোখ, রোমশ দেহ, ছোট ছোট তীক্ষ্ণ দাঁত, পায়রা ধরে খায়। আর এই পায়রার রক্তের স্বাদ পেতে পেতেই এক সময় মানুষের রক্তেও আকৃষ্ট হয় ওরা। শুনেছি ওর কোনও এক পূর্বপুরুষ নাকি একটা গর্ভবতী বিড়ালকে গুলি করে মেরেছিলেন এই বিল্লি মহলে। তারপর থেকেই এমন সন্তান জন্ম নেয় এ-বংশে। তোমার গর্ভেও যে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে, সে-ও...।'

রানিমা কথা শেষ করার আগেই হঠাৎ ছোটরাজার দেহটা নড়ে উঠল। উঠে বসার চেষ্টা করতে করতে ছোটরাজা বলে উঠলেন, 'আমাকে তুমি বাঁচাও ঐশিকা। আমাদের ভালোবাসাকে গর্ভে ধারণ করেছ তুমি। আমি যা-ই হই না কেন, আমাদের ভালোবাসা মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয়...।'

ছোট রাজাকে আবার উঠে বসার চেষ্টা করতে দেখে, তার কথা শুনে

BanglaBook.org

মুহূর্তের মধ্যে যেন কঠিন হয়ে উঠল রানিমার মুখ। ঐশিকা হয়তো বা নিজের অজান্তেই এগোতে যাচ্ছিল তার সন্তানের পিতার দিকে। কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে আবার গর্জে উঠল রানিমার হাতের বন্দুক। ছোটরাজার দেহটা মাটিতে পড়ে-থাকা অবস্থাতেই পাক খেল কয়েকবার। এক অদ্ভুত আর্তনাদ বেরিয়ে এল ছোটরাজা চান্দেলের গলা থেকে। যেন কোনও বিড়ালের-ই আর্তনাদ! স্থির হয়ে গেল ছোটরাজার দেহ।

কিন্তু ছোটরাজার সেই মৃত্যু-আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গেই একটা অদ্ভুত ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটল। হঠাৎ-ই যেন জেগে উঠল বিল্লি মহল। যেখানে যত বিড়াল ছিল তারা ছোটরাজার সেই কণ্ঠস্বর শুনে একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল। তারপর তারা ছুটে আসতে লাগল অন্ধকার হাবেলির ভিতর থেকে, অথবা দোতলার কার্নিস-অলিন্দ থেকে লাফিয়ে পড়ল ঐশিকারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। অনেক অনেক বিড়াল! বিল্লি মহলের সব বিড়াল এসে সমবেত হল সেখানে। একবার তারা তাকাল মাটিতে পড়ে থাকা নিস্পন্দ ছোটরাজার শরীরের দিকে। তারপর একসঙ্গে বিড়ালগুলো চিৎকার করে উঠল।

না, করুণ স্বর নয়, ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ এক রক্ত-জল-করা ডাক। আর তার পরই তারা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানিমার ওপর, তাঁকে আঁচড়ে কামড়ে শেষ করার জন্য। গুলিহীন বন্দুক খসে পড়ল রানিমার হাত থেকে। তাঁকে ফালা ফালা করতে শুরু করছে বিড়ালগুলো। এ-অবস্থার মধ্যেই রানিমা বলে উঠলেন, 'ওরা আমাকে বাঁচতে দেবে না, ওদের রাজাকে মেরে ফেলেছি আমি। কিন্তু ওরা তোমাকে এখন মারবে না। রাজার সন্তানকে যে গর্ভে ধারণ করে আছ তুমি। তুমি পালাও এখান থেকে। কিন্তু তোমার গর্ভের সন্তানকে বাঁচিয়ে রেখো না। সে-ও তার বাপের মতোই হবে। মেরে ফেলো, মেরে ফেলো তাকে।'

কথাগুলো বলে মাটিতে পড়ে গেলেন রানিমা। বিড়ালগুলো জান্তব আক্রোশে ছিঁড়তে লাগল তাঁর দেহ।

ঐশিকা এবার সম্বিত ফিরে পেয়ে ছুটতে শুরু করল বিল্লি মহলের বাইরে যাবার জন্য। বিড়ালগুলো কিন্তু তাকে বাঁধা দিল না...

BanglaBook.org

প্রজাপতির পাখা

নৃসিংহ চৌধুরীর দিনলিপি :

১লা আগস্ট, পশ্চিম গারো পাহাড়, মেঘালয় :

শিলং থেকে আজ বেলা দশটা নাগাদ পশ্চিম গারো পাহাড়ের এই ছোট্ট গ্রামটায় এসে পৌঁছেছি। যদিও এই টিম্বাটু গ্রামটা 'ইন্দো-মায়ানমার বায়ো ডাইভার্সিটি হটস্পটের' অন্তর্গত, অফুরান জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ এ অঞ্চলে শুধু ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমার মতো 'বাটার ফ্লাই ক্যাচার' বা প্রজাপতি শিকারিরা এখানে এসে উপস্থিত

BanglaBook.org

হন, তবুও এখানে থাকার জন্য তেমন কোনও হোটেল গড়ে ওঠেনি।

এখানে থাকতে হলে পাহাড়ের ঢালে গ্রামের কোনও কুঁড়েতেই মাথা গুঁজতে হয়। কাঠের অথবা পাথরের তৈরি কয়েকটা বাড়ি অবশ্য এখানে আছে, কিন্তু সেগুলো হয় সরকারি সম্পত্তি অথবা একান্ত ব্যক্তিগত আবাসস্থল। তা ভাড়া দেবার জন্য নয়। আমার কপাল অবশ্য এবার ভালো। আমি এবার আশ্রয় পেয়েছি ডক্টর শেফিল্ডের ছবির মতো সুন্দর কাঠের বাড়িটাতে।

গত বছর এখানে এসে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ডক্টর শেফিল্ডকে 'ইংরেজ' বলা যেতেই পারে। খাঁটি ইংরেজ রক্ত প্রবাহিত তার দেহে। যদিও তিনি নিজেকে 'গারো' হিসাবেই পরিচয় দিতে ভালোবাসেন। শেফিল্ডের ঠাকুরদা একশো বছর আগে এখানে মিশনারি হিসাবে এসেছিলেন, তারপর এ-পাহাড়কে, এখানকার মানুষজনকে ভালোবেসে এখানেই থেকে গেছিলেন। শেফিল্ডের বাবাও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। শেফিল্ড অবশ্য প্রথম জীবনে এখানে স্কুলের পাঠ চুকিয়ে লন্ডনে চলে যান। সেখানে ডাক্তারি পাশ করে রয়্যাল সোসাইটির সভ্যও হন। ওখানকার কোনও এক নামকরা হাসপাতালে কাজ করার পর, বছর দশেক আগে জন্মভূমির টানে আবার গারো পাহাড়ে ফিরে এসেছেন অকৃতদার মানুষটি।

সদা হাস্যময় এই মানুষটি আমাকে তাঁর বাড়িতে থাকতে দিয়েছেন সম্ভবত আমি বাঙালি বলে। বাঙালিদের তিনি শ্রদ্ধা করেন রবীন্দ্রনাথের জন্য। রবীন্দ্রনাথ যখন শিলং পাহাড়ে ছিলেন তখন শেফিল্ডের ঠাকুরদা নাকি একবার তাঁর সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। শেফিল্ডের একটা কুকুর আছে। তাকে নিয়ে এ-বাড়িতে দিন কাটান তিনি। জাতিতে সেটা গ্রেট ডেন।

ডক্টর শেফিল্ডের বাড়ি মালপত্র রেখে, স্নান-খাওয়া সেরে, ঘন্টাখানেক বিশ্রাম করে আমার প্রজাপতি সংগ্রহের সাজসরঞ্জাম কাচের জার, পাউচ, প্রজাপতি ধরার হ্যান্ডনেট ইত্যাদি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে এগোলাম ওপরের দিকে। বর্ষা শেষ হয়েছে কিছুদিন আগে। গাছপালা সব প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। দুপুরের আলোতে ঝলমল করছে ঘন নীল আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা পান্না-সবুজ পাহাড়ের ঢালগুলো। এত প্রাণবন্ত সবুজ রং শুধু হয়তো এই গারো পাহাড়েই দেখা যায়। তারই মাঝে দূর থেকে চোখে পড়ছে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা রুপালি

BanglaBook.org

ফিতার মতো কয়েকটা ঝোরা বা ঝরণা। তেমনই একটা ঝোরাকে লক্ষ্য করে এগোলাম আমি। এক সময় পৌঁছে গেলাম সে-জায়গাতে।

পাহাড়ের ঢালে কিছুটা সমতল মতো জায়গা। ফুট তিরিশেক ওপরের একটা পাথরের ফাটল থেকে জলধারা ঝর ঝর শব্দে নীচে নেমে সমতল জায়গাটিতে ছোট একটা ডোবা মতো সৃষ্টি করে আবার নীচের দিকে হারিয়ে গেছে। ডোবাটার চারপাশে ছড়িয়ে আছে জলধারায় মসৃণ হয়ে যাওয়া নানা আকৃতির নুড়িপাথর আর ছোট ছোট ঝোপঝাড়।

ঠিক যা ভেবেছিলাম তাই। জলধারা যেখানে এসে পড়ছে তার কিছুটা তফাতেই একটা ডিম্বাকৃতি পাথরের ওপর বসে আছে একঝাঁক ছোট্ট ছোট্ট প্রজাপতি। মোনার্ক বাটারফ্লাই। পাথরের ওপর সার বেঁধে বসে এক অদ্ভুত সম্মিলিত ছন্দে তারা পাখা নেড়ে চলেছে।

তাদের দেখেই আমার মনটা খুশিতে নেচে উঠল। এ তল্লাটে মোনার্ক বাটারফ্লাই এমন কিছু দুর্লভ নয়, তবে এরা পরিযায়ী প্রজাপতি বা মাইগ্রেটরি বাটারফ্লাই। সুদূর উত্তর আমেরিকা থেকে পাহাড় সমুদ্র পেরিয়ে, হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে এরা এখানে আসে। ব্যাপারটা ভাবলেই কেমন আশ্চর্য লাগে। এখানকার কিছু মানুষ বিশ্বাস করে যে এই প্রজাপতির পাখার রেণু নির্দিষ্ট অঙ্গে মাখলে নাকি মিলন সুখের হয়। আর আমার ওদের দেখে ভালো লাগার কারণ হল, আমি যে-যেবার প্রথম মোনার্ক বাটারফ্লাই ধরেছি সে-সেবারই পরবর্তীকালে দুষ্প্রাপ্য প্রজাপতির সন্ধান পেয়েছি। এটা আমার একটা সংস্কারও বলা যেতে পারে।

ছোট হলেও মোনার্ক খুব সাবধানী। কাছে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে উড়ে যায়। ওদের দেখামাত্রই হ্যান্ড নেটটা বাড়িয়ে ভেজা পাথরের ওপর সাবধানে পা রেখে আমি সন্তর্পণে এগোলাম সেই নির্দিষ্ট পাথরটার দিকে। কিন্তু কাছে যেতেই আমার আশঙ্কা সত্যি হল। বিপদের গন্ধ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকটা উড়তে শুরু করল। আমি বাতাসে নেট চালালাম। কিন্তু একটাও আটকাল না তাতে। ঝাঁকটা উড়ে গেল ডোবার দিকে।

সেখানে নামা যাবে না। মুহূর্তখানেক সেখানে দাঁড়িয়ে একটু হতাশ হয়ে আবার পিছনে ফিরতে যাচ্ছি, ঠিক তখনই দেখতে পেলাম তাকে। একটা প্রজাপতি তখনও সেই পাথরটার ওপর বসে আছে। যেন তার ওড়ার কোন তাড়া নেই। আর তাকে দেখামাত্রই যা আছে কপালে ভেবে নেটটা চালিয়ে দিলাম তাকে লক্ষ্য করে। আর আমার হাতলওলা জালের বৃত্তর মধ্যে

BanglaBook.org

আটকে গেল প্রজাপতিটা।

গারো পাহাড়ে এ-মরশুমে আমার প্রথম শিকার এই মোনার্কটা। প্রজাপতিটাকে ধরার পর আমার সংস্কারের জন্য মনে মনে বেশ খুশি হলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে সাবধানে তাকে জাল থেকে খুলে পুরে ফেললাম কাচের জারে। আপাতত সেটাই ওর আস্তানা। এরপর আমি এগোলাম পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে থাকা ইউক্যালিপটাস জঙ্গলের দিকে।

সময় এগিয়ে চলল, আমিও ঘুরে বেড়াতে লাগলাম প্রজাপতির খোঁজে। একবার আমার দেখা হল সাদা রঙের একঝাঁক 'কমন ম্যাপ বাটারফ্লাইয়ের' সঙ্গে। আর একবার হলুদের ওপর কালো ডোরাওলা 'টাইগার বাটারফ্লাইয়ে'র সঙ্গে। কিন্তু এ দু-ধরনের প্রজাপতি আমার সংগ্রহে আছে। তাই আমি শুধু তাদের সৌন্দর্য উপভোগ করলাম, ধরার চেষ্টা করলাম না। ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরির পর তখন বিকাল হয়ে এসেছে। হঠাৎ আমার চোখ আটকে গেল মাটিতে শুয়ে থাকা একটা গাছের গুড়ির ওপর। বেশ বড় একটা প্রজাপতি বসে আছে সেখানে। 'ব্রহ্মপুত্র প্যামফ্লাই'। দুষ্প্রাপ্য প্রজাপতি। আমি থমকে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে।

কিন্তু তাকে ধরার উপায় আমার নেই। এই গারো পাহাড়ে যে তিনশো ধরনের প্রজাপতি পাওয়া যায় তার মধ্যে বেশ কিছু প্রজাপতি সংরক্ষণ আইনের শীর্ষ তালিকাভুক্ত। ব্যাপারটা শুনলে অনেকেই আশ্চর্য হবেন যে, কেউ বাঘ, গণ্ডার বা হাতি শিকার করলে যে শাস্তি হবে, ওইসব প্রজাপতি ধরলেও একই শাস্তি। ব্রহ্মপুত্র প্যামফ্লাই-ও একই তালিকাভুক্ত। ওকে ধরলেই, ধরা পড়লে নির্ঘাত সাত-আট বছরের হাজতবাস। তবে ক্যামেরাবন্দি অবশ্যই করা যায়। তাই সে উড়ে যাওয়ার আগে চটপট ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বার করলাম।

লেন্সটা ঠিক করছি। হঠাৎ-ই একটা মৃদু বিপ্ বিপ্ শব্দ কানে এল। আর এরপরই প্রজাপতিটা যেখানে বসে ছিল, সেদিকে একটা গাছের আড়াল থেকে বেড়িয়ে এল একজন লোক। তাঁর পায়ে ঝোপঝাড় আন্দোলিত হতেই শোয়ানো-গাছের গুড়ি থেকে প্রজাপতিটা উড়ে গেল অন্যদিকে। মুহূর্তের মধ্যেই সে হারিয়ে গেল চোখের আড়ালে।

তাকালাম লোকটার দিকে। পরনে নীল রঙের ট্রাইট সুট, মাথায় হ্যাট, হাতে দস্তানা, মাঝবয়সি দীর্ঘকায় একজন লোক। তাঁর হাতে ধরা মোবাইল ফোনের মতো একটা যন্ত্র। লোকটাকে দেখে আমার ঠিক ভারতীয় বলে

BanglaBook.org

মনে হল না। প্রজাপতিটা উড়ে যাওয়াতে সেই মুহূর্তে লোকটার উপস্থিতিতে ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হলাম আমি। লোকটা সম্ভবত শেষমুহূর্তে প্রজাপতিটাকে উড়ে যেতে দেখেছিল। তাই সে আমার উদ্দেশ্যে একটু লজ্জিতভাবে বলল, 'মাফ করবেন। আমার জন্যই প্রজাপতিটা পালাল। তবে ওই যে ওখানে পাহাড়ের ঢালে ছোট ঝরণা দেখছেন ওখানে বেশ কয়েকটা ব্রহ্মপুত্র প্যামফ্লাই আছে। আমি কিছুক্ষণ আগেই দেখে এলাম।'

স্পষ্ট ইংরেজি উচ্চারণে কথাগুলো বলে লোকটা অঙ্গুলি নির্দেশ করল উল্টোদিকের পাহাড়ের ঢালের গায়ে একটা ঝরণার দিকে। আমি তাঁর কথা শুনে সৌজন্যতার খাতিরে তাঁর উদ্দেশে বললাম, 'না, না, ঠিক আছে। প্রজাপতিটা এমনিও উড়ে যেতে পারত। আবার হয়তো ব্রহ্মপুত্র প্যামফ্লাই দেখতে পেয়ে যাব।'

জবাব শুনে মৃদু হাসলেন ভদ্রলোক। তারপর আমার পরিচয় জানতে চাইলেন।

আমি সংক্ষেপে আমার পরিচয় ব্যক্ত করলাম। আমি ডাক্তার শেফিল্ডের বাড়ি উঠেছি শুনে ভদ্রলোক প্রথমে বললেন, 'ডাক্তার শেফিল্ডকে আমি চিনি। খুব সজ্জন মানুষ।' তারপর লোকটা নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমি, ক্যালিপ্টা অক্স। মেক্সিকান। ভারতের আকাশ নিয়ে গবেষণা করতে বছর পাঁচেক ধরে এদেশে আছি। এখানে আমার একটা বাড়ি আছে। যদিও সারাবছর আমি এখানে থাকি না। বাড়িটা ভাড়া দেওয়া আছে। মাঝে মাঝে এখানে আসা-যাওয়া করি।'

কথাগুলো বলার পর চারপাশে কী যেন খুঁজতে খুঁজতে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তা কী প্রজাপতি ধরলেন? কোনও রেয়ার স্পিসিস...'

তাঁর কথা শুনে আমি কিট ব্যাগ থেকে কাচের জারটা বার করে তুলে ধরে বললাম, এই যে একটা মোনার্ক বাটারফ্লাই।

'মোনার্ক বাটার ফ্লাই!' ভদ্রলোক কাছে এগিয়ে এসে জারটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভিতরের প্রজাপতিটাকে দেখতে লাগলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর মুখটা। তিনি কাছে চলে আসায় তাঁর অন্য হাতে ধরা ছোট যন্ত্রটার বিপ্ বিপ্ শব্দটা কানে বড় লাগছে। আমি তাঁকে জিগ্যেস করলাম, 'আপনার হাতে এটা কী জিনিস?'

ক্যালিপ্টা মৃদু চমকে উঠে সুইচ টিপে যন্ত্রটা বন্ধ করে দিয়ে হেসে বললেন, 'আমার বাড়িতে একটা অত্যাধুনিক টেলিস্কোপ বসানো আছে।

BanglaBook.org

যা দিয়ে আমি আকাশ দেখি। আপনি গেলে আপনাকেও দেখাব। এটা টেলিস্কোপেরই যন্ত্রাংশ। রিমোটও বলতে পারেন। খুব শক্তিশালী। ভুলে হাতে নিয়ে বেড়িয়ে পড়েছি।'

একথা বলার পরই প্রজাপতিটা দেখতে দেখতে আমাকে বেশ একটু অবাক করে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'বেশ সুন্দর প্রজাপতি। একটা অনুরোধ করছি, এটা আমাকে দেবেন? যা দাম চান আমি দেব। আমি প্রজাপতি ধরি না ঠিকই, কিন্তু যাঁরা ধরেন, তাঁদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে প্রজাপতি কিনি। মেক্সিকোতে আমার একটা ছোট সংগ্রহশালা আছে। এই মোনার্কটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে, এটা আকারে বেশ বড়।'

আমি একটু ভেবে নিয়ে জবাব দিলাম, 'মাফ করবেন। এটা আমার ধরা প্রথম প্রজাপতি। আমার কিছু সংস্কার আছে। এটা আমি দিতে পারব না।'

জবাব শুনে মিস্টার ক্যালিপ্টা আমার মুখের দিকে মুহূর্তখানেক তাকিয়ে থেকে জারটা আবার আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে হেসে বললেন, 'আমি হয়তো আপনাকে এমন একটা প্রজাপতি দিতে পারি যার বিনিময়ে এটা আপনি আমাকে দিয়ে দেবেন।'

আমি হেসে বললাম, 'তাই নাকি? আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভালো লাগল। এখানে বহু দেশের মানুষ আসেন। কিন্তু ইতিপূর্বে কোনও মেক্সিকানের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ হয়নি। আমি এখানে ক'দিন থাকব। তেমন সুযোগ হলে আপনার দেশের গল্প শুনব।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'অবশ্যই। আবার আমাদের দেখা হবে। আমি এবার যাই। বেলা পড়ে আসছে। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভালো লাগল। ধন্যবাদ।'

আমিও তাঁকে ধন্যবাদ জানাবার পর তিনি এগোলেন অন্যদিকে। আর আমিও এদিনের মতো প্রজাপতি অভিযান সাঙ্গ করে নীচে নামতে শুরু করলাম ডাক্তার শেফিল্ডের বাড়িতে ফেরার জন্য। দিনের শেষ আলো তখন ছড়িয়ে পড়েছে গারো পাহাড়ের মাথায়।

আমি যে টেবিলে বসে এই দিনলিপি লিখছি, সেই টেবিলেই কাচের জারের মধ্যে এখন শোভা পাচ্ছে মোনার্কটা। আমি একটা ছোট্ট গাছের ডাল ঢুকিয়ে দিয়েছি জারের মধ্যে। তার-ই একটা পাতায় ডানা মুড়ে চুপ করে বসে আছে সে।

BanglaBook.org

ডক্টর শেফিল্ডের ডায়েরি :
১ লা আগস্ট, টিম্বাটু ভিলেজ, ওয়েস্ট গারো হিল্‌স, মেঘালয়।

আজ সকালে সেই বাঙালি প্রজাপতি-শিকারি ভদ্রলোক মিস্টার চৌধুরি আমার বাড়িতে এসে উঠলেন। এই প্রজাপতি-শিকারি ভদ্রলোকের সঙ্গে গত বছর আমার পরিচয় হয়েছিল। আমি তাঁকে এ-বছর আমার বাড়িতে থাকতে দেব বলেছিলাম। আমি আমার কথা রাখলাম। ভদ্রলোককে ঘরের চাবি বুঝিয়ে দিয়ে ডিস্পেনসারির দিকে রওনা হয়েছি, ক্যাথলিক চার্চের সামনে উপস্থিত হতেই দেখি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে রাজ সইকিয়া প্রায় ছুটতে ছুটতে নেমে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। তাঁর মুখ কেমন ফ্যাকাসে! উত্তেজনায় সে কাঁপছে।

আমি প্রশ্ন করলাম, 'কী হয়েছে আপনার?'

সে জবাব দিল, 'ডক্টর শেফিল্ড, আপনি দয়া করে এখনই একবার আমার বাড়ি চলুন, মীনাক্ষীর আবার ব্লিডিং শুরু হয়েছে। এবারও হয়তো ...।' কথা শেষ না-করে আমার হাত দুটো চেপে ধরল সে।

আমি মনে মনে বলে উঠলাম, 'আবার মিসক্যারেজ! গতকাল বিকেলেই তাঁকে একদম সুস্থ স্বাভাবিক দেখে এসেছি!' মুখে কিছু না বলে আমি তৎক্ষণাৎ সইকিয়ার সঙ্গে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে তাঁর বাড়ির উদ্দেশে ছুটতে শুরু করলাম। যখন ওপরে উঠে এলাম তখন আমরা দুজনেই হাঁফাচ্ছি।

ইউক্যালিপ্টাসের বনের মধ্যে পাথরের দেওয়াল আর কাঠের ঢালু ছাদওলা বিরাট দোতলা বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। ব্রিটিশ আমলে জরিপের কাজ করতে আসা এক ভদ্রলোক বহু বছর আগে এ-বাড়িটা বানিয়েছিলেন। বহু হাত ঘুরে এ-বাড়িটা এখন ক্যালিপ্টা নামক মেক্সিকান ভদ্রলোকের সম্পত্তি। তাঁর সঙ্গেও আমার পরিচয় আছে। ভদ্রলোক মহাকাশ পর্যবেক্ষক। এই গারো পাহাড়ের ধুলো ধোঁয়াহীন নির্মল আকাশ পর্যবেক্ষণের পক্ষে সুবিধাজনক বলে তিনি এই সম্পত্তিটা এখানে কিনেছেন।

বাড়িটার এক-তলায় ভাড়া থাকে স্থানীয় সরকারি স্কুলের টিচার রাজা সইকিয়া ও তার স্ত্রী মীনাক্ষী। দুজনেরই বয়স তিরিশের নীচে। সুখী দম্পতি। যদিও এখন আর তাদের ঠিক সুখী বলা যাচ্ছে না।

সদর দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতর ঢোকার আগে আমার চোখ গেল ছাদের

BanglaBook.org

দিকে। সেই বিরাট টেলিস্কোপটা দোতলার ছাদ ফুঁড়ে কামানের মতো তাক করা আছে মহাকাশের দিকে। ওটা দিয়েই মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করেন ল্যান্ড লর্ড। ওই টেলিস্কোপটা দিয়ে তিনি আমাকেও একবার আকাশের আশ্চর্যরূপ দেখিয়েছিলেন।

রাজা সইকিয়া আমাকে নিয়ে সোজা হাজির হল তাঁর বেডরুমে। খাটে চাদর ঢাকা অবস্থায় শুয়েছিল মীনাক্ষী। মাঝে মাঝে সে অস্ফুটভাবে কোকাচ্ছে। বিবর্ণ মুখ। চোখের কোল বেয়ে জল চুইয়ে পড়ছে। একজন ঘরের কাজ করা গারো মহিলা তার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

আমি একটা টুল টেনে নিয়ে মীনাক্ষীর পায়ের কাছে বসে চাদরটা একটু ওঠালাম। হ্যাঁ, মিসক্যারেজ। চার মাসের ভ্রূণ, তাকে সন্তান বলাই ভালো, প্রায় বাইরে বেরিয়ে এসেছে। রক্তে ভিজে গেছে বিছানাটা। এই নিয়ে তিনবার মিসক্যারেজ হল মীনাক্ষীর। প্রথমে তিন মাসে, দ্বিতীয়বার দু'মাসে, আর এবার চারমাসে। আমি খাটে বসা মহিলাকে তাড়াতাড়ি গরম জল আনতে বলে আমার ব্যাগ থেকে গ্লাভস, ব্যান্ডেজ, সিজার ইত্যাদি সাজসরঞ্জাম বের করলাম।

গরম জল এসে গেল কিছু সময়ের মধ্যেই। সবাইকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে তারপর আমি কাজ শুরু করলাম। অভ্যস্ত হাতে মিনিট খানেকের মধ্যেই আমি সেই মাংসল পিণ্ডটাকে বিচ্ছিন্ন করে দিলাম মীনাক্ষীর দেহ থেকে। মনে মনে ভাবতে লাগলাম কেন এমন হচ্ছে? সবকিছুর পিছনেই তো একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকা উচিত। ভ্রূণটা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতেই হঠাৎ তার গায়ে কয়েকটা ছিটছিট দাগ দেখতে পেলাম। আর সেটা দেখেই আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল বহু বছর আগে ছাত্রাবস্থায় ইংল্যান্ডের মেডিক্যাল কলেজে কাচের জারে রাখা ফর্মালিনে চোবানো একটা ভ্রূণের কথা।

এক জাপানি নারীর ভ্রূণ। বিশেষ কারণবশত আমাদের প্রফেসর সেই ভ্রূণটা আমাদের দেখিয়েছিলেন। সে-ভ্রূণটা এমন-ই দেখতে ছিল। আমার মনে হল, এ ভ্রূণটাও মেডিক্যাল অ্যানালিসিসের জন্য পাঠালে কেমন হয়? পরপর তিনবার এমন অস্বাভাবিক অপারেশনের কারণ আমি ধরতে পারছি না। হয়তো ভ্রূণটার মেডিক্যাল অ্যানালিসিস করলে কোনও সমাধান সূত্র মিলতে পারে।

BanglaBook.org

মীনাক্ষী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি তাড়াতাড়ি বাকি কাজ শেষ করে তাকে একটা ঘুমের ইঞ্জেকশন দিলাম। মানসিক স্ট্রেস কাটিয়ে ওঠার জন্য তাঁর পক্ষে ঘুমটা জরুরি। কাজ মিটে যাবার পর রাজা সইকিয়াকে ডেকে প্রথমে জিগ্যেস করলাম, 'মীনাক্ষী কোনও চোট-টোট পেয়েছিল কি?'

সে বলল, 'না, গতকাল বিকেলে আপনি ওকে দেখে যাওয়ার পর সন্ধ্যাবেলা আমরা গল্প করলাম, রেডিওতে গান শুনলাম। তারপর খাওয়া সারলাম। মীনাক্ষীর রোজনামচা লেখার অভ্যাস আছে। টেবিলে বসে আধঘণ্টা সে সেটা লিখল, তারপর আমরা শুতে গেলাম রোজকার মতো...।'

ডাক্তার হিসাবে আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, 'গত রাতে কোনও দৈহিক সম্পর্ক হয়েছে কি? সে সময় যদি কোনও আঘাত...।'

রাজা সইকিয়া বলল, 'না, কাল কেন, যে তিনবার এই ঘটনা ঘটল তার কয়েক দিনের মধ্যে এ সম্পর্ক ঘটেনি।' এরপর সে বলল, 'আজ সকালেও স্বাভাবিক ছিল। সাতটায় উঠে আমাকে বেড-টি দিল, ঘরের কাজের মহিলা আসার পরও হাতে হাতে তার সঙ্গে টুকটাক কাজ করল। আপনার নিষেধের কারণে ও কোনও ভারী কাজ করে না। গুয়াহাটি থেকে আমার কিছু বই পার্সেল এসেছিল, সেগুলো ক্যুরিয়ার কোম্পানির লোকের কাছ থেকে রিসিভ করল। মিস্টার ক্যালিপ্টা একবার নীচে নেমেছিলেন, আজ মাসপয়লা বলে তাঁকে ভাড়ার টাকাটাও ডেকে দিল। রান্নার কাজ শেষ হওয়ার পর দশটা নাগাদ আমি স্নান করতে ঢুকেছি স্কুলে বেরোব বলে, তখনও ভাত বাড়ছিল। তারপরই ওর চিৎকার শুনলাম। বাইরে বেরিয়ে দেখি ডায়েনিং টেবিলের সামনে মীনাক্ষী দাঁড়িয়ে আছে। তার পায়ের সামনে কাঠের মেঝেতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত।'

মীনাক্ষী ডায়েরি বা রোজনামচা লেখে তা আমার জানা ছিল না। জানার কথাও নয়। আমার মাথায় হঠাৎ একটা ভাবনা এল। মিসক্যারেজের আগের দিনটাতে পেশেন্টের কার্যকলাপ অনেক সময় খুব ইমপর্ট্যান্ট হয়। হয়তো এমন কিছু ঘটে যাতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মিসক্যারেজ হয়। ব্যাপারটা ভেবে নিয়ে আমি একটু ইতস্তত করে রাজা সইকিয়াকে বললাম, 'মীনাক্ষীর রোজনামচার খাতাটা একবার পাওয়া যেতে পারে? যদিও রোজনামচা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। কারও দেখা ঠিক নয়। তবে আমি ডাক্তার

BanglaBook.org

হিসাবেই সেটা দেখতে চাই। নানা কারণে তো মিসক্যারেজ হয়, আমি জানতে চাই গত দু'বার মিসক্যারেজের ঠিক আগে তাঁর মানসিক পরিস্থিতি ঠিক কেমন ছিল, বা সে এমন কোনও কাজ করেছে কি না যাতে মিসক্যারেজ হতে পারে। মীনাক্ষীর অনুমতি সাপেক্ষে, একান্ত কোনও ব্যক্তিগত ব্যাপার, যার গোপনীয়তা আপনারা আমার কাছে রক্ষা করতে চান, তেমনি কিছু সেখানে না থাকলে আমাকে যদি সে লেখাগুলো দেন...'

এত দুঃখের মধ্যেও রাজা সইকিয়া মৃদু হেসে বলল, 'না, সে খাতায় আমাদের দাম্পত্য জীবনের কোনও ব্যাপার লেখা নেই। ওই লেখা নিয়ে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গোপনীয়তাও কিছু নেই। মীনাক্ষী খুব সংক্ষিপ্তসারে তার কাজের বিবরণ লিখে রাখে ওই রোজনামচায়। আমি স্বচ্ছন্দে তাঁর ডায়েরি আপনাকে দিতে পারি।' এই বলে সে পাশের ঘরে গিয়ে দুটো ডায়েরি নিয়ে ফিরে এসে আমার হাতে তুলে দিল। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, 'আচ্ছা, আগের দুটো মিসক্যারেজের তারিখ আপনার মনে আছে?

সে জবাব দিল, হ্যাঁ আছে। ২২শে ফেব্রুয়ারি, আর গত বছরের ১৯শে সেপ্টেম্বর।

আমি বললাম, 'আচ্ছা'।

এরপর আমি তাঁকে বললাম, 'আর একটা ব্যাপারে আপনার অনুমতি প্রয়োজন। এই ভ্রূণটাকে আমি পরীক্ষার জন্য দিল্লি এইমস-এ পাঠাতে চাই। যদি ওরা ওটা দেখে এ ব্যাপারে কোনও আলোকপাত করতে পারে। আমার জানা দরকার একজন সুস্থ সবল তরুণীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা বারবার কেন ঘটছে!'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে একটু ইতস্তত করে রাজা সইকিয়া বলল, 'ঠিক আছে, আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই করুন।'

আমি বললাম, 'তাহলে আমাকে একটা মুখ ঢাকা পাত্র আর কিছুটা বরফ দিন।'

সে জিনিসগুলো হাজির হওয়ার পর ভ্রূণটাকে বরফপূর্ণ সেই পাত্রে ভরে রাজা সইকিয়ার বাড়ি ছাড়লাম আমি। বাইরে বেরিয়েই দিল্লি এইমস-এর রেডিওলজি বিভাগের প্রধান বন্ধুবর ডক্টর নাইয়ারকে মোবাইলে ফোন করলাম। সব শোনার পর তিনি আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'তুমি আমাকে ওটা আজকের ফ্লাইটেই পাঠিয়ে দাও। আমি পরীক্ষার ব্যবস্থা করছি।' সৌভাগ্যক্রমে ঢাল থেকে নীচে নেমে শিলং যাওয়ার ডাকগাড়িটি পেয়ে গেলাম। পোস্টমাস্টার, চালক, সবাই আমার পূর্বপরিচিত। অসুবিধার ব্যাপার

BanglaBook.org

নেই। আমি চড়ে বসলাম ডাক বিভাগের জিপে।

বেলা দুটো নাগাদ শিলং পৌঁছোলাম। শিলং-এর পুলিশ বাজার এলাকায় আমার পরিচিত একটা প্যাথলজি সেন্টার আছে। তাঁর মালিক মিস্টার বর্মনের মাধ্যমে ভ্রূণটাকে গুয়াহাটি থেকে দিল্লি পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম সন্ধ্যার ফ্লাইটে। আমার সামনেই সেটা নিয়ে একজন রওনা হল গুয়াহাটি যাওয়ার জন্য। শিলং-এর কাজ সেরে সেই ডাকগাড়িতেই আমি আবার সূর্য ডোবার কিছু আগে ফিরলাম এখানে। গাড়ি থেকে নেমে আমার ডিসপেনসারির দিকে এগোচ্ছি, হঠাৎ আমার দেখা হয়ে গেল রাজা সইকিয়ার ল্যান্ডলর্ড মিস্টার ক্যালিপ্টার সঙ্গে। কুশল বিনিময়ের পর তিনি আমাকে বললেন, 'আজ দেখলাম আপনি আমার বাড়ি গিয়েছিলেন?'

আমি তাঁকে ব্যাপারটা মোটামুটি বলার পর তিনি আক্ষেপ করে বললেন, 'আমার ভাড়াটিয়া বলে বলছি না, সত্যিই এত নির্বিবাদ ভালো ফ্যামিলি দেখা যায় না। আমার বাড়িটা তো কার্যত ওরাই দেখাশোনা করে। ব্যাপারটা খুব দুর্ভাগ্যজনক। তা আপনি এখন কোথা থেকে ফিরছেন?'

আমি কোথায় কী কারণে গিয়েছিলাম তা জানবার পর মিস্টার ক্যালিপ্টা আমাকে বললেন, 'আপনার বাড়িতে তো একজন বাঙালি প্রজাপতি শিকারি ভদ্রলোক অতিথি হয়েছেন। আজ তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল আমার।'

আমি জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, এসেছেন। ভদ্রলোক বেশ ভালো। কয়েক বছর ধরে প্রজাপতি শিকার করতে আসছেন এখানে।'

মিস্টার ক্যালিপ্টা এরপর বিদায় নিয়ে এগোলেন নিজের বাড়ির উদ্দেশে, আর আমি রওনা হলাম আমার ডিসপেন্সারির দিকে। সকালবেলা আজ বসতে পারিনি বলে রোগীদের বেশ ভিড় হয়েছিল। তাদের দেখতে দেখতে রাত আটটা বেজে গেল।

এখানে রাত আটটা মানে বেশ রাত। কর্মব্যস্ত দিনের শেষে রাত ন'টা নাগাদ বাড়ি ফিরে খাওয়া সেরে এই ডায়েরি লিখতে বসেছিলাম। এখন রাত প্রায় দশটা। প্রজাপতি-শিকারি বাঙালি ভদ্রলোকের কোনও সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। হয়তো তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। মাঝে মাঝেই আমার মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে সেই ভ্রূণটা। দিল্লি থেকে ওভার ফোনে পরীক্ষার রিপোর্টটা সম্ভবত আগামিকাল রাত বা পরশুর মধ্যেই এসে যাবে। ডক্টর নাইয়ার সে আশ্বাসই আমাকে দিয়েছন। ভ্রূণটা দেখার পর থেকেই একটা উদ্ভট চিন্তা উঁকি দিচ্ছে আমার মনে। দেখা যাক রিপোর্টটা কী আসে!

BanglaBook.org

এই দিনলিপি লেখা শেষ হলে রাজা সইকিয়ার দেওয়া মীনাক্ষীর ডায়েরিটা নিয়ে বসব। সম্ভব হলে যেদিন যেদিন তার মিসক্যারেজ হয়েছে তার আগের দিনের বা মিসক্যারেজের দিনের ঘটনা, যদি পরবর্তীকালে লেখা হয়ে থাকে তা আমার খাতায় নোট করে নেব। হয়তো তা বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতে কিছু পাওয়া যেতে পারে।

মিসেস মীনাক্ষী সইকিয়ার রোজনামচা
(তার ডায়েরি থেকে ডক্টর শেফিল্ডের খাতায় তোলা)
১৮ই সেপ্টেম্বর

আজ ভোরে পাখির ডাকে ঘুম ভেঙেছে আমার। চোখ মেলতেই খোলা জানালা দিয়ে ওপাশের পাহাড়টা চোখে পড়ল। নতুন সূর্যের আলো ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে পাহাড়ের ঢালে। অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য! রাজার ঘুম তখনও ভাঙেনি। আমি ধাক্কা দিয়ে তাঁর ঘুম ভাঙাবার পর সে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। গুয়াহাটি শহর ছেড়ে এই পাণ্ডববর্জিত জায়গাতে আসার পর একটা চাপা অবসাদ কাজ করছিল তাঁর মনে। ক'দিন আগে পর্যন্ত সে বলছিল যে চাকরি ছেড়ে আবার গুয়াহাটি ফিরে যাবে। কিন্তু ক'দিন আগে যখন ডক্টর শেফিল্ড আমি 'মা' হতে চলেছি, সে-খবর দিলেন, তারপর থেকে রাজার অবসাদ ভাবটা কেটে গিয়েছে। ও এখন খুশিতে চনমনে।

ঘুম ভাঙার কিছুক্ষণ পর রাজা আমাকে মনে করাল যে আমাদের ল্যান্ডলর্ড মিস্টার ক্যালিপ্টা মেক্সিকো থেকে গতকাল সন্ধ্যায় ফিরে এসেছেন। আমার সঙ্গে তাঁর দেখা না হলেও, তিনি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। সন্ধ্যায় তিনি আমাদের দুজনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আকাশ দেখার জন্য। মিস্টার ক্যালিপ্টা খুব নম্র, ভদ্র, বিনয়ী মানুষ। মহিলাদের দেখলে অনেক পুরুষের চোখে যে কামনার ভাব খেলা করে সেটা তাঁর মধ্যে একদমই নেই। বরং চোখে এক অদ্ভুত দৃষ্টি খেলা করে। যেন মনে হয় তিনি অনেক দূরের দিকে তাকিয়ে সব সময় কিছু খুঁজছেন। হয়তো টেলিস্কোপে চোখ রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকার কারণে তাঁর চোখের দৃষ্টি এমন হয়েছে। ভদ্রলোক যখন এখানে এসে থাকেন তখনও তাঁর উপস্থিতি প্রায় বোঝাই যায় না। আকাশের দিকে তাকিয়ে রাত কাটান। দিনের বেলা ঘুমান। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া নীচে নামেন না। নীচে নামলেও যাতে আমাদের কোনও অসুবিধা না হয়, সেজন্য বাড়িতে

BanglaBook.org

ঢোকা-বেরোবার সময় বাড়ির পেছনের দরজাটা ব্যবহার করেন। তিনি আমাকে সিস্টার বলে সম্বোধন করেন।

আটটা নাগাদ আমার ঘরের কাজের সহকারী স্থানীয় মহিলা টুসিং এল। তার সঙ্গে ঘরের কাজ, রান্না-বান্না এসব করতেই বেলা দশটা বেজে গেল। এগারোটার সময় রাজা খাওয়া সেরে স্কুলে চলে গেল। বারোটা নাগাদ ক্যুরিয়ার কোম্পানির লোক এল পার্সেল নিয়ে। এখানে বইপত্র পাওয়া যায় না বলে রাজা গুয়াহাটি থেকে প্রায়ই বই আনায়। পার্সেলটা রিসিভ করলাম। একটা নাগাদ খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়লাম। সাড়ে চারটেতে ঘুম থেকে ওঠার কিছু সময় পরই রাজা এল। বিকাল আর সন্ধ্যাটা গল্প করেই কাটালাম দুজন। তারপর টুসিংকে ছুটি দিয়ে আমরা ওপরে উঠলাম আকাশ দেখার জন্য।

মিস্টার ক্যাপিল্টা আমাদের প্রতীক্ষাতেই ছিলেন। আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর আকাশ দেখার ঘরে। কতরকম যন্ত্র সে-ঘরে ঠিক যেন এরোপ্লেনের ককপিট। বাড়ির বাইরে থেকে এ-ঘরটার আকার ঠিক বোঝা যায় না। ঘরের ছাদটা ইগলু আকৃতির। আর সে-ছাদ ফুঁড়ে ইলেকট্রনিক্স টেলিস্কোপটা বাইরে বেরিয়ে আছে।

টেলিস্কোপে চোখ রাখতেই আকাশটা যেন পৃথিবীতে নেমে এল। কত উজ্জ্বল নক্ষত্র, গ্রহ! টেলিস্কোপে যে ছবি দেখা যাচ্ছে তা আবার ধরা পড়ছে ঘরের মধ্যে রাখা একটা কম্পিউটার স্ক্রিনে। সেটা দেখে ক্যালিপ্টা বিবরণ দিয়ে যেতে লাগলেন প্রতিটা ব্যাপারের। কোনটি আসলে নক্ষত্র, কোনটা নক্ষত্র নয়, গ্রহ; সূর্যের আলো পড়ে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, কোনটি আসলে মৃত নক্ষত্র এসব। পর্যায়ক্রমে আমি আর রাজা দেখলাম সেগুলো। ঘণ্টাখানেক পর ওই ছাদের ঘর ছেড়ে আমরা যখন নীচে নেমে এলাম তখন আমরা সত্যিই অভিভূত! আজকের দিনটা খুব সুন্দর কাটল।

২১শে ফেব্রুয়ারি

আজ ছিল ২১ ফেব্রুয়ারি। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। গুয়াহাটিতে একটা অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য সকালবেলাই রাজা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছিল। গতকাল আমাকে রাজা ডক্টর শেফিল্ডের চেম্বার দেখাতে নিয়ে গেছিল। তিনি বললেন, আমার সব কিছু স্বাভাবিক-ই আছে। গত সেপ্টেম্বর আমার মিসক্যারেজ হবার পর আমি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলাম। শেফিল্ড অবশ্য

আমাদের আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, যে-ভেঙে পড়ার কিছু নেই। প্রথমবার এমন ঘটনা নাকি অনেকের ক্ষেত্রেই হয়। এখন আমার মাত্র দু মাস চলছে। আশাকরি এবার আমার তেমন কিছু ঘটবে না।

রাজা চলে যাবার পর দুপুর পর্যন্ত ঘরের কাজ করলাম। তারপর বই নিয়ে পড়তে বসলাম। রাজাই বইগুলো আনিয়েছে। ফেয়ারি টেল্‌স। ও কোথায় শুনেছে যে এ ধরনের বই গর্ভাবস্থায় পড়লে মা-র মন ভালো থাকে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে নাকি গর্ভস্থ শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশও ভালো হয়। সত্যি মিথ্যে যাই হোক বইগুলো পড়তে আমার বেশ ভালো লাগল। দুপুরটাও কেটে গেল।

বিকালবেলা বাগানে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ 'হাই সিস্টার' সম্বোধন শুনে দেখি মিস্টার ক্যালিপ্টা। তাঁর হাতে একটা যন্ত্র। বিপ্‌ বিপ্‌ শব্দ হচ্ছে তাতে। ক্যালিপ্টা ক'দিন হল আবার ফিরে এসেছেন। কিন্তু সামনা সামনি তার সঙ্গে আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ। বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল আমাদের দুজনের মধ্যে। অক্টোবরে চলে গেছিলেন তিনি। ক্যালিপ্টা জানতে চাইলেন নতুন কোনও মোনার্ক প্রজাপতির দল এসেছে কিনা। আমি জবাব দিলাম যে ব্যাপারটা আমি খেয়াল করিনি। ক্যালিপ্টা এরপর বাগান ছেড়ে বেড়িয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজা ফিরে এল। তার মুখে শুনলাম তাদের অনুষ্ঠান খুব ভালো হয়েছে। প্রতিদিনের মতোই এদিন সন্ধ্যা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত আমরা দুজন গল্প করে আর রেডিওতে গান শুনে কাটিয়েছিলাম। এখন রাত সাড়ে ন'টা বাজে। সারাদিনের জার্নির ধকল কাটাতে রাজা খাওয়া সেরেই শুয়ে পড়েছে। আর আমি আমার ডায়েরি নিয়ে বসেছি। একটা দিন নিস্তরঙ্গ অথচ বেশ শান্তিপূর্ণভাবে কেটে গেল।

৩১ জুলাই

সন্ধ্যার অন্ধকার নামলেই আজকাল আমার বড় ভয় করে। গত দুবার আমার মিসক্যারেজ হয়েছিল রাতের ঘুমের মধ্যে। ঘুম ভাঙতেই দেখেছি রক্তে ভিজে গেছে সব কিছু। আজ স্কুল ছুটি ছিল রাজার। বিকেলবেলা ডাক্তার শেফিল্ডকে সে বাড়ি এনেছিল। তিনি আমাকে পরীক্ষা করে বললেন, সব স্বাভাবিক আছে। তিনি তা বললেও আমার ভয় কাটছে না।

BanglaBook.org

দু-দুবারের অভিজ্ঞতা আমাকে আতঙ্কিত করে রেখেছে। আমাকে মুখে কিছু না বললেও রাজার মুখ দেখে বুঝতে পারি সে-ও খুব টেনশনে আছে। এখন আমার গর্ভস্থ সন্তানের বয়স চার মাস। শেফিল্ড আজ এ-ও বলে গেলেন, এবার আর কোনও দুর্ঘটনা ঘটবে না বলেই মনে হয়। তবুও রাত নামতেই আমার ভয় করতে শুরু করেছে। শেফিল্ডের কথাই যেন সত্যি হয়। আমি যেন সত্যিই সুন্দর একটা সকাল দেখতে পারি কাল।

ডাক্তার চলে যাবার পর আমি আর রাজা বাইরের বারান্দায় বসে রইলাম। সন্ধ্যা নামার কিছুক্ষণ পর ল্যান্ডলর্ড ক্যালিপ্টাকে বাড়ি ফিরতে দেখলাম। গতকালই তিন মাস পর তিনি ফিরেছেন। তিন মাসের ভাড়া তাঁকে দেওয়া হয়নি। কাল সকালে সবকিছু ঠিক থাকলে ভাড়াটা তাঁকে দিয়ে দেব। আজকাল ডাক্তার শেফিল্ডের পরামর্শমতো আমরা খাওয়া সেরে রাত ন'টার মধ্যে শুয়ে পড়ছি। যথাসম্ভব বিশ্রাম নিচ্ছি আমি। জল তোলা বা সিঁড়ি ভাঙার মতো কোনও কাজ করছি না তাঁর পরামর্শে। যেভাবেই হোক আমার গর্ভস্থ সন্তানকে এবার বাঁচাতেই হবে। রাত আটটাতে খাওয়া সাড়া হয়ে গেছে আমাদের। অভ্যাসবশত কয়েক লাইন ডায়েরি লিখলাম। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা সুন্দর সকালের প্রতীক্ষায় ঘুমাতে যাব। মঙ্গলময় ঈশ্বর আমাদের সহায় হন।

BanglaBook.org

নৃসিংহ চৌধুরীর দিনলিপি
২রা আগস্ট, পশ্চিম গারো পাহাড়,
মেঘালয়,

আজ ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে ডাক্তার শেফিল্ডের বাড়ি ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েছিলাম। ঢাল বেয়ে পাহাড়ের মাথায় জঙ্গলে যখন উঠে এলাম তখন ভোরের প্রথম আলো ছড়িয়ে পড়ছে আনাচে কানাচে। প্রথমেই আমার দেখা হল এক ঝাঁক 'খাসি কমন র‍্যাঙনের' সঙ্গে। কালো রঙের এ প্রজাপতির দুপাশের ডানার নীচের অংশে সাদা ছিটছিট দাগ আছে। দেখতে ভারী সুন্দর। আমার জালে আটকে গেল একটা। আর এর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি ধরে ফেললাম ডানায় নীল রংঅলা বেশ বড়সড় একটা 'চাইনিজ পিকক' প্রজাপতি।

ভাগ্য আজ বেশ সুপ্রসন্ন বুঝতে পারলাম। আমি ঘুরে বেড়াতে শুরু

করলাম আমার জাল নিয়ে। কখনও পাহাড়ের ঢালে, কখনও আবার তার মাথার ঝোপঝাড়ে। বেশ কয়েক জায়গাতে সাদা রঙের 'অ্যালবাট্রম' প্রজাপতি দেখলাম। কিন্তু তাদের ছাড় দিলাম। কারণ গতবার ও-প্রজাপতি আমি বেশ ক'টা সংগ্রহ করেছি। ঘুরতে ঘুরতে আমার চোখে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেল 'পেন্টেড লেডি'। গতবার এ-প্রজাপতি একবার দেখতে পেলেও ধরতে পারিনি। সন্ধ্যার অন্ধকারে হারিয়ে গেছিল সেটা।

এ পাহাড়ে যেসব প্রজাপতি মেলে তাদের মধ্যে 'পেন্টেড লেডি'কে সবথেকে সুন্দর বললেও অত্যুক্তি হয় না। হলুদ, আর নীল-সাদা মেশানো আশ্চর্য সুন্দর তার রং। আমি সন্তর্পণে এগোলাম তার দিকে। জাল চালালাম ঠিকই কিন্তু প্রথমবার ব্যর্থ হলাম। সে উড়ে গিয়ে কিছুটা তফাতে বসল। আবার আমি সেখানে গিয়ে জাল ছুড়লাম। কিন্তু সেবারও ব্যর্থ হলাম।

প্রজাপতিটা বেশ কিছুক্ষণ খেলাল আমাকে। তার পিছু পিছু বেশ কিছুক্ষণ ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াল। কিন্তু এক-একটা দিন বিধাতা এক-একজনের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখেন। শেষ পর্যন্ত আমার জালে ধরা পড়ে গেল 'পেন্টেড লেডি'। আমার সেই মোনার্ক প্রজাপতি সংক্রান্ত সংস্কারের কথা আবার মাথায় এল। ভাগ্যিস মোনার্কটা মিস্টার ক্যালিপ্টাকে দিইনি। ওই তো আমার জন্য এই 'পেন্টেড লেডি' ধরার সৌভাগ্য বয়ে আনল।

ঘণ্টাখানেক সময় কেটে গেছে। তাছাড়া প্রজাপতির পিছনে ছোটাছুটি করতে গিয়ে বেশ হাঁফ ধরে গেছিল আমার। কাজেই এরপর 'পেন্টেড লেডি'কে একটা জারে পুরে ফেরার পথ ধরলাম।

সোজা ঘরে ফিরে এসেছিলাম। বেলা এগারোটা নাগাদ দরজা ধাক্কাবার শব্দ শুনে দরজা খুলে দেখি সেই মিস্টার ক্যালিপ্টা এসে হাজির হয়েছেন। একটু বিস্মিত হলেও মুখে হাসি ফুটিয়ে তাঁকে ভিতরে আমন্ত্রণ জানালাম। ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'গতকাল পরিচিত হলাম, তাই ভাবলাম আপনার সঙ্গে দেখা করি। তা কী কী প্রজাপতি ধরলেন?'

আমি তার প্রশ্ন শুনে হেসে টেবিলের ওপর রাখা সার সার কাচের জারগুলো দেখিয়ে দিলাম। সেদিকে তাকিয়ে ক্যালিপ্টা বললেন, 'বাহ্! পেন্টেড লেডি দেখছি!' কথাটা তিনি বললেও তাঁর চোখ আটকে গেল সেই মোনার্কটার দিকে। তিনি চুপ করে চেয়ে রইলেন সেদিকে।

আমি আলোচনায় ফিরে আসার জন্য বললাম, 'আমি মেক্সিকো কোনওদিন না-গেলেও আপনার সে-দেশের কথা অনেক পড়েছি। অ্যাজটেক

BanglaBook.org

সভ্যতা তো সেখানেই গড়ে উঠেছিল। অত হাজার বছর আগে অ্যাজটেকরা কীভাবে পিরামিডগুলো তৈরি করেছিলেন, স্থাপত্যবিদ্যায় এত পারদর্শী হয়েছিলেন তা ভাবতেই আশ্চর্য লাগে!'

আমার কথা শুনে ক্যালিপ্টা যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। মৃদু চমকে উঠে তিনি এরপর বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক-ই বলেছেন। সভ্যতার সেই উষা লগ্নে আমাদের দেশের মানুষেরা অদ্ভুত সব স্থাপত্য নির্মাণ করেছিলেন। গঠনশৈলীর দিক থেকে অনেক বেশি আধুনিক ছিল অ্যাজটেক পিরামিড মন্দিরগুলো। তা বানাবার জন্য নিখুঁত জ্যামিতিক জ্ঞানের প্রয়োজন হত। শুধু তাই নয়, নির্ভুল জ্যোর্তিবিজ্ঞানও তাদের জানা ছিল। আপনি নিশ্চয়ই পাথরের তৈরি অ্যাজটেক ক্যালেন্ডারের বিখ্যাত ছবিটা দেখেছেন। কীভাবে পাঁচ হাজার বছরের দিনপঞ্জীর হিসাব, গ্রহ নক্ষত্রের পূর্ণাঙ্গ অবস্থান সে ক্যালেন্ডারে দেখিয়েছিলেন তাঁরা! বেশ কিছু এমন মন্দির সেখানে আছে যার গ্রানাইট পাথরের জোড়গুলো তাঁরা আটকেছিলেন পাথর গলিয়ে। এ-কাজে যে উত্তাপের প্রয়োজন হয় তা এখনও আধুনিক ল্যাবরেটরি ছাড়া কোথাও করা সম্ভব নয়।'

আমি আমার পাণ্ডিত্য ফলাবার জন্য এবার বললাম, 'অনেকে তো বলেন এসব নাকি গ্রহান্তরের মানুষদের কাজ। পৃথিবীর মানুষকে শিক্ষিত করার জন্য একদিন তারা পৃথিবীতে নেমে এসেছিল। এসব তাদেরই কাজের সাক্ষ্য। দানিকেন নামে এক ভদ্রলোক এর স্বপক্ষে যুক্তিও খাড়া করেছেন তাঁর বইয়ে। প্রাচীন অ্যাজটেক পুরোহিতরা পিরামিড শীর্ষে যে নরবলি দিত, তা নাকি আসলে উৎসর্গ করা হত এলিয়ানদেরকেই।

আমার কথা শুনে ক্যালিপ্টা বললেন, 'হ্যাঁ, একটা মানমন্দিরের চিত্রলিপিতে এর উল্লেখ আছে। যেহেতু মহাকাশবিজ্ঞান নিয়ে আমি কিছুটা চর্চা করি তাই এ ব্যাপারে আমারও আগ্রহ আছে।'

বেশ কিছুটা সময় এসব বিষয় নিয়ে আমরা দুজন আলোচনা করলাম। তারপর মিস্টার ক্যালিপ্টা একটু ইতস্তত করে বললেন, 'কাল আমি যে অনুরোধটা করেছিলাম, সেটা আজও একবার করছি। মোনার্কটা আমাকে দিন। তার বিনিময়ে আমি এটা আপনাকে দেব।'

এই বলে তিনি তার পকেট থেকে একটা সেলোফেন পেপারের পাউচ বার করে টেবিলের ওপর রাখলেন। পাউচের মধ্যে রাখা আছে একটা প্রজাপতি। সেটা দেখে চিনতে পেরে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। দুষ্প্রাপ্য

BanglaBook.org

একটা 'রিগাল ব্লু বেগম' প্রজাপতি! সেলোফেন পেপারের মধ্যে থেকেও যেন মৃত প্রজাপতির ডানার নীচের অংশ থেকে উজ্জ্বল নীলাভ দ্যুতি ছড়াচ্ছে! এটাও সংরক্ষণ তালিকার প্রথম সারির অন্তর্গত। এখন এ-প্রজাপতি ধরা ও মারা নিষেধ।

আমি বিস্মিত ভাবে চেয়ে রইলাম ক্যালিপ্টার মুখের দিকে। তিনি আমাকে আশ্বস্ত করার জন্য বললেন, 'ভয় নেই। এটা আমি এক সংগ্রাহকের কাছ থেকে কিনেছি। সে এই মৃত প্রজাপতিটা বহু বছর আগে কিনেছিল বনদপ্তর থেকে। সে সব কাগজপত্রও আমি আপনাকে দেব। নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন।'

আমি তাঁকে কী জবাব দেব, তা বুঝতে পারলাম না। আমি একবার তাকালাম আমার মোনার্কের দিকে, আর একবার ব্লু বেগমের দিকে। মোনার্কটাকে নিয়ে আমার সংস্কার থাকতে পারে। কিন্তু সামান্য কেটা মোনার্কের বদলে 'ব্লু বেগম?' আমি প্রশ্নটা করেই ফেললাম তাঁকে।

তিনি হেসে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, মোনার্কের দাম সামান্য আর ব্লু বেগমের দাম কয়েক লক্ষ টাকা। কিন্তু আমার এক অভ্যাস বা বদভ্যাস আছে। যে জিনিস একবার আমার পছন্দ হয় তার জন্য আমি যে-কোনও দাম দিতে রাজি থাকি!'

তাঁর কথা শুনে কী করব ভাবতে লাগলাম। ক্যালিপ্টা স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বোতল-বন্দি মোনার্কটার দিকে। হঠাৎ আমার মাথায় এল, কিছু সিদ্ধান্ত নেবার আগে একবার ডাক্তার শেফিল্ডের সঙ্গে আলোচনা করা ভালো। আমি তো তাঁর বাড়িতেই উঠেছি। মিস্টার ক্যালিপ্টা এক অর্থে আমার কাছে অজ্ঞাতকুলশীল। ব্লু বেগমটা নিয়ে পরে যদি কোনও বিপদ হয়! ব্যাপারটা মাথায় আসতেই আমি ক্যালিপ্টাকে বললাম, 'ঠিক আছে, ব্যাপারটা নিয়ে অন্তত একটা দিন ভাবার সময় দিন।'

ক্যালিপ্টা হেসে বললেন, 'ঠিক আছে আমি আবার নয় কাল আসব। তবে 'ব্লু বেকম' কোনও সংগ্রাহকের কাছে থাকলে সে একটা আলাদা মর্যাদা পায় তা নিশ্চয়ই আপনি জানেন?' এই বলে তিনি ব্লু বেগমটাকে পকেটে পুরে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে গেলেন।

আমি আর সারাদিন বাড়ি থেকে বেরোলাম না। ক্যালিপ্টার ব্যাপারটাই সারাদিন মনের মধ্যে খেলা করে চলল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল, তারপর এক সময় গারো পাহাড়ের মাথায় সূর্য ডুবে গেল।

BanglaBook.org

সন্ধ্যার বেশ কিছু পরে ডক্টর শেফিল্ড আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমি তাঁকে মিস্টার ক্যালিপ্টার ব্যাপারটা বললাম। শুনে হয়তো তিনি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বাড়ির অন্যদিক থেকে কুকুরের ডাক ভেসে এল। তা শুনে তিনি বললেন, 'আমি এখন যাই। আমি বাড়ি ফিরেছি তা আমার গ্রেট ডেন কুকুরটা বুঝতে পেরেছে। ওর খিদে পেয়েছে। আমাকে ডাকছে। একটু ভেবে মিস্টার ক্যালিপ্টার প্রস্তাবটা নিয়ে মতামত জানাব।' এই বলে তিনি ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে গেলেন। আমিও খাওয়া সেরে দিনলিপি লিখতে বসেছি। আবার দরজায় টোকা দেবার শব্দ! মনে হয় কেউ ডাকছে...

ডক্টর শেফিল্ডের ডায়েরি :
২রা আগস্ট, টিম্বাটু ভিলেজ,
ওয়েস্ট গারো হিলস্, মেঘালয়।

আজ বেশ সকাল-সকালই বাড়ি থেকে বেড়িয়েছিলাম আমার চেম্বারে যাবার জন্য। আমার অতিথি বাঙালি ভদ্রলোককে আমারও অনেক আগে সূর্যোদয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রজাপতি ধরার জাল নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোতে দেখেছি। তাঁর সঙ্গে ভালো করে কথা বলার সময় সুযোগ পাচ্ছি না। জানি না তিনি কী ভাবছেন এ কারণে।

ডিসপেন্সারিতে আজ বেশ ভিড় ছিল। তাদের দেখা শেষ করার পর এক পেশেন্টের বাড়ি থেকে কল আসায় যেতে হল সেখানে। কাজেই আজ দুপুরে বাড়ি ফেরা হল না। ভাবলাম একেবারে বিকেলের চেম্বার সেরে বাড়ি ফিরব। সেইমতো আবার চেম্বারেই গেলাম। তবে বিকেলের দু-তিনজন ছাড়া রোগী ছিল না।

সন্ধ্যাবেলা চেম্বার বন্ধ করে বাড়ি ফিরে দেখা করতে গেলাম বাঙালি প্রজাপতি-শিকারির ঘরে। কুশল বিনিময়ের পর শুনলাম আমার পেশেন্ট মীনাক্ষী সইকিয়ার ল্যান্ডলর্ড নাকি এ-বাড়িতে এসেছিলেন। প্রজাপতি শিকারির মোনার্কটার বিনিময়ে তিনি নাকি কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের দুষ্প্রাপ্য একটা 'ব্লু বেগম' দিতে চেয়েছেন তাঁকে।

ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত! ঘরে ফিরে এলাম এরপর আমার কুকুরটার ডাকে। দুপুরে তাঁকে খেতে দিতে পারিনি। তার খাবারের বন্দোবস্ত করে নিজেও খাওয়া সেরে বাইরের ব্যালকনিতে একটু বসেছি। ঠিক সেইসময় দিল্লি থেকে

BanglaBook.org

ডক্টর নাইয়ারের ফোনটা এল মোবাইলে। ভ্রূণটার অ্যানালিসিস করা হয়েছে। দু-তিনদিনের মধ্যেই রিপোর্ট এসে যাবে।

তবে তিনি মৌখিকভাবে সে-রিপোর্ট সম্বন্ধে যা জানালেন তাতে আমি চমকে উঠলাম। কেন এই ভ্রূণটা দেখে সেই জাপানি ভ্রূণটার কথা মনে পড়ে গেছিল সেটা এবার স্পষ্ট হয়ে গেল আমার কাছে। আমি এরপর আমার ডায়েরিটা এনে এতে মীনাক্ষীর রোজনামচা থেকে টোকা অংশগুলো দেখতে লাগলাম।

তেমন কোনও অদ্ভুত ব্যাপার নেই তাতে। পাতা তিনটে বার বার পড়তে পড়তে নানা দিক থেকে তা বিশ্লেষণ করতে করতে শুধু দুটো ঘটনার মিল পেলাম। মীনাক্ষীর যে-দুবার মিসক্যারেজ হল তার কাছাকাছি সময় সে দুদিন দুটো পার্সেল রিসিভ করেছিল, আর ওই তৃতীয়বার মিসক্যারেজ হওয়ার আগে ঘটনাচক্রে মিস্টার ক্যালিপ্টা বাড়িতে ফিরে এসেছেন।

ক্যালিপ্টার কথা ভাবতেই হঠাৎ আমার মাথায় এল, আচ্ছা, তিনি হঠাৎ ওই মোনার্কটা অত একটা দামি প্রজাপতির বিনিময়ে কিনতে চাচ্ছেন কেন? মোনর্ক তো এখানে প্রচুর পাওয়া যায়! তবে কি ওই প্রজাপতির মধ্যে অন্য কোনও বিশেষত্ব আছে?

ও প্রশ্নটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হল, প্রজাপতিটা আর একবার গিয়ে দেখে আসি। গেলাম আবার ভদ্রলোকের ঘরে। আমার যাওয়াতে ভদ্রলোক একটু অবাকই হলেন। আমার ইচ্ছার কথা শুনে তিনি মোনার্কের জারটা নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আমি তাকে জিগ্যেস করলাম, 'এই প্রজাপতি আর কোথায় কোথায় পাওয়া যায় বলুন তো?'

তিনি জবাব দিলেন, 'এদের আদি বাসস্থান উত্তর আমেরিকায়। মূলত মেক্সিকো থেকে তারা যাত্রা শুরু করে, তারপর কোস্টারিকা পানামা যোজক ছুঁয়ে, লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর গা বেয়ে এদিকে লম্বা পাড়ি দেয় তারা। আমেরিকা থেকে এশিয়া এসে মোনার্ক ছড়িয়ে পড়ে সিংহলসহ সুমাত্রা, জাভা ইত্যাদি দেশে আর আমাদের, এদিকে ভারত, বাংলাদেশ, এমনকী নেপালেরও কয়েক জায়গাতে।'

আমি শুনে বললাম, 'এর মানে তো মিস্টার ক্যালিপ্টার নিজের দেশেও মোনার্ক পাওয়া যায়।'

কাচের জারের মধ্যে চুপচাপ বসে আছে প্রজাপতিটা। জারটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেও কিছুই বুঝতে পারলাম না। জারটা যখন আবার ফেরত দিতে

BanglaBook.org

যাচ্ছি ঠিক তখনই কাকতালীয়ভাবে একটা ঘটনা ঘটল। দরজা খোলা পেয়ে আমার কুকুরটা কখন আমার পিছন পিছন এঘরে ঢুকেছে তা আমরা দুজন খেয়াল করিনি। হঠাৎ পায়ে একটা মৃদু ধাক্কা অনুভব করলাম, পরে বুঝেছিলাম ব্যাপারটা, আসলে তখন কুকুরটা আমার পায়ে মাথা ঘসতে গেছিল। কিন্তু সেই ধাক্কায় আমার হাতে আলগোছে ধরা জারটা পড়ে মাটিতে সঙ্গে সঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। আর তার থেকে বেরিয়ে মোনার্কটা গিয়ে উড়ে বসল ঘরের কোণে।

প্রজাপতি-শিকারি তাঁর জালটা হাতে উঠিয়ে নিলেন ঠিকই, কিন্তু ততক্ষণে আমার কুকুরটা পৌঁছে গেছে ঘরের সেই কোণে। প্রজাপতিটার দিকে তাকিয়ে গর গর করছে কুকুরটা। তাই দেখে থমকে গেলেন ভদ্রলোক। কুকুরটা প্রজাপতিটার ওপর থাবা মারার আগেই আমি তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটে গিয়ে একধাক্কায় কুকুরটাকে সরিয়ে দিয়ে খপ করে ধরে ফেললাম প্রজাপতিটাকে।

তারপরই একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল আমার। যেন হাতে ছেঁকা লাগছে, এমন গরম মোনোর্কের দেহ। তাছাড়া অদ্ভুত এক ধাতব কাঠিন্য প্রজাপতির পাখায়। কোনও কোমলতা নেই তার স্পর্শে।

এ কীভাবে সম্ভব! মুঠো থেকে খুব সাবধানে প্রজাপতিটার ডানা ধরে বের করলাম। আলোর নীচে সেটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বিস্ময়ে চমকে উঠলাম। এটা একটা যান্ত্রিক প্রজাপতি! কিন্তু এত নিখুঁতভাবে তাকে বানানো হয়েছে যে, হাতে না নিলে বোঝাই যাবে না সেটা আসল না নকল। পাখনা দুটো অজানা কোনও ধাতু দিয়ে বানানো। পাখাদুটোর নীচে যেগুলোকে প্রকৃতির কারুকাজ বলে মনে হচ্ছিল তা আসলে সূক্ষ্ম ডায়াগ্রাম। তার মূল দেহের কোথাও হয়তো ব্যাটারি ধরনের কিছু লুকানো আছে। আর শুঁড় দুটো সম্ভবত অ্যান্টেনা। ধাতব তার দিয়ে সে-দুটো তৈরি।

দেখা শেষ হলে সেটা তুলে দিলাম সেই বাঙালি ভদ্রলোকের হাতে। তিনি ততক্ষণে হয়তো কিছু অনুমান করে নিয়েছিলেন। প্রজাপতিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বিস্মিতভাবে তিনি বললেন, 'সম্ভবত এটার মধ্যে ব্যাটারি আছে। সেটার আয়ু কমে এসেছে বলে এর ধাতব দেহ গরম হয়ে গেছে। টর্চের ক্ষেত্রে যেমন হয়। আর সেজন্যই আমি যখন প্রজাপতিটাকে ধরে ছিলাম তখন অন্য প্রজাপতিগুলো উড়ে গেলেও এটা ওড়েনি। ব্যাটারির

BanglaBook.org

চার্জ কমে যাওয়াতে এর গতি শ্লথ হয়ে এসেছে।'

এরপর তিনি বললেন, 'ক্যালিপ্টার আগ্রহের কারণ এবার বুঝতে পারলাম। নিশ্চয়ই তিনি এ-প্রজাপতির ব্যাপারে বিশেষভাবে অবগত। আমার সঙ্গে তাঁর সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হয় তখন তাঁর হাতে একটা ছোট যন্ত্র ছিল। বিপ্ বিপ্ শব্দ হচ্ছিল তা থেকে। আমি তাকে যন্ত্রটা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি সেটাকে তাঁর টেলিস্কোপের যন্ত্রাংশ বলেছিলেন। সম্ভবত সেটা কোনও ট্যাক্সিমিটার রিসিভার বা ডিটেক্টর ছিল, তার মাধ্যমেই হয়তো তিনি প্রজাপতির অবস্থান বুঝতে পেরে আমার কাছে পৌঁছে গেছিলেন।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, এমনটা হতে পারে।' কারণ, আমার মনে পড়ে গেল মীনাক্ষী তাঁর ডায়েরির এক জায়গাতে লিখেছে বাগানে তার সঙ্গে ক্যালিপ্টার সাক্ষাতের সময় ক্যালিপ্টার হাতে এমন একটা যন্ত্র দেখেছিল। আর ক্যালিপ্টা মীনাক্ষীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে মোনার্ক প্রজাপতির কোনও ঝাঁক সেখানে এসেছে কিনা।

কিছুক্ষণ আমরা দুজন চুপচাপ ভাবতে লাগলাম পুরো ব্যাপারটা নিয়ে। আমার সবকিছু দেখে শুনে কেন জানি ধারণা হতে লাগল, যে মীনাক্ষীর মিসক্যারেজের সঙ্গে এসব ঘটনার কোনও সম্পর্ক আছে। যা লুকিয়ে আছে মিস্টার ক্যালিপ্টার কাছে। বাঙালি ভদ্রলোক এরপর জানতে চাইলেন, প্রজাপতিটা কীভাবে মিস্টার ক্যালিপ্টাকে ফিরিয়ে দেবে?

আমি একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'ওঁকে বলবেন যে, আপনি ব্যাপারটা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। আর দুটো দিন সময় লাগবে সিদ্ধান্ত নিতে। প্রজাপতিটা আমাকে দিন। আমি ওটাকেও আরও খুঁটিয়ে দেখব।'

ভদ্রলোক প্রজাপতি আমার হাতে তুলে দিলেন। সেটা নিয়ে কুকুরটাকে সঙ্গে করে আমি সেঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

নৃসিংহ চৌধুরীর দিনলিপি (খণ্ডিতাংশ)।
৪ আগস্ট, পশ্চিম গারো পাহাড়,
মেঘালয়।

২ তারিখে ওই যান্ত্রিক প্রজাপতির ঘটনা দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলাম। কিন্তু তখনও আমার জানা ছিল না, যে-বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে তার তুলনায় এটা কণা মাত্রও নয়। সে-প্রসঙ্গে পরে আসছি। যাই হোক,

BanglaBook.org

সেদিন রাতে ডক্টর শেফিল্ড যন্ত্র-প্রজাপতিটা নিয়ে চলে যাওয়ার পর সারারাত আর ঘুম এল না আমার। এই প্রথম মাঝরাতে কুকুরটাকে বেশ কয়েকবার ডাকতে শুনলাম। ঘুম এল শেষ রাতে।

প্রজাপতির খোঁজে আর কাকভোরে বেরোনো হল না। ঘুম ভাঙল বেলা আটটা নাগাদ। কিছুক্ষণ পরই শেফিল্ড এলেন। তিনি বললেন, কিছু দূরে একটা গ্রামে তিনি পেশেন্ট দেখতে যাবেন। পেশেন্ট পার্টি গাড়ি নিয়ে এসেছে। মুমূর্ষ রোগী, যেতেই হবে। ফিরতে একটু বেলা হবে। তারপর তিনি মিস্টার ক্যালিপ্টা এলে কী বলতে হবে সে-কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

তিনি চলে যাবার পর আমি তখন স্নান খাওয়া সেরে বাইরে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি। ঠিক সেই সময়েই কড়া নাড়ার শব্দ শুনে দরজা খুলে দেখি মিস্টার ক্যালিপ্টা এসে উপস্থিত হয়েছেন। স্মিত হেসে তিনি বললেন, 'সুপ্রভাত। আজ ভোরে প্রজাপতি ধরতে বেরোননি?'

একটু বিস্মিত হলাম তাঁর কথা শুনে। তবে কি তিনি খেয়াল করেছিলেন যে আগের দিন, ভোরে আমি প্রজাপতি ধরতে বেড়িয়েছিলাম? আমি জবাব দিলাম, 'এখন বেরোব। তা আপনি এখন?'

তিনি জবাব দিলেন, 'আসলে মোনার্কটার ব্যাপারে আপনি কী সিদ্ধান্ত নিলেন জানতে এলাম।'

আমি জবাব দিলাম, 'আরও কয়েকটা দিন ভেবে নিয়ে তারপর আপনাকে জানিয়ে দেব।'

তিনি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'ঠিক আছে তাই ভাবুন। আমি অপেক্ষা করছি।' তারপর হেসে বললেন, 'আপনার জন্য আমার কাছে একটা ভালো খবর আছে। পাহাড়ের পশ্চিমের ঢালে যে ছোট্ট ঝরণা আছে, ওই যে যেটার সামনে একটা ছোট্ট ডোবা মতন আছে সেখানে আজ ভোরে এক ঝাঁক 'গসমার উইন্ড বাটারফ্লাই' দেখলাম! তাদের সাদা পাখনায় কালো ছোপ। জায়গাটা দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন মোজাইক পাথরের টুকরো ছড়িয়ে রেখেছে সে-জায়গাতে।'

আমি বললাম, 'ধন্যবাদ। খবরটা আমার কাজে লাগবে। মোনার্কটা আমি ওখান থেকেই ধরে ছিলাম।'

'আবার দেখা হবে।'—বলে বাড়ি ছেড়ে বেড়িয়ে গেলেন মিস্টার ক্যালিপ্টা।

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি অন্যদিনের মতো প্রজাপতি ধরার সাজসরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

BanglaBook.org

পাহাড়ের ঢালে আমি উঠে এলাম এক সময়। চারপাশের ঝোপঝাড়ে সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগোতে লাগলাম প্রজাপতির খোঁজে। কিন্তু কী আশ্চর্য, কোনও অজানা কারণে আজ কোথাও একটাও প্রজাপতি! চোখে পড়ছে না। এমনকী সাদা রঙের ইন্ডিয়ান কমন অ্যালবাট্রমগুলো, যারা সবসময় এখানে উড়ে বেড়ায়, তারাও নেই! ধীরে ধীরে এরপর আমি এগোলাম সেই ঝরণাটার দিকে। মোনার্কটা যেখান থেকে আমি সংগ্রহ করেছিলাম। আরও কিছুক্ষণ পর আমি পৌঁছোলাম সে-জায়গাতে। সূর্যের আলোতে ঝলমল করছে পাহাড়ের খাঁজ থেকে নেমে আসা জলধারা। ডোবার ধারে পাথরগুলো সাদা ধবধব করছে। এমনকী জলতলের নীচের নুড়ি পাথর, শ্যাওলাগুলোও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ঝরণার ঝর ঝর শব্দ ছাড়া চারপাশে কোনও শব্দ নেই। ক্যালিপ্টা চারপাশের ঝোপঝাড়ে মোজাইকের টুকরোর মতো প্রজাপতির ঝাঁকের কথা বলেছিল। তা দেখতে না পেলেও কাছাকাছি একটা পাথরের ওপর একটা বেশ বড় গসমার উইন্ড কিন্তু দেখতে পেলাম। হয়তো ঝাঁকটা তাকে ফেলে রেখে অন্য কোথায় উড়ে গেছে! উজ্জ্বল সূর্যকিরণে একলা বসে সে পাখা নাড়ছে।

আমি এগোলাম তার দিকে। কাছাকাছি পৌঁছে ক্ষিপ্র গতিতে জাল চালালাম। সে আটকে গেল জালে। ব্যাগ থেকে কাচের জার বার করলাম। প্রজাপতিটা খুব বিশ্রীভাবে জালে আটকে গেছে। জাল থেকে সেটাকে হাত দিয়ে খুলে জারে ঢোকানোর সময়-ই ঘটল ব্যাপারটা। প্রজাপতিটাকে স্পর্শ করতেই মুহূর্তের মধ্যে আমার দেহে তীব্র বৈদ্যুতিন প্রবাহ অনুভূত হল। যেন কোনও হাইভোল্টেজ ইলেকট্রিক তার ছুঁয়ে ফেলেছি। আর সেই মারাত্মক শক্ খেয়ে আমি ছিটকে পড়লাম জলে। এবং সঙ্গে সঙ্গে চেতনা হারালাম।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন প্রথমে বুঝতে পারলাম না আমি কোথায়। কয়েক মিনিট একটা আচ্ছন্ন ভাব কাজ করছিল, তারপর ধীরে ধীরে সব কিছু স্পষ্ট হল। একটা অদ্ভুত আকৃতির ঘরের মেঝেতে পড়ে আছি। মাথার ওপরের স্বচ্ছ ছাদ দিয়ে নক্ষত্রখচিত আকাশ দেখা যাচ্ছে। একটা নীলাভ আলো জ্বলছে ঘরটাতে। তার দেওয়ালে অসংখ্য ইলেকট্রনিক্স প্যানেল। সেখানে বিন্দু বিন্দু নানা রঙের আলো জ্বলছে নিভছে।

যে মেঝেতে আমি শুয়ে আছি সেটা সম্ভবত বুটিদার রুপালি অ্যালুমিনিয়াম

BanglaBook.org

বা ওই ধরনের কোনও ধাতুর তৈরি। ঘরের দরজাটা অবশ্য খোলা। দরজার বাইরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সেখান থেকে ঝিঁঝি পোকার ঐকতান ভেসে আসছে। আর এরপরই আমি সেই ঘরটার মধ্যে দেখতে পেলাম আমার পরিচিত একজনকে, মিস্টার ক্যালিপ্টা! কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। আমি শোয়া-অবস্থা থেকে মাটিতে উঠে বসে তাঁকে জিগ্যেস করলাম, 'আমি কোথায়? আমি কীভাবে এখানে এলাম?'

ক্যালিপ্টা বললেন, 'ওই যে আপনি প্রজাপতি ধরতে গিয়ে তড়িতাহত হলেন, তারপর আমিই আপনাকে এখানে এনেছি। এটা কোথায়, তা না জানলেও আপনার চলবে। সেই প্রজাপতিটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন? আমাকে ওটা দিন।' শেষ কথাগুলো বেশ কর্কশ ভাবে বললেন মিস্টার ক্যালিপ্টা।

আমি তাঁর প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে উঠে দাঁড়াতে গেলাম। আর তখনই আমি বুঝতে পারলাম আমার হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। ক্যালিপ্টা কি তাঁর মানে আমাকে অপহরণ করে এনেছেন? যে যান্ত্রিক প্রজাপতি থেকে আমি তড়িতাহত হলাম নিশ্চয়ই তার পেছনে মিস্টার ক্যালিপ্টারও কোনও হাত আছে! মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা ভেবে নিয়ে হাত-বাঁধা অবস্থায় কোনওক্রমে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আমার হাত বাঁধা কেন? আপনি কি আমাকে ধরে এনেছেন? শিগগির হাত খুলুন।'

ক্যালিপ্টা মৃদু হেসে বললেন, 'ঠিক খুলে দেব। তার আগে বলুন প্রজাপতিটা কোথায়?'

আমি এবার একটু ইতস্তত করে বললাম, 'ওটা আমার সঙ্গে নেই। বাড়িতে আছে।'

ক্যালিপ্টা বললেন, 'আপনার সঙ্গে ওটা নেই তা আমিও জানি। তবে ওটা আপনার ঘরে নেই। আমি খুঁজে দেখেছি।'

'আপনি আমার ঘরে ঢুকেছিলেন আমার অবর্তমানে? আমার বাঁধন খুলে দিন।' চিৎকার করে বলে উঠলাম আমি।

তিনি বললেন, 'প্রজাপতিটা কোথায় আপনি বলুন। ওটা এক্ষুনি আমার দরকার।'

আমি আবার চিৎকার করে উঠলাম, 'আমি যদি বাড়ি পৌঁছোতে না পারি তবে কিছুতেই বলব না ওটা কোথায় আছে। ওটা তো একটা যান্ত্রিক প্রজাপতি। আপনার কী দরকার ওটা দিয়ে?'

'যান্ত্রিক' শব্দটা শুনেই মুহূর্তের জন্য কেমন যেন থমকে গেলেন ক্যালিপ্টা। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, ওটা যান্ত্রিক। আমার সঙ্গীরা ওটা মোনার্কের ঝাঁকের সঙ্গে মেক্সিকো থেকে এখানে পাঠিয়েছিল। ওটা আসলে একটা সার্কিট, যা এই ঘরটাকে মহাশূন্যের দিকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।'

তাঁর কথা শুনে বিস্মিতভাবে আমি প্রশ্ন করলাম, 'আপনি কে? কোনও বিজ্ঞানী?'

ক্যালিপ্টা বললেন, 'হ্যাঁ, বিজ্ঞানী তো বটেই। তবে...'

কী যেন একটা বলতে গিয়ে তিনি থেমে গেলেন। তারপর একটু চুপ করে থেকে কর্কশভাবে বললেন, 'সময় নষ্ট করবেন না। সার্কিটটা কোথায়? ওটার জন্য আপনাকে খুন করতেও দ্বিধা করব না আমি।'

এবার আমি সত্যিই ভয় পেয়ে গেলাম। তাঁকে কী জবাব দেব ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। ঠিক সেইসময় আর একটা কণ্ঠস্বর কানে এল—'ওটা আমার কাছে, এই যে।'

তাকিয়ে দেখি ঘরের ভেতরে প্রবেশ করেছেন ডক্টর শেফিল্ড...।

BanglaBook.org

ডক্টর শেফিল্ডের ডায়েরি ঃ
৪ আগস্ট, ওয়েস্ট গারো হিলস,
মেঘালয়।

পৃথিবীতে এমন অনেক ঘটনার কথা শোনা যায় যা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। গতকাল রাতে আমার জীবনে যা ঘটল তা আমি এখনও মাঝে মাঝে বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না। এ ঘটনার সাক্ষী প্রজাপতি-শিকারি নৃসিংহ চৌধুরী যদি না থাকতেন তাহলে আমি ওই ঘটনা সম্বন্ধে নিশ্চিত এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হতাম যে কিছু সময়ের জন্য আমার ইন্দ্রিয়গুলো আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

পরশু রাতে বাঙালি ভদ্রলোকের ঘর থেকে প্রজাপতিটা নিয়ে এসেছিলাম। ঘরে ফিরে বেশ কিছুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে সেটাকে আমার কোটের পকেটে রেখে দিয়েছিলাম। পরদিন ভোরে পরিচিত একজন রোগীকে দেখতে যাবার জন্য ডাক এল। চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে আমি পেশেন্ট পার্টির সঙ্গে তাদের গ্রামে গেলাম। ফিরলাম বেলা বারোটা নাগাদ। বাইরে থেকেই আমার গ্রেট ডেনটার পরিত্রাহি চিৎকার কানে এল।

বাড়িতে ঢুকে দেখি দুটো ঘর-ই লণ্ডভণ্ড। কোনও কিছু খোয়া না গেলেও কেউ বা কারা যেন লন্ডভন্ড করে খুঁজেছে কিছু। গ্রেট ডেনটা চেন ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করছে। হঠাৎ আমি চৌধুরীর ঘরের মেঝেতে কুড়িয়ে পেলাম একটা জিনিস। স্বচ্ছ কাগজের মধ্যে রাখা একটা দুর্মূল্য 'রিগাল ব্লু বেগম'!

মুহূর্তের মধ্যে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল সবকিছু, কে কী কারণে বাড়িতে ঢুকেছিল! তবে যান্ত্রিক মোনার্কটা সে নিয়ে যেতে পারেনি। সেটা এখন আমার কোটের পকেটে।

কিন্তু চৌধুরী কোথায় গেলেন? তিনি কি প্রজাপতি ধরতে গেছেন? নাকি তাকে অপহরণ করা হল?

সঙ্গে-সঙ্গে আবার বেড়িয়ে ছুটলাম পাহাড়ের দিকে। ঘণ্টা তিনেক ধরে পাহাড়ের প্রত্যেকটা ঢালে, তার মাথার জঙ্গলে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালালাম। বিকেল হয়ে এল, কিন্তু তাঁর দেখা মিলল না। আমি তখন ঠিক করলাম যে সরাসরি গিয়ে ক্যালিপ্টাকে ধরব। তিনি যে আমার বাড়ি গেছিলেন তার প্রমাণ তো ওই ব্লু বেগমটা। সম্ভবত সেটা তাঁর পকেট থেকে পড়ে গেছিল।

দ্রুত নীচে নেমে এলাম। হাজির হলাম গিয়ে ক্যালিপ্টার বাড়ি। দোতলায় তাঁর অংশ তালা দেওয়া। মীনাক্ষীর পরিচারিকা আমাকে জানাল যে, বাড়িওলা সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন আর ফেরেননি। আমি এরপর দুশ্চিন্তাগ্রস্তভাবে নিজের বাড়িতে ফিরে এলাম।

না, চৌধুরী ফিরে আসনেনি। দুশ্চিন্তা ক্রমশ বাড়তে লাগল। কিভাবে তাঁর খোঁজ করা যায় ভাবতে লাগলাম। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এল। আমার গ্রেট ডেনটা প্রশিক্ষিত কুকুর। তার সাহায্যে যদি একটা শেষ চেষ্টা করা যায় চৌধুরীকে খোঁজার ব্যাপারে। কুকুরটা সমানে ডেকে চলেছে। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চেন ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করছে। আমি তাড়াতাড়ি চৌধুরীর ঘরে গিয়ে তাঁর ব্যবহৃত একটা জামা নিয়ে এলাম। কুকুরটাকে বাইরে এনে, বাড়িতে তালা দিয়ে চৌধুরীর জামাটা শোঁকালাম তাকে। বুদ্ধিমান কুকুর আমাকে টানতে টানতে তারপর বাড়ির বাইরে নিয়ে এল। আমাকে নিয়ে এগোল পাহাড়ের একটা ঢালের দিকে। পাহাড়ের মাথায় তখন সূর্য অস্ত যেতে বসেছে। তার রাঙা আলো ছড়িয়ে পড়েছে সারা উপত্যকায়।

কুকুরটার সঙ্গে যখন ওপারে উঠে এলাম ঠিক তখনই অন্ধকার নামল।

BanglaBook.org

তার পিছু পিছু কোথায় যাচ্ছি তা ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না। তারপর এক সময় চাঁদ উঠল। একটা ঝরণা দেখতে পেলাম। তার পাশ দিয়ে কিছুটা এগিয়ে কুকুরটা ঝোপ জঙ্গলে ঘেরা একটা ঢিবির সামনে আমাকে দাঁড় করাল। এটা পাহাড়ের শেষ প্রান্ত। ঢিবিটার কিছুটা তফাতেই অতল খাদ। দীর্ঘ বিস্তৃত খাদ। ওপারে অন্য দেশের সীমানা। ঢিবির সামনে বড় বড় ঝোপঝাড়। কুকুরটা তাকিয়ে আছে সেদিকেই।

আমি এখানে কোনওদিন আসিনি। কুকুরটার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম ঝোপের আড়াল থেকে একটা গুহামুখ যেন উঁকি দিচ্ছে। ঝোপঝাড় একটু সরাতেই সেটা স্পষ্ট হল। কুকুরটাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে সন্তর্পণে ভিতরে প্রবেশ করলাম।

কুড়ি-পঁচিশ ফুট লম্বা একটা টানেল। তার শেষপ্রান্ত থেকে আবছা আলো ভেসে আসছে। আমি এগোলাম সেদিকে। একটা দরজা। তার ওপাশে একটা অদ্ভুত ঘর। নীল আলো জ্বলছে সেখানে। অসংখ্য বৈদ্যুতিক প্যানেল সারা ঘরে। মাথাটা কাচ জাতীয় কিছু দিয়ে তৈরি। আকাশ দেখা যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারলাম বাইরে থেকে যাকে ঢিবি বলে মনে হচ্ছিল সেটা আসলে ক্যামোফ্লেজ। আসলে ঢিবির আড়ালে লুকিয়ে আছে ঘরটা।

দরজার বাইরে টানেলের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে সেই ঘরের ভেতরে দেখতে পেলাম মিস্টার ক্যালিপ্টা আর চৌধুরীকে। দুজনেই দাঁড়িয়ে আছেন। ক্যালিপ্টা ওই যান্ত্রিক প্রজাপতিটার খোঁজ করছেন চৌধুরীর কাছে। আর চৌধুরী তার খোঁজ দিতে রাজি হচ্ছেন না। তাঁর হাত বাঁধা। শেষ পর্যন্ত চৌধুরীকে যখন ক্যালিপ্টা খুনের হুমকি দিলেন তখন আমি আর থাকতে না পেরে পকেট থেকে যান্ত্রিক মোনার্কটা বার করে সেঘরে প্রবেশ করে বললাম, 'ওটা আমার কাছে, এই যে।'

তারা দুজনেই এবার ফিরে তাকালেন আমার দিকে। ক্যালিপ্টা দেওয়ালের গায়ে একটা প্যানেলের গায়ে হাত রেখে তাঁর দস্তানা পড়া ডান হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে বললেন, 'ওটা আমার জিনিস। আমাকে দিয়ে আপনারা চলে যান।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ দেব। কিন্তু তার আগে আপনি বলুন, আপনি কে? এই ভদ্রলোককে আপনি বেঁধে রেখেছেন কেন?'

ক্যালিপ্টা প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন, 'প্রজাপতিটা আমাকে দিন। ওটা দিলে আমি ওকে মুক্তি দেব।'

আমি চৌধুরীর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, 'বলেছি তো দেব। আগে বলুন আপনি কে?'

একটা অস্ফুট হাসি ফুটে উঠল ক্যালিপ্টার ঠোঁটের কোণে। তিনি জবাব দিলেন, 'ধরুন আমি তেমন কেউ, যারা সভ্যতার উষালগ্নে মানুষকে জ্ঞানের আলো দেখিয়েছিল। যেমন মিশরের মানুষকে শিখিয়েছিল কীভাবে নিখুঁত জ্যামিতিক নক্সায় গড়ে তুলতে হয় পিরামিড। প্রাচীন অ্যাজটেকদের শিখিয়েছিল কীভাবে বানাতে হয় ভবিষ্যতের নিখুঁত ক্যালেন্ডার। ইঙ্কাদের জানিয়েছিল ভূমিকম্পরোধী স্থাপত্যের কৌশল। যারা এ-গ্রহের মানুষকে সর্বপ্রথম মহাবিশ্বের সন্ধান দেবার চেষ্টা করেছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ যারা শিখিয়েছিল পৃথিবীর মানুষকে...।'

ক্যালিপ্টার কথা শুনে মৃদু চমকে উঠলাম। কিন্তু এ যে বিশ্বাস করা কঠিন আমি তাঁকে বললাম, 'হেঁয়ালি নয়। যা বলবার তা স্পষ্ট করে বলুন। এভাবে সময় নষ্ট করাটা কারোর পক্ষেই আকাঙ্ক্ষিত নয়।'

তিনি কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তাঁর ঠোঁটের কোণে হাসি এবার যেন আরও স্পষ্ট হল। তারপর তিনি বললেন, সেটা কিন্তু আপনাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে না।

আমি বললাম, 'তা না হোক, বলুন আপনি কে?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'তবে দেখুন আমি কে—'

ধীর পায়ে তিনি এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন ঘরের ঠিক মাঝখানে ধাতব পাতে মোড়া একটা নীচু বেদির মতো জায়গায়। শেষবারের মতো তিনি একবার স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। তারপর পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেলেন। আর এর পরেই হঠাৎ তাঁর পোশাকগুলো যেন অগ্নিভ হয়ে উঠল কয়েক মুহূর্তের জন্য। পরমুহূর্তে সেগুলো ছাই হয়ে পড়ল তাঁর পায়ের কাছে। অথচ পোশাকের আগুন গ্রাস করেনি তাঁর দেহকে! আমাদের সামনে সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যালিপ্টা।

কিন্তু ক্যালপ্টার সেই দেহ দেখে আমার কেন জানি মনে হল এটা একটা খোলস। রোমহীন, ভাঁজহীন, মৃদুকঠিন ত্বকসম্পন্ন মসৃণ এক দেহ। অনেকটা পোশাকের দোকানে পূর্ণবয়স্ক মানুষের আকৃতির যে পুতুলগুলির উপর পোশাক চাপানো হয় অনেকটা সেইরকম দেখতে।

আর এরপরই আমার অনুমান সত্যি হল। ঈষৎ শব্দ করে অনেকটা ডিমের খোলার মতো আঁকাবাঁকা ফাটল ধরতে শুরু করল সেই দেহে। একটা

BanglaBook.org

একটা করে ডিমের খোলার মতোই খসে পড়তে লাগল বহিরাবরণ আর তাঁর ভেতর থেকে উঁকি দিতে লাগল থকথকে সবুজ জেলির পিণ্ড। ঠিক যেন অনেকটা কোনও দানবীয় প্রজাতির পিউপার মতো!

—শেষ টুকরোটাও একসময় খসে গেল সেই সবুজাভ গুটির গা থেকে। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সবুজাভ জেলির আবরণে মোড়া অদ্ভুত এক অবয়ব। আকারে সেটা পাঁচ ফুটের একটু বেশি হবে।

আর এরপরেই সেই জেলির ভেতর থেকে উঁকি মারল এক কুৎসিত মাথা। মাথার ওপর থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াল এন্টেনার মতো দুটো শুঁড়। উন্মোচিত হল দুটো গোলাকার হলুদাভ চোখ। অনেকটা গলদা চিংড়ির চোখের মতো। কোটর চিরে চোখ দুটো বাইরে বেরিয়ে এল। লম্বাটে কুৎসিত মুখমণ্ডলের নীচের অংশে উন্মোচিত হল সার সার তীক্ষ্ণ দাঁতের পাটি। সবশেষে থকথকে জেলির আবরণ ভেদ করে কাঁধের কাছ থেকে বেরিয়ে এল দুটো পাখা। এত কুৎসিত পাখা আমি জীবনে দেখিনি। সবুজাভ আঁঠালো তরল মাখা পাখাদুটোর শেষ প্রান্তে হাতের পাতার মতো অংশ আছে। তাতে তিনটে করে আঙুল, আঙুলের প্রান্তে তীক্ষ্ণ নখর!

আমার পা দুটো যেন কেউ মাটির সঙ্গে আটকে দিয়েছে। আমি দেখে যাচ্ছি সেই ভয়ঙ্কর অবিশ্বাস্য দৃশ্য। একসময় জেলির আবরণ ভেদ করে পুরো দেহটাই উন্মোচিত হল। সবুজাভ প্রাণীটার দেহের সঙ্গে প্রজাপতির দেহেরও অনেকটা মিল আছে। শুঁড়, লম্বাটে মাথা, ডানা, বুকের চেয়ে নিম্নাংশের দৈর্ঘ্য বেশি এবং তার প্রান্তদেশ ছুঁচালো। এক অতি কুৎসিৎ প্রজাপতি যেন তার নিজের উপর ভর করে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সারা দেহ তার চটচটে জেলিতে মাখামাখি। আমি একবার তাকালাম চৌধুরীর দিকে। তাঁর চোখও আমার মতোই বিস্মিত, বিস্ফারিত।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এরপর ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে উঠল প্রাণীটা। তারপর একটা ধাতব কিচ্ কিচ্ শব্দ করে হেলতে দুলতে সে এগোতে লাগল আমাদের দিকে। উত্তেজনায় আমি মুহূর্তের মধ্যে সজোরে চেপে ধরেছিলাম আমার হাতের সেই ধাতব প্রজাপতিটাকে। হঠাৎই মচ্ করে একটা শব্দ হল। নিজের অজান্তেই হাতের চাপে প্রজাপতির কোন অংশ সম্ভবত ভেঙে গেছিল কিন্তু সেই অল্প শব্দেই আমার হুশ ফিরল। অদ্ভুত প্রাণীটা তখন তার তীক্ষ্ণ নখরযুক্ত পাখাদুটো দিয়ে আমাকে আলিঙ্গন করার জন্য বেশ কিছুটা এগিয়ে এসেছে।

BanglaBook.org

নিশ্চয়ই তার উদ্দেশ্য, প্রজাপতিটাকে হস্তগত করা। আর দেরি না করে আমি তাকে দূরে সরাবার জন্য মুঠোয় ভরা কৃত্রিম প্রজাপতিটাকে ছুড়ে ফেললাম ঘরের অন্য প্রান্তে। প্রাণীটা একবার শুধু তার কুৎসিত মাথাটা ফিরিয়ে দেখে নিল সে জিনিসটা ঘরের কোথায় গিয়ে পড়ল। আমি ভেবেছিলাম এবার সে সেটার দিকে এগিয়ে যাবে। কিন্তু তা না করে সে তীব্র কিচ্ কিচ্ শব্দ করে মনে হয় হাসল। তারপর আবার এগোল আমাদের দিকে। তার ডানার শেষ প্রান্তের নখগুলি প্রসারিত হচ্ছে। আমি দরজার দিকে ছুটলে আমাকে হয়তো সে ধরতে পারবে না কিন্তু চৌধুরীকে নির্ঘাত ধরে ফেলবে।

ঠিক এই মুহূর্তে একটা কাণ্ড ঘটল। শুনতে পেলাম আমার গ্রেট ডেনের কানফাটানো গর্জন। আমাকে অনুসরণ করে কখন যেন সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছে। আর তারপরই সে তার বাঘের মতো শরীরটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল অদ্ভুত প্রাণীটার ওপর। পরমুহূর্তেই দুজনে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। কুকুরের গর্জন আর প্রাণীটার হিংস্র কিচ্ কিচ্ শব্দে ভরে উঠল ঘর। দাঁত আর নখ দিয়ে দুজনেই ঘায়েল করার চেষ্টা করতে লাগল পরস্পরকে।

প্রমাদ গুনলাম আমি। সময় নষ্ট করা যাবে না। চৌধুরীকে টানতে টানতে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে ঢুকলাম টানেলে। টানেল ধরে ছুটতে শুরু করলাম। আমাদের পেছনে ভেসে আসতে লাগল মরণাপণ লড়াইয়ের শব্দ। কোনওরকমে টানেলের বাইরে বেড়িয়ে এলাম। হঠাৎ গ্রেট ডেনটার তীব্র আর্ত চিৎকার কানে এল। তারপরই যেন সব শব্দ থেমে গেল। আর টানেলের ভেতর থেকে কামানের গোলার মতো বাইরে বেরিয়ে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে আমাদের কিছুটা তফাতে ছিটকে পড়ল আমার কুকুরটার প্রাণহীন নিস্পন্দ দেহ।

প্রাণীটা কি এবার বেরিয়ে আসবে? আর কালবিলম্ব না করে আমরা ছুটতে শুরু করলাম। কিছুটা এগোবার পরেই মনে হল আমাদের পা যেন কাঁপছে। পা নয়, মাটি। আর এরপরেই প্রচণ্ড শব্দ করে আমাদের পেছনের সেই পাথরের ঢিবির মাথাটা চৌচির হয়ে গেল। আলোকিত হয়ে উঠল চারপাশ। ঢিবির ভেতর থেকে উজ্জ্বল একটা বিরাট বাক্স যেন চাকতির মতো পাক খেতে খেতে শোঁ শোঁ শব্দ করে তিরবেগে আকাশের দিকে উঠতে শুরু করল।

মহাকাশযান! আমরা যে-ঘরের মধ্যে এতক্ষণ ছিলাম সেটাই সম্ভবত উড়ে

BanglaBook.org

যাচ্ছে আকাশের দিকে। আমরা তাকিয়ে রইলাম সেদিকে। অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য! কিন্তু বেশ অনেকটা ওপরে উঠে গিয়ে পরেই সেটা আবার তিরবেগে নামতে শুরু করল নীচের দিকে। চারপাশ আলোকিত করে সেটা পৃথিবীর কাছাকাছি নেমে এসে অদৃশ্য হল খাদের মধ্যে। কয়েক মুহূর্ত পরেই সেই খাদের নীচ থেকে ভেসে এল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। সম্ভবত ধ্বংস হল মহাকাশযানটা।

তবু আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সমীচীন মনে করলাম না। কিছু করার থাকলে তা দিনের আলোতেই করতে হবে। এক অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়ে প্রায় বাক্‌রুদ্ধ অবস্থায় আমরা ফেরার পথ ধরলাম। ঠিক করলাম সকালে ফিরে কুকুরের মৃতদেহটা নিয়ে যাব। বিস্মিত, বিধ্বস্ত অবস্থায় মাঝরাতে ঘরে ফিরলাম আমরা। সারাটা রাত যেন ঘোরের মধ্যে কাটল।

আজ দিনের আলো ফুটলে আমরা স্থানীয় দুজন লোককে সঙ্গে নিয়ে পাহাড় ভেঙে হাজির হলাম সেই জায়গাতে। সেই ঢিবির মতো উঁচু জায়গাটা আর নেই। সেখানে একটা গহ্বর সৃষ্টি হয়েছে। চারপাশে ঝোপঝাড়গুলো আগুনে ঝলসে গেছে। খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে নীচে উঁকি মারলাম। অতল খাদ নীচে, কিছুই চোখে পড়ল না। কিছুটা দূরে পড়েছিল আমার কুকুরটার মৃতদেহ। তার চামড়া ঝলসে গেছে। লোক দুজনের সাহায্যে সেই মৃতদেহটাকে বহন করে নীচে ফেরার পথ ধরলাম।

বাড়ি ফিরে প্রথমে কুকুরের মরদেহটাকে বাগানে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। আমাদের জন্য সে প্রাণ দিল। বার বার মনে পড়ছে তার কথা। তেজস্ক্রিয়তার স্পষ্ট চিহ্ন ধরা পড়েছে তার দেহে। ওই মহাজাগতিক প্রাণীটা তেজস্ক্রিয় বিকিরণে সক্ষম ছিল। আমরা দুজন খুব জোর বেঁচে গেছি! সে আমাকে আলিঙ্গন করলে আমি নির্ঘাত মারা পড়তাম।

মহাকাশযানটা ধ্বংস হবার পিছনে আমি একটা কারণ পেয়েছি। প্রজাপতিটা ছুড়ে ফেলার আগে যখন আমি সেটাকে সজোরে চেপে ধরেছিলাম তখনই ওটার কোনও একটা অংশ যে ভেঙে ফেলতে সক্ষম হয়েছি তা বুঝতে পেরেছিলাম। ক্ষতিগ্রস্ত সার্কিটের কারণেই সম্ভবত মহাকাশযানটা মুখ থুবড়ে পড়ে। তবে একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। আমার কুকুরটা নয় তাকে আক্রমণ করেছিল বলে মরল। কিন্তু মীনাক্ষীর গর্ভস্থ সন্তানরা কী দোষ করেছিল, তাদের সে মারল কেন?

কাল ভোরে চৌধুরী চলে যাচ্ছেন। আমাকে এবার উঠতে হবে তাঁর ঘরে যাবার জন্য। তিনি যাবার আগে তাঁকে একটা জিনিস উপহার দেব।

BanglaBook.org

সেটা ছদ্মবেশী ক্যালিপ্টার ফেলে যাওয়া 'রিগাল ব্লু বেগম' বাটারফ্লাই। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, ওটা যান্ত্রিক নয়, আসল প্রজাপতি। যার কাছ থেকে ক্যালিপ্টা জিনিসটা পেয়েছিলেন সে-লোকের সন্ধানও পেয়েছি। কাগজপত্র নিয়ে কোনও অসুবিধা হবে না।

ঠিক দু-বছর পর নৃসিংহ চৌধুরীর দিনলিপি
৫ আগস্ট, পশ্চিম গারো পাহাড়,
মেঘালয়।

ডাক্তার শেফিল্ডের আমন্ত্রণে আবার ঠিক দু-বছর পর তাঁর বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছি। না, প্রজাপতি ধরতে নয়, প্রজাপতি ধরা আমি দু-বছর আগে সেই রাতে, সেই ঘটনার পর ছেড়ে দিয়েছি। শেফিল্ড এখানে আমাকে একটা অনুষ্ঠানে যোগদানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। যদিও কী অনুষ্ঠান আমাকে জানাননি।

বাগানে দাঁড়িয়ে আমাদের দুজনের কথা হচ্ছিল। কিছুটা তফাতে শেফিল্ডের সেই কুকুরটার শ্বেতপাথরের সমাধি। গারো পাহাড়ের ফাঁক গলে শেষ বিকেলের মায়াবী আলো এসে পড়েছে সেখানে। একঝাঁক মোনার্ক প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে সেই সমাধির ওপর। একটু ইতস্তত করে আমি ডাক্তার শেফিল্ডকে জিগ্যেস করলাম, 'আপনার সেই পেশেন্ট মীনাক্ষীদেবীর গর্ভস্থ সন্তানকে ক্যালিপ্টা বার বার করে কেন নষ্ট করছিল, তার কোনও সমাধানসূত্র পেয়েছেন?'

ডাক্তার শেফিল্ড বললেন, 'সম্ভবত পেয়েছি। ঘরে চলুন, কিছু জিনিস আপনাকে দেখাব।'

তাঁর পিছন পিছন ঘরে ঢুকলাম। তিনি আলমারি থেকে একটা ফাইল বের করে এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। চেয়ারে বসে ফাইলটা খুলতেই তার মধ্যে থেকে বেরোল কয়েকটা পুরোনো পেপার কাটিং। ডাক্তার শেফিল্ড বললেন, তথাকথিত সেই ক্যালিপ্টার বাড়ির টেলিস্কোপ রুমের একটি সিন্দুক থেকে এগুলো উদ্ধার করেছি। এ কাগজগুলো সবই মেক্সিকো থেকে, আরও নির্দিষ্টভাবে বললে ইউকাতান প্রদেশের রাজধানী সেরিদা থেকে ইংরেজিতে প্রকাশিত।

আমি একটা পেপার কাটিং পড়লাম। তাতে ইউকাতানএর বেশ কয়েকটি

BanglaBook.org

অঞ্চলে সন্তানসম্ভবা মহিলাদের অকস্মাৎ গর্ভপাত বা মৃত সন্তান প্রসবের খবর ছাপা হয়েছে। সেখানে ঘটনাটা এত বেশি ঘটছিল যে তা সংবাদপত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

দ্বিতীয় যে পেপারকাটিংটা হাতে নিলাম তাতে একটা প্রত্ন আবিষ্কারের খবর ছাপা আছে। ইউকাতানের কেতমল্ মন্দিরের কাছে খনন কার্য চালাবার সময় অক্টোভিও নামে এক প্রত্নবিদ ভূগর্ভস্থ এক কক্ষে পাথরের তৈরি এক অদ্ভুত কফিন আবিষ্কার করেন বল উল্লেখ আছে যে সে-রিপোর্টে। ডাক্তার শেফিল্ড সেই পেপার কাটিংগুলোর মধ্যে থেকে একটা কাটিং বেছে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এটা পড়ুন, তাহলে হয়তো ব্যাপারটা কিছুটা স্পষ্ট হবে আপনার কাছে।'

তাতে লেখা—

"নিজস্ব সংবাদদাতা, সেরিদা : গতকাল সকালে কেতমল্ অঞ্চলের এক প্রাচীন স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে বিখ্যাত প্রত্নবিদ অক্টোভিও কোলাসের মৃতদেহ আবিষ্কার হয়েছে। কিছুদিন আগে অক্টোভিওর বক্তব্য নিয়ে পণ্ডিত মহলে শোরগোল পড়ে গেছিল। অনেকে তাঁকে পাগল বলেও আখ্যা দিয়েছিলেন সে জন্য। বেশ কিছুকাল আগে নেটিভ আমেরিকানদের জ্ঞান ও উর্বরতার দেবতা কেতমল কোয়াতল্ মন্দিরের কাছে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চলার সময় পাথরের নল সমন্বিত এক শূন্য কফিন তিনি আবিষ্কার করেন। এ পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল। কিন্তু কেতমল্ সংলগ্ন অঞ্চলে অকস্মাৎ ব্যাপক হারে গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যুর ঘটনা শুরু হলে সে সম্বন্ধে তিনি অদ্ভুত এক ব্যাখ্যা দেন। যা তাঁকে বিতর্কের কেন্দ্রগুলিতে পৌঁছে দেয়। এসব অঞ্চলের প্রাচীন মন্দিরগুলোতে এক সময় দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি দেওয়ার প্রথা ছিল। প্রাচীন লোককথা অনুযায়ী দেবতারা নাকি ছিলেন 'আত্মভুক'। অর্থাৎ যে অজ্ঞাত শক্তি আমাদের দেহকে চালিত করে সেই শক্তি ভক্ষণ করেই নাকি বেঁচে থাকতেন দেবতারা। গর্ভস্থ সন্তানদের মৃত্যুর ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন যে, ভূগর্ভস্থ কক্ষে যে আধার তিনি খুঁজে পেয়েছেন, তার মধ্যে হিমায়িত অবস্থায় তথাকথিত

কোনও দেবতা ঘুমিয়ে ছিলেন। কয়েক হাজার বছর পর তিনি ঘুম ভেঙে বাইরে বেড়িয়ে পড়েছেন। গর্ভস্থ শিশুদের প্রাণ ভক্ষণ করে তিনি নিজের শক্তি সঞ্চয় করছেন। গর্ভস্থ শিশু তার লক্ষ্য কেন, সে বিষয়েও অক্টোভিও একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। পূর্ণাঙ্গ মানুষকে হত্যা করার চেয়ে গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা করলে তা লোকচক্ষুতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর এ বক্তব্যের পর অনেকেই তাঁকে পাগল আখ্যা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। অক্টোভিওর সব প্রত্নবিদ সঙ্গীরাই তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করলেন। ইদানীং অক্টোভিও একাকি পাগলের মতোই ঘুরে বেড়াতেন ওই অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা মায়া ও অ্যাজটেক সভ্যতার প্রাচীন মন্দির ও ধ্বংসস্তূপগুলোতে। তিনি নাকি ওসব জায়গাতে খুঁজে বেড়াতেন সেই আত্মভুক দেবতাকে। সম্ভবত তিনি সত্যিই উন্মাদ হয়ে গেছিলেন। প্রত্নবিদ অক্টোভিওর মৃতদেহ পরীক্ষা করে ডাক্তাররা জানিয়েছেন কোন তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃতদেহ যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে কোনও তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে কিনা তার সন্ধানে সরকারের তরফ থেকে এক অনুসন্ধানকারী দল পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।"

BanglaBook.org

রিপোর্টটা পড়ার পর আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ডাক্তার শেফিল্ডকে প্রশ্ন করলাম, 'ওই মহাজাগতিক প্রাণী আত্মভুক এটা বিজ্ঞানসম্মতভাবে কী সম্ভব?'

শেফিল্ড বললেন, 'আত্মা' শব্দটা বলতে আপনি ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় না গিয়ে যদি এটাকে একটা শক্তি হিসাবে দেখেন তবে শক্তির স্থানান্তকরণ তো সম্ভব। প্রাণ তো আসলে একটা শক্তি।'

আমি একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'আমাদের ধর্মশাস্ত্র ভাগবত গীতায় বলা আছে, আত্মা অবিনশ্বর। অস্ত্র দিয়ে তাকে ছেদ করা যায় না, আগুনে তাকে পোড়ানো যায় না। সে শুধু দেহ পরিবর্তন করে। হয়তো আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতরা আত্মা বলতে শক্তিকে বুঝিয়েছিলেন। শক্তির ব্যাপারটা তো একই। ব্যাপারটা এর আগে আমি এভাবে ভেবে দেখিনি।'

ডাক্তার শেফিল্ড বললেন, 'বিজ্ঞান তো চলমান। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার হয়ে চলেছে। আমাদের বিজ্ঞান এই 'আত্মা' নামক 'শক্তি'র স্থানান্তরের ব্যাপারটাও হয়তো কোনদিন আবিষ্কার করবে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম দুজনে। শেফিল্ড তারপর বললেন, 'এবার চলুন, সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হবে।' আমি বললাম, 'কোথায়? কী অনুষ্ঠান?'

ডাক্তার শেফিল্ড হেসে জবাব দিলেন, 'সেই মিস্টার ক্যালিপ্টার বাড়ি। সেই মীনাক্ষীর এক ফুটফুটে সন্তান জন্মেছে। তার আজ এক বছর পূর্ণ হচ্ছে। সেই উপলক্ষ্যে আমার উদ্যোগেই একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। আপনাকে ক্যালিপ্টার টেলিস্কোপ-ঘরটাও দেখাব। ওই টেলিস্কোপে চোখ রেখে হয়তো অজানা কোনও গ্রহর দিকে তাকিয়ে থাকত সে। সম্ভবত মেক্সিকোতে আর থাকা সম্ভব হচ্ছিল না বলে এখানে এসেছিল, আর এখান থেকেই মহাকাশে পাড়ি জমানোর চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু প্রাচীন মেক্সিকান দেবতার সে-গ্রহে আর ফেরা হল না।'

ডাক্তার শেফিল্ডের সঙ্গে সেই বাড়ির দিকে এগোতে এগোতে হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ল। ক্যালিপ্টা বলেছিলেন, 'আমার সঙ্গীরা ওটা মোনার্কের ঝাঁকের সঙ্গে মেক্সিকো থেকে এখানে পাঠিয়েছিল।' তাহলে কি আজও তাঁর সঙ্গীরা রয়ে গেছে সেখানে?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

মহাশোলের টোপ

রেলস্টেশন থেকে রিকশাভ্যানটা রমানাথকে নিয়ে এসে নামিয়ে দিল পাকা রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানটা। তার আর এগোবার উপায় ছিল না। সামনের মেঠো রাস্তায় হাঁটু সমান কাদা। আর সেই রাস্তার দুপাশে যতদূর চোখ যায় শুধু বর্ষার জল-ডোবা ধানখেত। বেলা দুপুর হলেও কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে। টিপটিপ করে বৃষ্টিও পড়ছে। স্টেশন থেকে এদিকে আসার পথে টোকা মাথায় দেওয়া চাষা-ভুষো শ্রেণির লোকজন ছাড়া তেমন বেশি মানুষজন চোখে পড়েনি রমানাথের।

রিকশাভ্যান থেকে নেমে রমানাথ প্রথমে তার চটিজুতো কাঁধের ব্যাগের

BanglaBook.org

মধ্যে পুরে ধুতিটা একটু গুটিয়ে নিলেন, তারপর এক হাতে ছাতা, অন্য হাতে তার হুইলসমেত ছিপটা নিয়ে নেমে পড়লেন কর্দমাক্ত পথে। দু-পাশের ধানখেত থেকে অবিশ্রান্ত ব্যাঙের ডাক ভেসে আসছে, সেই শব্দ শুনতে শুনতে এগোলেন তিনি। কিছুটা এগোবার পরই দেখতে পেলেন। কয়েকজনকে। কাদা-মাখা গা, কাদা-মাখা পা, সদ্য খেতের কাজ করে রাস্তায় উঠে এসে দাঁড়িয়েছে তারা। কালিদহটা কোথায় তা ভালো করে জেনে নেবার জন্য রমানাথ তাদের সামনে এগিয়ে গেলেন। তিনি কিছু জিগ্যেস করার আগেই লোকগুলোর মধ্যে একজন তাকে প্রশ্ন করল, 'বাবু কোথা থেকে আসছেন?'

রমানাথ জবাব দিলেন, 'কলকাতা।'

'কলকাতা থেকে এতদূরে মাছ ধরতে এসেছেন!' বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল লোকটার চোখে।

তা কলকাতা থেকে এ-জায়গাটা বেশ দূর বটে। প্রথমে ট্রেন, তারপর বাস, কলকাতা থেকে বর্ধমানের এই গ্রামে আসতে রমাপদর প্রায় সাত ঘণ্টা মতো সময় লেগে গেল। কিন্তু কী করবেন রামপদ! নেশা বড় বালাই। মাছ ধরার নেশা। এই নেশার তাগিদেই সব কাজ ফেলে তিনি কলকাতা থেকে ছুটে যান নানা জায়গাতে। কখনও রানাঘাটের পালচৌধুরীদের পুকুরে, কখনও কাঁচরাপাড়ার রেলের জলাশয়ে আবার কখনও বা বারাসাতের নীলকুঠির বিলে। মাছ ধরার নেশাটা বড় প্রবল রমাপদর।

তিনি লোকটার কথা শুনে হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, কলকাতা। কালিদহটা কোনদিকে?'

লোকটা একটা গ্রামের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, 'এই খাল ধরে চলে যান। মাঠের শেষ মাথায় ওই যে দূরে একটা বাড়ি নজরে আসছে, ওটাই কালিকাপুর জমিদারবাড়ি। ওর পেছনেই কালিদহ। ওদিকে যাবার একটা পাকা রাস্তা আছে ঠিকই। কিন্তু সে-পথ ঘুরতে গেলে অনেক ঘুরতে হবে।

পাশ থেকে একজন প্রশ্ন করল, 'আপনি কি কালিদহর মহাশোল ধরতে এসেছেন?'

তার মানে ওই মহাশোলের খবরটা এখানকার অনেকেরই জানা। রমানাথ বললেন, 'হ্যাঁ, ওই মহাশোল ধরতেই এসেছি। খুব বড় মাছ বুঝি?'

একজন বলল, 'হ্যাঁ, খুব বড় মাছ! যখন সে ঘাই দেয়, খেলা করে তখন তোলপাড় হয় দহর জল। ও-দহে অনেকে ডুবে মরেছে বলে লোকজন খুব একটা যায় না ওদিকে। তবে আমি একবার একটা লাশ তুলতে গেছিলাম

BanglaBook.org

ওখানে। কিন্তু ওই মহাশোলকে তো আপনি ধরতে পারবেন না বাবু।'

এগোতে গিয়েও কথাটা শুনে থমকে দাঁড়ালেন রমাপদ। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'কেন? ধরতে পারব না কেন?'

লোকটা জবাব দেওয়ার আগে কেমন যেন একটু ইতস্তত করল। যেন রমাপদ মাছটা ধরতে পারবে না এ কথাটা বলে সে ঠিক করেনি, এ কথাটা বুঝতে পেরেছে সে। রমাপদ আবার জানতে চাইল, 'কেন, পারব না কেন?'

লোকটা এবার জবাব দিল, 'ও মাছ শুধু রাজাবাবুই ধরতে পারেন। আর কেউ পারে না। বারো বছর পর পরই মাছ একবার ধরা হয়। তার পরদিন আবার নতুন মাছ ছাড়া হয়। সেটা আবার ধরা হয় বারো বছর পর। এমনই হয়ে আসছে রাজাবাবুর ঠাকুরদার আমল থেকে। ও মাছের টোপ রাজাবাবুরা ছাড়া আর কেউ জানে না।'

কথাগুলো বলে লোকগুলো আর দাঁড়াল না। তারা আবার খেতের জলকাদায় নেমে গেল। আর রমাপদও এগোলেন তাদের দেখানো আলপথ বেয়ে। লোকগুলোর মুখে মাছ ধরতে না-পারার কথাটা শুনে প্রথমে কয়েক মুহূর্তের জন্য মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল রমাপদর। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে লাগলেন এমন রটনা তো গ্রামগঞ্জে কতই থাকে। ঘটনাচক্রে হয়তো রাজাবাবুরাই মাছটা বেশ কয়েকবার ধরেছেন। তার অর্থ এই নয় যে আর কেউ কোনওদিন ধরতে পারবে না। সেই রসিকবিলের বিশ সের ওজনের রুইমাছটার কথাই ধরা যাক না কেন। লোকে তো বলত, সে আসলে মাছ নয়, মৎস্যকন্যা। তাকে কোনওদিন ধরা যাবে না। কিন্তু তাকেই তো রসগোল্লার রসে চোবানো পাঁউরুটির মণ্ডর সঙ্গে বাঁকুড়া থেকে আনা বিশেষ ধরনের লাল পিঁপড়ের ডিম দিয়ে ছিপে গেঁথেছিলেন রমানাথ।

অথবা গোচারণের পুকুরের সেই বিশাল কাতলাটা? লোকে বলত তার ঠোঁট নাকি এত পিছল যে বাঁকানো বঁড়শিও পিছলে যায়! শেষপর্যন্ত বিশেষভাবে তৈরি খুবই শক্ত অথচ পুঁটি মাছ ধরার মতো ছোট্ট বঁড়শি দিয়েই তাকে পাড়ে তুলেছিলেন রমানাথ। পরে দেখা গিয়েছিল যে প্রকৃতির কোনও অদ্ভুত খেয়ালে তার মুখের হাঁ-টা এত ছোট ছিল যে বড় বঁড়শি গিলতে পারত না সে।

এসব কথা ভাবতেই মনে বল ফিরে পেলেন রমানাথ। পাকা মাছশিকারি তিনি। মাছটা ঠিক কেমন সে কথাই ভাবতে লাগলেন তিনি।

আর তার সঙ্গে ভাবতে লাগলেন খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনটার কথা।

BanglaBook.org

ওই বিজ্ঞাপনটা না দেখলে এতদূর ছুটে আসতেন না তিনি। খবরের কাগজে ছোট ছোট অনেক বিজ্ঞাপন ছাপা হয় যেগুলো সাধারণত চোখ এড়িয়ে যায় সাধারণ মানুষের। কিন্তু সেসব বিজ্ঞাপনের খোঁজ রাখে সন্ধানীরা। সাধারণত বিলে বা পুকুরে মাছ ধরার জন্য টিকিট লাগে। সাধারণত পুকুরের মাছ বুঝে একশো থেকে পাঁচশো টাকারও টিকিট করা হয়। ধরা মাছের আকৃতি আর ওজন বুঝে হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত পুরস্কার মূল্য দেওয়া হয় মাছ শিকারিদের। তার সঙ্গে মাছ ধরা তো থাকবেই।

এমন টুকটাক মাছ ধরার বিজ্ঞাপন মাঝে মাঝে থাকে কাগজে। কিন্তু এ বিজ্ঞাপনটা আকৃতিতে তেমনই ছোট হলেও টিকিটের মূল্য আর পুরস্কারের মূল্য বিচারে এত বড় বিজ্ঞাপন এর আগে রমানাথ দেখেননি। টিকিট মূল্য দশ হাজার টাকা আর পুরস্কারমূল্য এক লাখ টাকা! ভাবা যায়? হয়তো উটকো লোকদের এ প্রতিযোগিতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেই টিকিটের দাম এত বেশি ধার্য করা হয়েছে। আর সেজন্য পুরস্কারমূল্যটাও বেড়েছে।

মাছটাকে ধরতে পারলে কেল্লা ফতে। এর আগে বেশ কিছু জায়গাতে বড় বড় শোল মাছ ধরেছেন রমানাথ। ও-মাছ কী টোপ গেলে না-গেলে, তা বিলক্ষণ জানেন মাছ শিকারি রমানাথ। সেইমতো তিনি টোপগুলো সঙ্গেও এনেছেন। তার ব্যাগের মধ্যে কাচের জারে রাখা আছে সেগুলো।

রমানাথ আলপথ ভেঙে এক সময় পৌঁছে গেলেন বাড়িটার সামনে। অন্যদিক থেকে একটা পাকা রাস্তা ঘুরপথে এসে থেমেছে বাড়িটার সামনে। বিশাল জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। তবে তার চেহারা দেখে মনে হয় বাড়িটার বয়স দু-তিনশো বছর হবে। তার একটা অংশ ভেঙে পড়েছে, বাকি অংশ এখনও দাঁড়িয়ে থাকলেও দেওয়াল-থামের গা থেকে পলেস্তারা খসে পড়েছে। তবে দোতলা বাড়িটার কলেবর দেখলে এখনও বোঝা যায় যে, বাড়িটা যাঁরা বানিয়েছিলেন তাঁরা যথেষ্ট বিত্তশালী ছিলেন। হয়তো বা এ-তল্লাটের জমিদার ভূস্বামী গোছের কেউ হবেন। যে কারণে তাদের বর্তমান উত্তরসূরীদের এখনও 'রাজাবাবু' বলে স্থানীয় মানুষরা। বাড়িটার পিছনে গাছগাছালির আড়ালে একটা জলাশয়ও যেন চোখে পড়ল রমানাথের।

বাড়িটার সামনের ফাঁকা জমিতে বেশ কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। দু-একটা গাড়ির মাথায় হুইল-ছিপ ইত্যাদি বাঁধা। কয়েকজন লোক ইতস্ততভাবে বাড়িটার বাইরে ঘোরাফেরা করছে, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। তাদের ভাবভঙ্গি, পোশাক দেখে ঠিক স্থানীয় লোক বলে মনে হয় না। রমানাথ বুঝতে পারলেন,

BanglaBook.org

এঁরাও তাঁর মতো মাছ ধরতে এসেছেন। কোথায় টিকিট দেওয়া হচ্ছে সে কথাটা তাঁদেরই একজনকে জিগ্যেস করতে আঙুল তুলে তিনি বাড়িটার একটা অংশ দেখিয়ে দিলেন। রমানাথ এগোলেন সেদিকে।

২

ঘরটা সম্ভবত কাছারি ঘর ছিল। কর্মচারীদের বসার জন্য উঁচু গদি-আঁটা জায়গা আছে। সেখানে বসে আছেন দুজন লোক। কয়েকজন মাছ শিকারীর থেকে টাকা বুঝে নিয়ে টিকিট করাচ্ছে তারা। ছাতা বন্ধ করে ছিপটাকে দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লেন রমানাথ। একটা জিনিস তিনি বুঝতে পারলেন যে বাইরে যারা রয়েছে বা টিকিটের লাইনে যারা রয়েছেন তারা কেউ গ্রামের মানুষ নয়। সবাই বাইরের লোক।

গ্রামের লোক টিকিট কেনার জন্য এত টাকা পাবে কোথায়? আর তার ওপর যখন তাদের বিশ্বাস যে রাজাবাবু ছাড়া কেউ ওই মহাশোল ধরতে পারবেন না। তখন কারও কাছে টাকা যদিও বা থেকেও থাকে, তা নষ্ট করে লাভ কী?

সামনের দু-তিনজনের টিকিট কাটা শেষ হলে রমানাথ লোকদুটোর সামনে এসে পকেট থেকে টাকা বার করলেন। যে টাকা নিচ্ছিল সে বলল, 'শর্তগুলো জানেন তো? একদিনে একবেলার জন্যই এ টিকিট। আগামীকাল বেলা বারোটা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত। তার মধ্যেই যদি মাছটা ধরা হয়ে যায় তো তবে আর বসারই দরকার হবে না। জলের ধারে বসার মাচার জন্য লটারি হবে একটু পরে। কুড়ি জনের নাম নেওয়া হবে ঠিক হয়েছিল আগে আসার ভিত্তিতে। আপনিই কুড়ি নম্বর লোক। লটারিতে বসার যে জায়গা পাবেন সেখানেই বসতে হবে কিন্তু।'

রমানাথ শুনে টাকাটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, টিকিটটা দিন।'

টাকা নিয়ে টিকিট আর রসিদ কাটতে কাটতে লোকটা বলল, 'দূর দূর থেকে আপনারা এসেছেন। কাছাকাছি কোনও হোটেল নেই। তাই এ-বাড়িতেই আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন রাজাবাবু। টিকিট পিছু একটা ঘর বরাদ্দ। একজন সঙ্গী নিয়ে আপনি সেখানে থাকতে পারেন। টিকিটের নম্বর-ই ঘরের

BanglaBook.org

নম্বর। দরজার বাইরে কাগজ সাঁটা আছে।'

এ কথা বলার পর লোকটা একটু হেসে বলল, 'আপনাদের জন্য একটা খুশির খবর আছে। কাল রাজাবাবুর ঠাকুর্দা কালীকৃষ্ণর জন্মদিন। যিনি এই জমিদারির পত্তন করেছিলেন। রাজাবাবুও কাল আপনাদের সঙ্গে মাছ ধরতে বসবেন। তিনি ঠিক করেছেন যে, তিনি ছাড়া আপনাদের মধ্যে কেউ যদি মাছটা ধরতে পারেন তবে তাকে পুরস্কার তো দেওয়া হবেই, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেককে টিকিটের টাকাও ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কাজেই মাছটা আপনি না-ধরতে পারলেও টিকিটের টাকা ফেরত পাবেন।'

তার কথা শুনে রমানাথ মনে মনে একবার ভাবলেন, 'তবে কি রাজাবাবু এবারও নিশ্চিত যে, মাছটা তিনি এবারও নিজেই ধরবেন?'

ঠিক এই মুহূর্তে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, বিপিন ক'জন হল?'

ওপর থেকে, সম্ভবত দোতলা থেকে একটা সিঁড়ি নেমে এসেছে ঘরে। সেই সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গাতে এসে দাঁড়িয়েছেন একজন গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায় প্রৌঢ় ব্যক্তি। তাঁর পরনে ধুতি আর পিরান, পায়ে শুঁড়তোলা সাদা চটি, বৃষস্কন্ধ লোকটার গলা থেকে ঝুলছে মোটা সোনার হার। হাতের ঘড়িটাও সম্ভবত সোনার-ই মনে হয়। তাঁকে দেখেই যে লোক দুজন টাকা নিচ্ছিল তারা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই কুড়ি জন হল রাজাবাবু।'

এই তাহলে রাজাবাবু! রমানাথসহ ঘরের আরও অন্যরা তাকাল তাঁর দিকে।

রাজাবাবু জবাব শুনে বললেন, 'আর একজনকেও টিকিট দেবে না। খেয়াল রেখো কোনও উটকো লোক যেন বাড়িতে না-ঢোকে। আর ডাক্তার এলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে ওপরে পাঠিয়ে দাও।'

আর একজন কর্মচারী বলল, 'আচ্ছা হুজুর। আর বিপিন আপনার হুইল-ছিপ সব ঠিক করে রেখেছে।'

রাজাবাবু একটা শব্দ করলেন, 'হুম্!' তারপর ঘরে উপস্থিত অন্য লোকগুলোর দিকে যেন একটু তাচ্ছিল্য ভরে তাকিয়ে আবার ওপর দিকে মিলিয়ে গেলেন। রমানাথ তাঁকে দেখে বুঝতে পারলেন যে কালের নিয়মে হয়তো এখন রাজাবাবুদের জমিদারি গেছে ঠিকই, কিন্তু এখনও তাঁদের ধমনীতে আভিজাত্যের নীল রক্ত আছে। রমানাথদের মতো সাধারণ মানুষদের এখনও এই রাজাবাবুরা খুব একটা যে ধর্তব্যের মধ্যে রাখেন না, তা তাঁর চালচলনেই বোঝা গেল।

রাজাবাবু অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর থাকার ঘর কোন দিকে জেনে নিয়ে

BanglaBook.org

দেওয়াল থেকে ছিপটা তুলে নিয়ে ঘরের উদ্দেশে এগোতে যাচ্ছিলেন রমানাথ। কিন্তু ঠিক সেই সময় ঘরে ঢুকল একজন লোক। তার এক হাতে একটা ছিপ থাকলেও তার চেহারা দেখে বেশ অবাক হলেন রমানাথ। লোকটার চোখে কালো চশমা, গেরুয়া বসন, জটাজুটধারী মুখমণ্ডল, আর এক হাতে ঝোলানো আছে কমণ্ডলু গোছের একটা পাত্র। তার মুখটা মাটি লেপা। সম্ভবত গঙ্গাজল আছে ওই পাত্রে। দেখেই বোঝা যায়, লোকটা সাধুসন্ন্যাসী গোত্রের। বেশ বয়সও হয়েছে তার। বেশ কিছু দাড়িতে পাক ধরেছে। যারা টিকিট দিচ্ছিল তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল লোকটা। তারা তাঁর দিকে তাকাতেই সন্ন্যাসী তার কাঁধের ঝোলা থেকে কাগজ মোড়ানো একটা পুরনো নোটের বান্ডিল বার করে বললেন, 'টিকিট দাও। টিকিট কিনব।'

রাজাবাবুদের লোক দুজন বেশ অবাক হয়ে গেল তার কথা শুনে। তারপর একজন বলল, 'টিকিট শেষ। আর দেওয়া যাবে না।'

আর তার পরই লোক দু'জনের মধ্যে যে বয়স্ক কর্মচারীটি বলল, 'এবার মনে পড়েছে আপনাকে। গতবারও মাছ ধরার সময় আপনি এসেছিলেন না?'

সন্ন্যাসী বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। চিনতে পেরেছ? বারো বছর আগে। সেই যে সেবার, মাছ ধরার পরের দিন-ই একটা বাচ্চা জলে ডুবে মারা গেছিল!'

রাজাবাবুর বয়স্ক কর্মচারী বলল, 'তখন আপনি আর একটু জোয়ান ছিলেন বলে প্রথমে আপনাকে চিনতে পারিনি।'

তার কথা শুনে সন্ন্যাসী বললেন, 'দেখো না ভাই, একটু চেষ্টা করে। কতদূর থেকে ছুটে এলাম! বারো বছর ধরে ভিক্ষা করে টিকিটের টাকা জমালাম! শেষে ফিরে যাব?'

রাজাবাবুর লোকটা এবার একটু কঠোরভাবে বলল, 'না, আর কিছু করার নেই।'

সন্ন্যাসীর মুখে বিমর্ষ ভাব ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'তবে আর কিছুই করার নেই। কিন্তু আজকের রাতটা কি এখানে কাটানো যাবে? বাইরে দুর্যোগ নামতে চলেছে। এখন আমি কোথায় যাই?'

সন্ন্যাসীর দুরবস্থা দেখে সম্ভবত মায়া হল রাজাবাবুর লোকটার মনে। সে বলল, 'টিকিট ছাড়া বাইরের লোকজনের থাকার হুকুম নেই। এক-এক ঘরে দুজন লোক। কাউকে বলে দেখুন যারা টিকিটি কেটেছে, যদি কারও ঘরে থাকতে পারেন! রাজাবাবুকে বলব যে আপনি তার সঙ্গী।'

BanglaBook.org

কথাটা শুনে ফ্যাল ফ্যাল করে সন্ন্যাসী তাকালেন ঘরের অন্যদের দিকে। রমাপদ ছাড়া অন্যরা নিশ্চুপ। কারণ অন্য সকলেই এত দূর এসেছে বলে সঙ্গী নিয়ে এসেছে। রমাপদর কিন্তু বেশ মায়া হল লোকটার কথা শুনে। সাধু সন্ন্যাসীর ওপর তেমন আর বিশ্বাস না থাকলেও লোকটা যে তার ভিক্ষার টাকা জমিয়ে মাছ ধরার নেশায় এতদূর ছুটে এসেছে, এ ব্যাপারটা আকৃষ্ট করল তাঁকে।

রমাপদ নিজেও অনেক কষ্ট করে জোগাড় করেছেন টাকাটা। এ নেশার টানটা তিনি বোঝেন। একটু ভেবে নিয়ে শেষে তিনি বলেই ফেললেন, 'একটা রাতের ব্যাপার তো? ঠিক আছে, আমার কোনও সঙ্গী নেই। আপনি রাতটা আমার সঙ্গে কাটাতে পারেন।'

কথাটা শুনেই যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠল কালো চশমা-পরা সন্ন্যাসীর মুখটা। তিনি বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাকে আমি বিরক্ত করব না।' এই বলে সন্ন্যাসী ঘরের এককোণে গিয়ে দাঁড়ালেন।

কুড়িজন লোক হয়ে গেছে। অতএব এবার লটারি করতে হবে বসার জায়গার জন্য। রাজাবাবুর একজন কর্মচারী গিয়ে বাইরে থেকে টিকিটধারীদের ডেকে আনলেন লটারির জন্য। লটারি হল। রমানাথের ভাগ্যে যে-নম্বরটা উঠল তাতে মনটা একটু খুঁতখুঁত করে উঠল তাঁর। রমানাথের নম্বর তেরো। আনলাকি থার্টিন! রমানাথ মাছ ধরার সময় অন্য কোনও সংস্কার না মানলেও এই সংস্কারটা মানেন। কারণ, যতবার তিনি এই তেরো নম্বর টিকিট পেয়েছেন ততবার তিনি তেমন সুবিধা করতে পারেননি মাছ ধরায়। কিন্তু কী আর করা যাবে?

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে-ঘর ছাড়লেন রমানাথ। আর তাঁর পিছু পিছু সেই সন্ন্যাসীও। মাথা গোঁজার আস্তানায় যাওয়ার আগে রমানাথ সন্ন্যাসীকে বললেন, 'ঘরে যাওয়ার আগে একবার জলাশয়টা দেখে আসি। সেটা না দেখলে মন কেমন করছে। আপনার মাছ ধরার নেশা দেখে আশ্চর্য লাগছে। আপনার কী নাম? কোথা থেকে আসছেন?'

সন্ন্যাসী হেসে বললেন, 'হ্যাঁ চলুন। আগে এসেছি বলে এ জায়গা আমি চিনি। দহটা বাড়ির পিছনেই। পূর্বাশ্রমে আমার একটা নাম ছিল বটে। কিন্তু লোকে আমাকে এখন "অঘোরবাবা" বলে। হরিদ্বারের কাছাকাছি এক জায়গাতে গঙ্গার পাড়ে আমার ডেরা।'

রমাপদ বিস্মিতভাবে বললেন, 'অতদূর থেকে মাছ ধরার নেশায় এখানে

BanglaBook.org

এসেছেন? কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'হ্যাঁ, অত দূর থেকে। তবে বিজ্ঞাপন দেখে নয়। বারো বছর পর পর নির্দিষ্ট দিনে মাছ ধরার এই আয়োজন হয়। তারিখটা মনে ছিল তাই এসেছিলাম। তাড়াতাড়ি পা চালান। আকাশের যা অবস্থা তাতে কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে।'

সত্যিই কালো মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ। অঘোর সন্ন্যাসীকে অনুসরণ করলেন রমাপদ। বাড়িটার পিছন দিকে একটু এগিয়ে তিনি পৌঁছে গেলেন কালিদহে।

কালিদহ বেশ বড় দিঘি। অন্তত বিঘা সাত-আটেক তো হবেই। তার পাড়ে বড় বড় প্রাচীন গাছ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। কালিদহ সত্যিই যেন কালিদহ, জলের রং এমনিতে কালো। তার ওপর আবার মেঘের ছায়া পড়ে তাকে আরও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ করে তুলেছে। কালিদহের পাড় ঘেঁষে মোথা ঘাস আর ঘাসের জঙ্গল। শ্যাওলাপূর্ণ জলরাশিতে ইতিমধ্যে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে। এই পরিবেশে মাছেরা জলতলের ওপরে উঠে খেলা করে, ঘাই দেয়। কিন্তু জলের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেও বৃষ্টির ফোঁটা ছাড়া অন্য কোনও তরঙ্গ রমাপদর চোখে ধরা দিল না। অর্থাৎ দহর জলে অন্য কোনও মাছ নেই। আর সেই মহাশোল হয়তো লুকিয়ে আছে এই শ্যাওলা ঢাকা কালো দিঘির গভীরে কোথাও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। রমাপদ এবার ফিরে চললেন জমিদারবাড়িতে ফেরার জন্য। বাড়িটাতে তাঁরা ঢুকতে যাচ্ছেন ঠিক সেইসময় একটা গাড়ি এসে থামল সেখানে। গাড়ি থেকে ছাতা মাথায় নামল একজন লোক। তার গলায় স্টেথোস্কোপ। হাতে ধরা আছে একটা বাক্সমতো জিনিস। বয়স্ক সেই ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির ভিতর দ্রুত ঢুকে গেলেন। তাকে দেখে রমানাথ সন্ন্যাসীকে বললেন, 'ভদ্রলোক মনে হয় ডাক্তার। রাজাবাবু তাঁর কর্মচারীদের ডাক্তার আসবে বলেছিলেন।'

সন্ন্যাসী মৃদু হেসে বললেন, 'আগেরবার এসে আমি লোকটাকে দেখেছি। ওরা রাজাবাবুর পরিবারের বংশানুক্রমিক চিকিৎসক। অর্থাৎ ডাক্তারের বাপ-ঠাকুর্দাও রাজাবাবুর বাপ-ঠাকুর্দার চিকিৎসা করেছেন।

বাড়ির ভিতর ঢুকে সন্ন্যাসীকে নিয়ে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে পড়লেন। ঘরে ঢুকেই সন্ন্যাসী মাটিতে একটা আসন বিছিয়ে সান্ধ্য উপাসনায় বসার প্রস্তুতি শুরু করলেন।

BanglaBook.org

রমানাথের হঠাৎ খেয়াল হল তাঁর টোপের কথা। সেগুলো মরে যায়নি তো? সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার ব্যাগ থেকে বার করলেন টোপের পাত্রটা। বেশ বড় জলপূর্ণ একটা কাচের বয়াম। তার মাথায় টিনের ঢাকনাতে ছোট ছোট ছিদ্র করা। সেই জলের মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে আঙুলের মতো দৈর্ঘ্যের বেশ কয়েকটা সরপুঁটি। বসিরহাটের এক মিষ্টি জলের ভেরি থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন এগুলো। শোল মাছের অব্যর্থ টোপ। রমানাথবাবু সেগুলো টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেসময় সন্ন্যাসীর নজর পড়ল তার ওপর। সন্ন্যাসী বলে উঠলেন, 'ও টোপে কাজ হবে না আপনার।'

রমানাথবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'কাজ হবে না কেন? এ-টোপ দিয়ে অনেক বড় বড় শোল ধরেছি আমি।'

সন্ন্যাসী এবার যেন বেশ দৃঢ়ভাবেই বললেন, 'আমি জানি হবে না। ও টোপ মহাশোল কাল গিলবে না।' এ কথা বলে ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন তিনি।

বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। অন্ধকারও নেমে গেছে। রমানাথ যতক্ষণ জেগে রইলেন ততক্ষণ ধ্যানস্থভাবেই দেখলেন সন্ন্যাসীকে। বহু দূর থেকে এখানে ছুটে এসেছেন রমানাথ। শরীরটা বেশ ক্লান্ত লাগছে। কাজেই তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে বাইরে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

এক সময় জমিদারবাড়ির সব আলো নিবে গেল। নিস্তব্ধ হয়ে গেল সবকিছু। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ধ্যান ভাঙল সন্ন্যাসীর। বাতি নিবিয়ে তিনি ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন। শেষ রাতে আধো ঘুমে রমাপদ যেন একবার দেখলেন বাইরে থেকে সন্ন্যাসী ঘরে ঢুকলেন, তারপর আবার অন্ধকার থাকতেই বাইরে বেরিয়ে গেলেন। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে রমানাথ দেখলেন সন্ন্যাসী বা তার জিনিসপত্র কিছুই নেই ঘরে। মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হলেন রমানাথ। লোকটা যাওয়ার আগে একবার বলে গেল না! সাধু সন্ন্যাসীদের মতিগতিই বোঝা ভার।

৩

শেষ রাতে বৃষ্টি থেমেছিল ঠিকই। কিন্তু এদিনও সকাল থেকে আকাশের মুখ ভার। বর্ষাকাল যেমন হয়, যে-কোনও সময় বৃষ্টি-হতে পারে। সারা সকাল নিজের ঘরেই রমানাথ কাটিয়ে দিলেন। সকাল থেকেই বেশ উত্তেজনা

অনুভব করছেন তিনি। বারবার তাই তিনি ছিপ পরীক্ষা করলেন, হুইল ঘুরিয়ে দেখে নিলেন সেটা ঠিক কাজ করছে কি না, বঁড়শি টিপে টিপে পরীক্ষা করলেন সেটা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না। এসব করে শেষপর্যন্ত মহাশোল ধরার জন্য বেরিয়ে পড়লেন তিনি। অন্য প্রতিযোগীরাও তখন তাদের ছিপ, টোপ ইত্যাদি নিয়ে এগোচ্ছেন সেদিকে। তাদের পায়ে পায়ে রমানাথও কালিদহের পাড়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

জলাশয়ের চারপাশে ছোট ছোট বাঁশের মাচা বানানো হয়েছে বসার জন্য। একজন লোক টিকিট মিলিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন কার বসার জায়গা কোনটা। রমানাথকেও তাঁর মাচাটা দেখিয়ে দিল একজন। জায়গাটা বেশ পছন্দ হল রমানাথের। তার পিছনেই একটা গাছ। তার ডালপালা মাথার ওপর দিয়ে চাঁদোয়ার মতো জলের ওপর আকাশটা আড়াল করে রেখেছে।

বারোটা বাজতে খুব বেশি দেরি নেই। রমানাথ গিয়ে বসলেন সেই মাচায়। আশেপাশের মাচাতেও অন্য লোকজন বসে মাছ ধরার সরঞ্জাম সাজিয়ে রাখছে মাচাতে। রমানাথ যেখানে বসেছেন তাঁর কয়েকটা মাচার তফাতে একটা মাচার মাথায় বেশ বড় একটা রঙিন ছাতা টাঙানো। রমানাথ বুঝতে পারলেন ওটাই রাজাবাবুর মাচা। সব লোকজন মাচায় বসার পর যখন বারোটা প্রায় বাজতে চলেছে তখন এসে উপস্থিত হলেন রাজাবাবু। দুজন লোক তাঁর সঙ্গে। একজন তাঁর মাথায় ছাতা ধরে। আর অন্যজনের হাতে রাজাবাবুর ছিপ আর একটা বাক্স। সেই বাক্সটা দেখে চিনতে পারলেন রমানাথ। এই বাক্সটাই গতকাল ধরা ছিল ডাক্তারের হাতে। এ ধরনের বাক্স আগে দেখেছেন রমানাথ। এই বাক্সগুলোর মধ্যে সাধারণত বরফ দিয়ে লেমোনেড, আইসক্রিম ইত্যাদি রাখা হয়।

কারও প্রতি কোনও দৃষ্টিপাত না করে রাজাবাবু রমানাথদের সামনে দিয়ে গিয়ে তাঁর মাচায় উঠে বসলেন। সঙ্গী দু'জন তাঁর মাচায় ছিপ আর বাক্স নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

বারোটা বাজল এখনই। রমানাথ প্রস্তুত হলেন। ঠিক বারোটায় ঢং করে ঘণ্টার শব্দ করল একজন। চারপাশ থেকে ছপাৎ ছপাৎ করে জলে ছিপ ফেলার শব্দ শুরু হল। রমানাথ শিশি থেকে তার টোপ বার করলেন। জ্যান্ত সরপুঁটির লেজের দিকে নিপুণ হাতে এমন ভাবে বঁড়শি গাঁথলেন যে, জলে বঁড়শি গাঁথা অবস্থায় মাছটা মরবে না। খেলে বেড়াবে। সেটাই আকৃষ্ট করবে মহাশোলকে। তারপর সে টোপ গিলবে।

BanglaBook.org

বঁড়শিটা গেঁথেই জলের দিকে টোপ ছুড়লেন তিনি। ছপাৎ করে শব্দ হল। জলে পড়ে মাছটা একবার লাফাল। তারপর জলের তলায় হারিয়ে গেল। ফাতনাটা একটু নড়েচড়ে স্থির হয়ে গেল। ছিপটা শক্ত হাতে ধরে বসলেন রমানাথ।

এরপর রমানাথ তাকালেন রাজাবাবুর দিকে। তিনি সেই লেমনেডের বাক্সটা খুলে কী যেন একটা বার করলেন। তার মানে সেটা তাঁর টোপের বাক্স। কী টোপ সেটা অত দূর থেকে বুঝতে পারছেন না রমানাথ। তিনি তাঁর টোপটা বার করে প্রথমে যেন সেটা বঁড়শিতে গাঁথকে গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি সেই টোপটা নেড়েচেড়ে দেখে অনেকটা ক্রুদ্ধভাবেই যেন জলে ফেলে দিলেন। তারপর হাত নেড়ে সম্ভবত তাঁর লোকজনকে ডাকলেন।

মিনিটখানেকের মধ্যেই একজন উপস্থিত হল তাঁর কাছে। রাজাবাবু তাকে কী যেন বললেন। লোকটা সঙ্গে-সঙ্গে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল রাজবাড়ির দিকে। রমানাথের মনে হল যে, রাজাবাবু হয়তো কোনও সরঞ্জাম ফেলে এসেছেন। আর সেটাই আনতে ছুটল লোকটা। ছিপ না ফেলে রাজাবাবু তাকিয়ে রইলেন জলের দিকে। রমানাথ মন দিলেন নিজের ফাতনার দিকে!

সময় এগিয়ে চলল। নিস্তব্ধ দহ। ছিপ ফেলে নিশ্চুপভাবে বসে আছে সবাই। একমাত্র রাজাবাবু ছাড়া। মাথার ওপর মেঘ ঘনাতে শুরু করেছে। টিপটিপ বৃষ্টিও শুরু হল একসময়। ছাতা খুললেন রমানাথ। বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে দহর কালো জলে। ঠিক এই সময় হঠাৎ সেই মহাশোল যেন মনের আনন্দে নেচে উঠে ঘাই দিল জলে। এত বড় ঘাই যে জলাশয়ের কেন্দ্র থেকে সেই জলতরঙ্গ এসে লাগল পাড়গুলোতে! তা দেখে রমানাথ বুঝতে পারলেন মাছটা সত্যি মহাশোল! মহামৎস্য! দৈর্ঘ্যে অন্তত চার হাত হবে, আর ওজনও সেই অনুপাতে! বার কয়েক ঘা দিয়ে সবাইকে তার উপস্থিতি জানিয়ে আবার জলের নীচে হারিয়ে গেল মৎস্যরাজ।

সময় এগিয়ে চলল। আরও এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা। আর হদিশ মিলল না সেই মৎস্য অবতারের। বৃষ্টি ক্রমশ আরও বাড়ছে। আরও কালো হয়ে আসছে আকাশ। যেন এখনই সন্ধ্যা নামতে চলেছে। কিন্তু কারোর ফাতনাই একবারের জন্যও কেঁপে ওঠেনি।

যারা মাছ ধরে তাদের মাছের প্রত্যাশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা নতুন কিছু নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সময় সীমিত। তার ওপর আবার একটা নির্দিষ্ট

BanglaBook.org

মাছ ধরার প্রত্যাশায় দুর্যোগ মাথায় নিয়ে বসে আছে সকলে। তাই সবাই একটু উশখুশ করতে লাগল। জলে ছিপ না ফেললেও রাজাবাবুর উত্তেজনাই সব থেকে বেশি মনে হল রমানাথের। তিনি অস্থিরভাবে বার বার পিছনে তাকাচ্ছেন। অবশ্য তার কারণ বোধগম্য হল না রমাপদর।

এক সময় রমাপদরও মনে হতে লাগল যে, ওই মহাশোল কি সত্যিই কারও টোপ গিলবে না? মাঝে মাঝে এমন হয়। বড় মাছ একবার ঘাই দিয়ে নীচে নেমে স্থির হয়ে যায়। তখন আর সে টোপ গেলে না।

সময় এগিয়ে চলল আরও। আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কালো হয়ে উঠল দহর জল। রমানাথ কেমন যেন হতাশ হয়ে পড়তে লাগলেন। আর তো ঘণ্টাখানেক সময় হাতে! এসব ভাবতে ভাবতেই একটা বড় মেঘ ঢেকে দিল আকাশটাকে। সত্যিই এবার রাতের অন্ধকার নেমে এল। পঁচিশ-তিরিশ হাত দূরেরও কিছু দেখা যাচ্ছে না। হাল ছেড়ে দিয়ে ছিপ তুলে ফেললেন রমানাথের পাশের মাচার ভদ্রলোক। রমানাথ কী করবেন ভাবছেন ঠিক এমন সময় পিছন থেকে একটা চাপা কণ্ঠস্বর, 'ও টোপে হবে না। টোপ দিচ্ছি, বঁড়শিতে নতুন টোপ গাঁথুন।'

রমানাথ চমকে উঠে পিছনে ফিরে দেখলেন, আধো-অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন সাধু। তাঁর হাতে-ধরা সেই কমণ্ডলু ধরনের পাত্রটা দেখিয়ে তিনি বললেন, 'এর মধ্যে টোপ আছে। মহাশোলের অব্যর্থ টোপ।'

রমানাথ অবাক হয়ে গেলেন তাঁর কথা শুনে। তিনি বললেন, 'কীসের টোপ?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'পরে জানতে পারবেন। ছিপটা তুলে বঁড়শিটা এদিকে ফেলুন। টোপ গাঁথার পর জলে সে টোপ ফেলুন। দেরি করবেন না। কেউ এলে আমাকে দেখে ফেলতে পারে। তা ছাড়া রাজাবাবু টোপ আনতে লোক পাঠিয়েছেন। তারা এসে গেলে রাজাবাবু ঠিক সেই টোপ দিয়ে মাছ গাঁথবেন।'

রমানাথ তার কথা শুনে কী করবেন তা বুঝতে না পেরে ইতস্তত করতে লাগলেন।

সন্ন্যাসী এবার বললেন, 'বিশ্বাস করুন আমাকে। এ-টোপ মহাশোল গিলবেই। জলের নীচে এ টোপের আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। তীর বরাবর জলের নীচে পাক খাচ্ছে তার এই মহার্ঘ্য খাদ্যের আশায়। সময় নষ্ট করবেন না, ছিপ ওঠান, ছিপ ওঠান...।'

BanglaBook.org

সন্ন্যাসীর কথার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা ধীরে ধীরে প্রভাবিত করে ফেলল রমানাথকে। এক সময় তিনি ছিপ তুলে সুতো সমেতে বঁড়শিটা ছুড়ে দিলেন পিছন দিকে। ছিপটা অবশ্য তাঁর হাতেই ধরা রইল। তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। অন্ধকারে ভালো করে কিছু দেখা যাচ্ছে না। সন্ন্যাসী তার কমণ্ডলু থেকে কী যেন একটা জিনিস বার করে দ্রুত গাঁথলেন বঁড়শিতে। তারপর বললেন, 'টোপটা এবার হাতে না ধরে ছিপ ঘুরিয়ে জলে ফেলুন।'

সন্ন্যাসীর নির্দেশমতো সে-কাজটাই করলেন রমানাথ। টুপ করে শব্দ করে ফাতনা সমেত বঁড়শিসমেত জলে ডুবে গেল টোপটা। সন্ন্যাসী বললেন, 'এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে মহাকালীর একটা পুরোনো মন্দির আছে। লোককে জিগ্যেস করলে দেখিয়ে দেবে জায়গাটা। আমার টাকার দরকার নেই। তবে সম্ভব হলে আজ রাতে মাছটা সেখানে নিয়ে যাবেন। আমি সেখানে রাত্রিবাস করব।' এই বলে রমানাথকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেলেন তিনি।

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই মেঘ কেটে আলো ফুটতে শুরু করল। বৃষ্টিটাও একটু কমে এল। ফাতনার দিকে তাকিয়ে সন্ন্যাসীর কথা ভাবতে লাগলেন রমানাথ। অদ্ভুত ব্যাপার! কী টোপ দিয়ে গেলেন তিনি?

ফাতনার দিকেই তাকিয়েছিলেন রমানাথ। হঠাৎ তাঁর মনে হল ফাতনাটা যেন একবার একটু নড়ল! দৃষ্টি বিভ্রম নয় তো! আবারও কাঁপল ফাতনাটা। কেঁপে উঠল রমানাথের বুকও। একবার, দুবার, তিনবার! তারপরই 'ফাতনা' ডুবে গেল জলে।

ব্যাপারটা সত্যি কি না বুঝতে রমানাথের যে-কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল তার মধ্যেই সুতোয় টান পড়ল। ছিপ সামলে হুইল থেকে সুতো ছাড়তে শুরু করলেন তিনি। টোপ গিলেছে মহাশোল। গলায় বঁড়শি আটকে পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রচণ্ড তোলপাড় শুরু হল জলে। জলের ওপর লাফিয়ে উঠল বঁড়শি-বেঁধা মাছটা।

এতক্ষণে সবাই বুঝতে পারল ব্যাপারটা কী ঘটেছে। ছিপ সামলাতে সামলাতে রমানাথের চোখ পড়ল রাজাবাবুর দিকে। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে তিনি তাকিয়ে আছেন রমানাথের দিকে। আর এরপরই রমানাথ দেখল তিনি তার হাতের দামি ইংলন্ড ছিপটা প্রচণ্ড ক্রোধে হতাশায় হাঁটুর ওপর ভেঙে জলে ছুড়ে ফেলে ছুটতে শুরু করলেন রাজবাড়ির দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রমানাথ দক্ষ হাতে মাছটাকে খেলিয়ে পাড়ে তুলে ফেললেন। মাছের মুখ

BanglaBook.org

থেকে সুতোটা কেটে দিলেন তিনি। প্রায় পাঁচ হাত লম্বা মাছটার পেট না চিরলে বঁড়শি বেরোবে না।

৪

চারপাশটা বেশ অন্ধকার। পাড়াগ্রামে রাত আটটা মানে বেশ অনেক রাত। তবে বৃষ্টিটা থেমেছে। আর একটা গাড়ি ভাড়া করে এনেছেন তিনি। গাড়ি ছাড়া এতগুলো টাকা নিয়ে কলকাতার দিকে এত রাতে রওনা হতে ভরসা পাননি তিনি। তার ওপর আবার তাঁকে সন্ন্যাসীর জন্য এ-জায়গায় আসতে হত।

এদিকে আসতে আসতে সারা পথ একটাই কথা রমানাথ ভেবেছেন। কী এমন অব্যর্থ টোপ দিলেন সন্ন্যাসী যে, মাছটা ধরা পড়ল? মন্ত্রপূত কিছু? কিন্তু এ ব্যাপার আবার ঠিক বিশ্বাস করেন না রমানাথ। তবে তা কীসের টোপ? সন্ন্যাসীকে মাছটা দেখাবার আগে মাছের পেট চিরতেও পারছেন না তিনি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রমানাথের কৌতূহলটা বেড়েই চলেছে।

গাড়িটা মন্দিরের সামনে থামল। পোড়ো মন্দির। কোথাও কোনও আলো নেই বা লোকজনও নেই। আশেপাশে বসতিও নেই কোনও। বড় রাস্তার পাশে শুধু ধানখেত। ব্যাঙের ডাক ভেসে আসছে সেখান থেকে। গাড়ি থামার শব্দেই বুঝি কিছুক্ষণের মধ্যে অন্ধকার মন্দির থেকে একটা মোমবাতি হাতে বেরিয়ে এলেন একজন। সেই অঘোর সন্ন্যাসী। তাঁকে দেখে গাড়ি থেকে মাছটা নিয়ে নামলেন রমানাথ। এতবড় মাছ যে তার মাথা আর লেজের দিকে দড়ি বাঁধা থাকলেও তা মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছে। আর তেমনই ভারী।

সন্ন্যাসী তাঁকে দেখে ইশারায় মন্দিরে ভিতরে ঢুকতে বললেন। চাতালে উঠে মাছসমেত মন্দিরে প্রবেশ করলেন রমানাথ। সন্ন্যাসীকে অনুসরণ করে মন্দিরের একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা বেদির মতো জায়গাতে মাছটা নামাতে বললেন তিনি। সেই বেদির একপাশে সন্ন্যাসীর সেই কমণ্ডলু আর ঝোলাও রাখা আছে। সন্ন্যাসীর ইশারায় মাছটা সেখানেই রাখলেন রমানাথ। সন্ন্যাসী জিগ্যেস করলেন, 'রাজাবাবুর খবর কী?'

রমানাথ জবাব দিলেন, 'শুনলাম তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। তাঁর কর্মচারীদের একজন বলল যে

তার ফলে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছেন। আর কোনওদিন মাছ ধরতে বসতে পারবেন না তিনি।

তাঁর জবাব শুনে সন্ন্যাসী মাছটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তিন লক্ষ টাকার ক্ষতির ধাক্কা সামলাতে পারেননি রাজাবাবু। এমনিতেই বেহিসেবি জীবনযাত্রায় বর্তমানে ধারে জর্জরিত তিনি। ভেবেছিলেন মাছটা ধরে টিকিটের টাকায় ধার মেটাবেন। তবে পাপ কাউকে ছাড়ে না। তিন-পুরুষ ধরে ওই ডাক্তারদের সাহায্যে কত মানুষকে যে মাছ ধরার বাজিতে ঠকিয়েছেন তার হিসেব নাই। ওই ডাক্তাররাই তো টোপ আর মাছের খাবার সরবরাহ করত রাজাবাবুদের। ঈশ্বর একদিন তাদেরও নিশ্চয়ই শাস্তি দেবেন। আমার বাবার জমি-জায়গা এই মাছ ধরার বাজিতে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন রাজাবাবুর বাবা। আমার বাবা সব হারিয়ে আত্মহত্যা করলেন, মা না-খেতে পেয়ে মারা গেলেন, আর আমি শেষপর্যন্ত অনাথ হয়ে সন্ন্যাসী হলাম। তবে আমার একটা অনুরোধ আছে। টাকাপয়সা আমার চাই না। তবে মাছটা আপনি আমাকে দিয়ে দিন।'

তাঁর কথা শুনে বেশ আশ্চর্য হয়ে গেলেন রমানাথ। তিনি কী জবাব দেবেন বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলেন।

সন্ন্যাসী মাছটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাবা মারা যাওয়ার আগে তাঁর মুখে শুনেছিলাম ঘটনাটা। আমার খালি মনে হত মহাশোলের টোপটা কী এমন জিনিস যে একমাত্র রাজাবাবুরাই মাছ ধরতে পারেন? কেমন যেন জেদ চেপে গেছিল আমার মনে। যে-মাছ আমার বাবার মৃত্যুর কারণ তাকে আমাকে ধরতেই হবে। গতবার আমি তাই এলাম এখানে। ভিক্ষার টাকা জমিয়ে টিকিট কাটলেও মাছটা রাজাবাবুই ধরলেন। তবে সেবার এসে মাছ ধরতে না পারলেও রাজাবাবুর টোপ সম্বন্ধে যেন একটা আবছা ধারণা হয়েছিল আমার মনে।

সন্ন্যাসীর জীবন। ঘুরতে ঘুরতে হরিদ্বারের কাছে এক অঘোর সন্ন্যাসীদের ডেরায় উপস্থিত হলাম। তাদের ভাবনায় দীক্ষিত হলাম। সাধনার উপচার সংগ্রহের জন্য আমরা বসে থাকতাম গঙ্গার ধারে। মাথার মধ্যে কিন্তু ঘুরঘুর করত রাজাবাবুদের টোপের ব্যাপারটা। তখনই একদিন আমার চোখ খুলে গেল। বুঝতে পারলাম মহাশোলের টোপের ব্যাপারটা কী। তাই বারো বছর পর আবার ভিক্ষার টাকা জমিয়ে টোপ নিয়ে চলে এলাম। আর গতকাল রাত্রে ডাক্তারের দেওয়া টোপটা ফেলে দিয়ে রাজাবাবুর টোপের বাক্সে রেখে এলাম একই রকম দেখতে একটা জিনিস।'

BanglaBook.org

রমানাথ আরও বিস্মিতভাবে বললেন, 'ব্যাপারটা শুনলাম। টাকার অর্ধেক অংশ আমি দিতে চাই আপনাকে। মাছটাও দিতে তেমন আপত্তি নেই। তবে রাজাবাবুরা কী টোপ দিয়ে মাছ ধরতেন? আপনার দেওয়া সেই অব্যর্থ টোপটাই বা কী ছিল?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'আমি সেটাই তো আপনাকে জানতে দিতে চাই না। পাছে আপনি সেটা আবার ব্যবহার করতে শুরু করেন। বড় মাছের বিশেষত মাংসাশী মাছের এর চেয়ে প্রিয় খাদ্য নেই। ঠিক আছে। মাছটা আপনি নিয়ে যান, টোপটা আমি নিয়ে নিই। সেটা আপনার দেখার দরকার নেই।' এই বলে সন্ন্যাসী তাঁর ঝোলার ভিতর থেকে একটা ছোট ছুরি বার করে এগিয়ে গেলেন মাছটার কাছে।

দেহ দিয়ে রমানাথের দৃষ্টিকে আড়াল করে মাছের পেট চিরে বঁড়শি থেকে টোপটা খুলে নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে রমানাথের দিকে ফিরে বললেন, 'এবার মাছটা আপনি নিয়ে যেতে পারেন।'

রমানাথ সন্ন্যাসীর উদ্দেশে বললেন, 'ইচ্ছা থাকলে আপনার এখানে না এসে মাছটাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে পেট চিরে টোপটা দেখতে পারতাম আমি। তা কিন্তু করিনি। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, এ-টোপ কোনওদিন ব্যবহার করব না আমি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

সন্ন্যাসী তাঁর কালো চশমার আড়াল থেকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলেন রমানাথের দিকে। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, আমি আপনাকে বিশ্বাস করলাম।'

সন্ন্যাসী এবার ধীরে ধীরে মেলে ধরলেন তাঁর হাতটা। একটা গোল বলের মতো ছোট জিনিস। ভালো করে সেটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন রমানাথ। সন্ন্যাসীর হাতে জেগে আছে একটা 'চোখ'! অক্ষিগোলক!

রমানাথ কয়েক মুহূর্ত বাক্‌রুদ্ধ হয়ে থাকার পর প্রশ্ন করলেন, 'কীসের চোখ এটা?'

সন্ন্যাসী শান্ত স্বরে জবাব দিলেন, 'মানুষের'।

আঁতকে উঠলেন রমানাথ।

সন্ন্যাসীর ঠোঁটের কোণে আবছা হাসি ফুটে উঠল। তিনি এরপর বললেন, 'তবে এটা আমার চোখ। বাঁ-চোখের দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়েছিল। ডাক্তারকে বললাম চোখটা তুলে পাথরের চোখ বসাতে। তারপর আমার এই চোখটা কমণ্ডলুতে আরকে ভিজিয়ে টোপ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য ছুটে এলাম

BanglaBook.org

এখানে। রাজাবাবুর ডাক্তারও তাঁকে এমন একটা সত্যি চোখ মর্গ থেকে সংগ্রহ করে এনে দিয়েছিল গতকাল। সেটা ফেলে দিয়ে আমি তার জায়গায় রেখে এলাম আমার পাথরের চোখটা। জানেন তো, অঘোর সন্ন্যাসীরা নদী থেকে জলে-ভাসা লাশ সংগ্রহ করে। গতবার মাছ ধরার পরের দিন একটা বাচ্চা ছেলে দহের জলে ডুবে মারা গিয়েছিল। তার লাশ যখন তোলা হল তখন দেখেছিলাম তার চোখ দুটো নেই। আর গঙ্গার তীরে যে মৃতদেহ ভেসে আসে খেয়াল করবেন তাদের চোখ থাকে না। মাছের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য মানুষের চোখ। মহাশোলের টোপ...'

কথা বলতে বলতে চোখের চশমা খুলে ফেললেন সন্ন্যাসী। রমানাথ দেখতে পেলেন তাঁর বাঁ-চোখের কোটরে জমাট বাঁধা অন্ধকার! সন্ন্যাসী তাঁর চোখটা হাতের কমণ্ডলুর মধ্যে যত্ন করে রেখে বললেন, 'এটাকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেব। হয়তো বা কোনও মহাশোলের কাজে লাগবে।'

সন্ন্যাসীর পিছন পিছনই রমানাথও মাছটা নিয়ে মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। রমানাথ চড়ে বসলেন গাড়িতে। আর সন্ন্যাসী ভেজা বাতাসে রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন তাঁর হাতের কমণ্ডলুতে মহাশোলের টোপ নিয়ে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বিপরীত বিহার

১

'ওয়াও!'

বিস্ময়সূচক শব্দটা কানে যেতেই পিছনে ফিরে তাকাল অগ্নিভ।

সাদা চামড়ার এক বিদেশী পর্যটক বিমুগ্ধ-বিস্মিতভাবে তাকিয়ে আছে মন্দিরগাত্রের একটা প্যানেলের দিকে। তার পরনে ঘামে ভেজা টি-শার্ট, খাকি হাফ-প্যান্ট, পায়ে সাদা স্নিকার। তার পেটের কাছে ঝুলছে একটা ছোট পাউচ ব্যাগ, আর হাতে ধরা লম্বা একটা ক্যামেরা।

এখানের চারপাশের ছোট-বড় সব মন্দিরগুলোতে, মিথুন ভাস্কর্যের ছড়াছড়ি। এ মন্দিরটাও তার ব্যতিক্রম নয়। যে কারণে বহু বিদেশী পর্যটক ভারতবর্ষের এই প্রাচীন নগরী দেখতে আসে।

লোকটার দৃষ্টি অনুসরণ করে অগ্নিভ তাকাল হাজার বছরের প্রাচীন মন্দিরের দেওয়ালের গায়ে সেই প্যানেলটার দিকে। মিথুন ভাস্কর্য্য খোদিত আছে সেখানেও। পুরুষের ওপর সঙ্গম ভঙ্গীমায় নারী—'উওমেন অন দা টপ'।—বিপরীত বিহার।

প্যানেলটার দিকে তাকিয়েই মুহূর্তের মধ্যেই সে ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল অগ্নিভর। সুদেষ্ণার সঙ্গে তার বিচ্ছেদের সূত্রপাত তো সে ঘটনা থেকেই। ব্যাপারটা মনে পড়ে যেতেই চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। প্যানেলটার দিকে তাকিয়ে অগ্নিভর চোখে ভেসে উঠল সেদিনের সেই দৃশ্য—তার দেহের ওপর উদ্যত সুদেষ্ণা...

'হাই? আপনাদের দেশটা বড় অদ্ভুত তাই না?'

প্রশ্নটা শুনে চিন্তাজাল ছিন্ন হল অগ্নিভর। সেই বিদেশী লোকটা নীল চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

অগ্নিভকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে লোকটা এরপর বলল, 'আমার নাম রবার্ট। ফ্রান্স থেকে এসেছি। বলছি যে তোমাদের দেশটা বড় অদ্ভুত তাই না?'

অগ্নিভ এবার হেসে বলল, 'তোমার এমন মনে হচ্ছে কেন? এই মিথুন ভাস্কর্যগুলো দেখে?'

রবার্ট নামের পর্যটক বলল, 'হ্যাঁ, এ ভাবনার পিছনে অবশ্যই এটা একটা কারণ। আমি বেশ কিছুদিন ধরে আমার দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি তোমাদের দেশে। তাতে যতটুকু দেখেছি, বুঝেছি, যৌনতার ব্যাপারে তোমরা অনেক সংরক্ষণশীল। বিশেষত আমাদের ইউরোপীয়নদের তুলনায় তো বটেই। তোমাদের গ্রামের মহিলাদের তো এখনও কাপড়ে মাথা-মুখ ঢাকতে দেখা যায়। আর সেদেশের মন্দিরের গায়ে এমন যৌনদৃশ্য! তা-ও আবার হাজার বছরের প্রাচীন!'

অগ্নিভ হেসে বলল, 'তা বটে।'

রবার্ট এরপর জানতে চাইল, 'তুমি কি টুরিস্ট? নাকি এখানেই থাকো? মন্দিরের ভিতরে ঢুকেছ? ওখানে কি যৌন ভাস্কর্য্য আছে?' অগ্নিভ বলল, 'হ্যাঁ, ট্যুরিস্টই বলতে পারো। কলকাতা থেকে এসেছি। মন্দিরের ভিতরে ঢুকিনি। ঢুকতে যাচ্ছিলাম। তোমাকে দেখে দাঁড়ালাম?'

BanglaBook.org

রবার্ট বলল, 'তবে একসঙ্গেই চলো। তুমি এদেশের লোক। যদি আমার কিছু জানার থাকে তবে হয়তো বা তুমি তা বুঝিয়ে দিতে পারবে।' এ-মন্দির বা এসব জায়গা সম্বন্ধে তেমন কিছু জ্ঞান নেই অগ্নিভর। এখানে আসার পর সে একটা কয়েক পাতার চটি বই কিনেছিল। সে বইতে জায়গাটা সম্বন্ধে যতটুকু লেখা আছে সেটাই তার এ জায়গা সম্বন্ধে জ্ঞান। তবে লোকটার সঙ্গে থাকলে কথাবার্তা তো বলা যাবে। তার একাকীত্ব তো কিছুটা কাটবে। সে জন্য সে বলল, 'হ্যাঁ, চলো, যাওয়া যাক।'

লোকটা সেই প্যানেলটার বেশ কয়েকটা ছবি তুলল, তারপর প্রবেশ করল মন্দিরের ভিতর।

এ মন্দিরের ভেতরও চারপাশের দেওয়ালে, স্তম্ভে শুধু যৌন-ভাস্কর্যই খোদিত আছে। তবে এখানে মিথুন-ভাস্কর্যর মধ্যে যেন প্রাধান্য পেয়েছে 'উওমেন অন দ্য টপ।' একটার পর একটা ঘর, অলিন্দ সর্বত্রই খালি বিভিন্ন ভঙ্গিমার বিপরীত বিহারের দৃশ্য। একের পর এক বিপরীত বিহারে মূর্তিগুলো দেখতে দেখতে আর ছবি তুলতে তুলতে অনেকটা স্বগোতক্তির স্বরেই তাদের নামগুলো বলে যেতে লাগল রবার্ট— 'জয়স্টিক, জয়রাইড, বাকিং ব্রঙ্ক, লাভ সিট, প্যাশন পাইথন, অক্টোপাস...

অগ্নিভ বলল, 'তোমার এ নিয়ে বেশ জানা আছে দেখছি!'

রবার্ট একটা ভাস্কর্যর দিকে লেন্স তাক করে শাটার টিপে বলল, 'হ্যাঁ, এসব ভাস্কর্যর ছবি তুলতে আমার ভালো লাগে। সেজন্য একটু-আধটু পড়াশোনাও করতে হয়। তবে এখানে না এলে আমার একটা ভুল ধারণা ভাঙত না।'

'কী ধারণা?' প্রশ্ন করল অগ্নিভ।

অলিন্দ বেয়ে ক্যামেরা কাঁধের ওপর তুলে ধরে এগোতে-এগোতে রবার্ট জবাব দিল, 'এই "উওমেন অন দ্য টপ" পশ্চারটা সম্বন্ধে ইউরোপীয়নরা দাবি করে যে, এটা নাকি তাদেরই উদ্ভাবন। ইউরোপ থেকেই সঙ্গমের এই পদ্ধতি নাকি পৃথিবীর অন্য মহাদেশে ছড়িয়েছে। এখানে এসে বুঝলাম, সে ধারণা ভুল। এই মিথুন-ভঙ্গিমাও তোমাদের হাজার বছরের প্রাচীন যৌন ক্রীড়ার অঙ্গ।'

এ কথা বলার পর রবার্ট বলল, 'এই যৌন ভঙ্গিমাকে অনেকে নারীর স্বাধীনতার চূড়ান্ত রূপ হিসাবেও দেখে। মনের ইচ্ছার স্বাধীনতা, বিশেষত যৌন স্বাধীনতাই তো তার চূড়ান্ত স্বাধীনতা। এ-ভঙ্গিমাতে কিন্তু নারী সুপিরিওর হিসাবে ডমিনেট করে পুরুষকে। অর্থাৎ হাজার বছর আগে প্রাচীন ভারতবর্ষে

BanglaBook.org

যে নারীর যৌন স্বাধীনতা ছিল তার প্রমাণ এই মূর্তিগুলো। তবে তোমাদের পবিত্র মন্দিরের গায়ে এই মিথুন-ভাস্কর্য কেন, এ ব্যাপারে কিছু জানো? আমাদের দেশের ধর্মস্থানগুলোর চত্বরে রেনেসাঁ আমলের শ্বেত পাথরের নারী-পুরুষ বা প্রাচীন কিছু দেব-দেবীর নগ্ন ভাস্কর্য থাকলেও সেসব মিথুন ভাস্কর্য নয়।'

এতক্ষণ পর অগ্নিভর সেই হ্যান্ডবুকটা পড়া কাজে লাগল। সে বলল, 'দেবস্থানে এ মিথুন-ভাস্কর্য রচনার পিছনে তিনটে কারণ অনুমান করা হয়। প্রথমত, সে-সময়ের লোকদের নাকি বিশ্বাস ছিল যে, মন্দিরগাত্রে মিথুন-মূর্তি থাকলে নাকি মন্দিরে বজ্রপাত হবে না।

দ্বিতীয় মত হল, আসলে মানবজীবনের আকাঙ্ক্ষাগুলোর মধ্যে যৌন আকাঙ্ক্ষাই সবচেয়ে সত্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। যা সত্য তাই সুন্দর। একটা কথা আছে—'সত্যম শিবম সুন্দরম।' যা সত্যি, তাই সুন্দর, তা-ই শিব। এ-মন্দিরগুলো কিন্তু সেসময় শিবমন্দির-ই ছিল।

আর তৃতীয় অনুমানটা একটু দুর্বল, যুক্তির দিক থেকে। নারীসঙ্গহীন ক্রীতদাস ভাস্কররা নাকি এই মূর্তিগুলো নির্মাণ করে তাদের অতৃপ্ত যৌন বাসনা চরিতার্থ করত। কিন্তু রাজনির্দেশ ছাড়া কি ক্রীতদাস ভাস্করদের পক্ষে স্বাধীন ভাবনা নির্বাচন সম্ভব ছিল? এসব ভাস্কর্য নির্মাণের সময় জীবন্ত মডেল সামনে রাখা হত বলে অনুমান। রাজ-অনুগ্রহেই যা সরবরাহ হত। কাজেই রাজার ইচ্ছাই ছিল শেষ কথা। তাদের ইচ্ছাতেই নির্মিত হয়েছিল এসব যৌন ভাস্কর্য।'

কথা বলতে বলতে তারা দুজন প্রবেশ করল মন্দিরের পিছনদিকের একটা ঘরে।

লম্বাটে একটা ঘর। তার ঠিক মাঝখানে এক অংশের দেওয়ালের কিছুটা তফাতে পাথুরে মেঝের ওপর রয়েছে প্রাচীন পাথরের তৈরি লম্বা বেঞ্চের মতো সরু একটা বসার জায়গা। দৈর্ঘ্যে ছ'ফিট হবে। আর তার মাথার কাছে হাত-দুই ওপরে ভাতের থালার মতো আকৃতির একটা ছিদ্র বা জানলা। সেখান দিয়ে আলো ঢুকছে ভিতরে। মাথার ওপরের ছাদেও একটা চওড়া ফাটল। আলো আসছে সেখান দিয়েও।

তবে ছাদের ফাটলটা দেওয়ালের নিটোল গোলাকার ছিদ্রর মতো সে সময়ের মানুষের হাতে তৈরি করা নয়। হাজার বছর ধরে অসংখ্য ঝড়-ঝঞ্ঝায় মহাকালের নখের আঁচড়ে সৃষ্ট হয়েছে সে ফাটল। কপাটহীন সেই প্রাচীন কক্ষে প্রবেশ করে ঘরের মাঝখানে বেঞ্চের মতো লম্বাটে বেদিটার দিকে তাকানোর

BanglaBook.org

পর ঠিক উল্টোদিকের দেওয়ালে তাকিয়ে রবার্ট আবার বিস্মিতভাবে বলে উঠল, 'ওয়াও!'

অগ্নিভও তাকাল সেই দেওয়ালটার দিকে। তারপর সেই দেওয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে দেওয়ালের গায়ে খোদিত আছে সঙ্গমরত নারীপুরুষের মূর্তি। মানুষের মতোই পূর্ণ অবয়ব তাদের। বিপরীত বিহার যৌন সঙ্গম। একটা লম্বাটে বেদির ওপর শুয়ে আছে পুরুষ। তার ওপর নারী।

দুটো মূর্তিই যেন জীবন্ত। উদ্দাম উচ্ছাসে যৌন ক্রীড়ার মুহূর্তে যেন হঠাৎ-ই পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়েছে তারা দুজন। গভীর নাভি, তানপুরা নিতম্ব সেই নারীর শঙ্খের মতো উদ্ভিন্ন স্তনদুটো ছলকে উঠছে আকাশের দিকে। নারীর যোনীর মধ্যে প্রোথিত পুরুষের উন্মুখ লিঙ্গটার অন্ডকোষ সংলগ্ন কিছুটা অংশ বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে। অগ্নিভরা মুহূর্তের জন্য চোখ বুজলেই যেন জীবন্ত হয়ে উঠবে সেই মূর্তিদুটো। ছন্দবদ্ধরমন শুরু হবে। নাচতে থাকবে নারীর স্থূল নিতম্ব, পিনম্বত স্তনযুগল। ছন্দবদ্ধভাবে কখনও লিঙ্গমূল দৃশ্যমান হবে। পরক্ষণেই আবার হারিয়ে যাবে।

বেশ কিছুক্ষণ সঙ্গমমূর্তির দিকে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে রইল তারা দুজন। এত জীবন্ত এই পুরুষ ও নারীমূর্তি! তাদের জীবন্ত মনে হবার কারণ অবশ্য এরপর কিছুটা বুঝতে পারল অগ্নিভ। দেওয়ালগাত্র থেকে বেড়িয়ে আসা নারীমূর্তিটার স্তন আর নিতম্বে হাত পড়ে পড়ে মসৃণ হয়ে গেছে। চক্‌চক্ করছে সেগুলো। যেন রমন ক্রিয়া চলার সময় অঙ্গগুলো যেমন ঘেমে উঠে চক্‌চক্ করে তেমনই ঘেমে উঠেছে শরীরেই ওই অংশগুলো।

যারা এঘরে আসে তারা নিশ্চয়ই হাত বোলায় নারীমূর্তির ও জায়গা গুলোতে। এমনকী তার নাভিতেও। তাই পাথর এত মসৃণ হয়ে গেছে যে, মনে হচ্ছে দেহটা রক্ত-মাংসের-ই তৈরি। এখানেই মন্দিরগুলোতে অনেক পর্যটককেই নারীমূর্তিগুলোর স্তন নিতম্বে হাত বোলাতে দেখেছে অগ্নিভ। একটা মন্দিরে তো এক বিদেশিনীকে পুরুষ মূর্তির লিঙ্গ ধরে ছবিও তুলতে দেখেছিল অগ্নিভ।

আজ সারা দিন ধরে নানা মন্দিরে অসংখ্য মিথুনমূর্তি, নগ্ন নারীমূর্তি দেখেছে অগ্নিভ। কিন্তু এই প্রথম যেন এই সঙ্গমমূর্তির দিকে তাকিয়ে যৌন উত্তেজনা অনুভব করল অগ্নিভ। কিন্তু পরক্ষণেই তার চোয়াল আবার ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে উঠল। ঠিক এভাবেই তো অগ্নিভ শেষ বারের জন্য মিলিত হয়েছিল সুদেষ্ণার সঙ্গে। হুবহু একইভাবে! আর তারপর...

BanglaBook.org

'উওম্যান অন দ্য টপ'-এর এই ভঙ্গির নাম জানো তুমি? এর নাম 'সুপারনোভা'।

নামটা জানা ছিল না অগ্নিভর। রবার্টের কাছেই শুনল যে।

রবার্ট এরপর বলল, 'হানা এই পশ্চারটা খুব পছন্দ করে। তোমার পার্টনার করে?'—এই বলে সে তার ক্যামেরায় ছবি নিতে শুরু করল সেই সঙ্গম-মূর্তির।

প্রশ্নটা একান্ত ব্যক্তিগত। সাধারণত সদ্য পরিচিত কেউ কাউকে এ-প্রশ্ন করে না। তবে রবার্টরা মনে হয় এসব খোলাখুলি আলোচনা করতেই অভ্যস্ত। যৌনতা নিয়ে আলোচনা করতে খুব একটা ট্যাবু নেই ওসব দেশে। খুব স্বাভাবিকভাবেই কথাটা জানতে চাইল রবার্ট। অগ্নিভর মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়েই যাচ্ছিল, 'হ্যাঁ, একজন ছিল যে খুব পছন্দ করত এটা। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে নিজেকে সংযত করে বলল, 'আমার কোনও বেড পার্টনার নেই। হানা কে?'

ছবি তোলার পর জবাবটা শুনে যেন বেশ বিস্মিত হল রবার্ট। সে প্রথমে বলল, 'পার্টনার নেই! যোগাড় করো। জীবন আজ আছে কাল নেই। তার আগে জীবনটা উপভোগ করো। জীবনের সব চেয়ে উপভোগ হল এ জিনিসটা। এর পর রবার্ট বলল, 'হানা হল আমার গার্লফ্রেন্ড। সাতজনের দলের সঙ্গে আমরা দুজনও এসেছি এখানে আজ দুপুরে। এখানে এত গরম জানা ছিল না। ক্লান্ত হয়ে হোটেলের এসিতে বসে আছে সবাই। হানাও আছে। কৌতূহল চাপতে না পেরে আমি শুধু ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি।'

সে দেওয়াল ছেড়ে, এরপর তারা দুজন গিয়ে দাঁড়াল সেই থালার মতো জানলা বা ছিদ্রঅলা দেওয়ালটার সামনে। প্রথমে রবার্ট, তারপর অগ্নিভ বাইরে তাকাল সেই ছিদ্র দিয়ে। প্রায় ছ'টা বাজতে চলেছে কিন্তু তখনও বাইরে বেশ রোদ আছে। এটা মন্দির চত্বরের একেবারে পেছনের অংশ। বাইরে অনেকটা দূরে বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে একটা বেদিমতো জায়গা দেখা যাচ্ছে। হয়তো কোনও সময় ওটা কোনও মন্দির-বেদি ছিল। মন্দিরটা এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, বেদিটাই শুধু রয়েছে। এরকম আরও কয়েকটা বেদি এর আগে দেখেছে অগ্নিভ। হয়তো বা তার ওপরের পুরো মন্দিরটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বা একটা স্তম্ভ বা দেওয়াল তার ওপর কোথাও দাঁড়িয়ে আছে।

বাইরেটা দেখার পর রবার্ট বলল, 'চলো, এবার তবে ফেরা যাক?'

অগ্নিভর হোটেলে ফেরার কোনও তাড়া নেই। আর ঘরে ফিরলেই তো বিষণ্ণতা ঘিরে ধরবে তাকে। সূর্য ডুবতে আরও কিছুটা দেরি। এ-ঘরটা বেশ ঠান্ডা। সারাটা দিন এ-মন্দির, সে-মন্দির ঘুরে বেড়াচ্ছে অগ্নিভ। এখানে

BanglaBook.org

ধীরে-সুস্থে একটু জিরিয়ে নিয়ে তারপর ফিরবে ভেবে সে বলল, 'তুমি যাও। এখানে বসে আমি একটু ধূমপান করব। তারপর ফিরব।'

রবার্ট বলল, 'কিন্তু আমাকে যেতে হবে। এখানে 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের' যে শো হয় তার টিকিট কাটতে হবে সবার জন্য।'

অগ্নিভ বলল, 'হ্যাঁ, আমি গতকাল সন্ধ্যায় শো-টা দেখেছি। 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ড' আর নর্তকীদের নাচে পুরোনো দিন ফুটিয়ে তোলা হয়।'

রবার্ট এবার তার পাউচ খুলে একটা বিদেশী সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে অগ্নিভর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এটা খাও। সম্ভবত এর স্বাদ আগে পাওনি। খেয়ে দেখো, বেশ লাগবে।'

অগ্নিভ নিল সেটা। রবার্ট লাইটারও দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু অগ্নিভ বলল, 'দরকার নেই। আমার কাছে লাইটার আছে।'

রবার্ট হেসে বলল, 'আচ্ছা। আমাকে সঙ্গ দেবার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তবে যাবার আগে বলে যাই যে জীবনটা উপভোগ করো। আর তার জন্য নারীর প্রয়োজন। ঠিক দেওয়ালের গায়ের ওই নারীর মতো।'

অগ্নিভ হেসে বলল, 'ধন্যবাদ। তোমার কথা মনে রাখব।'

রবার্ট নামের সেই ফরাসি পর্যটক এরপর বেরিয়ে গেল সে-জায়গা ছেড়ে।

রবার্ট চলে যাবার পর সিগারেটার ধরানোর জন্য লাইটার বার করে আবারও তাকাল সেই মূর্তিযুগলের দিকে। কী জীবন্ত তারা! বিশেষত নারী মূর্তিটা!

সিগারেট জ্বালিয়ে সে এগিয়ে গেল আবার সেই দেওয়ালটার দিকে। সিগারেটের ধোঁয়াটা কেন জানি তার যৌন অনুভূতিকে বাড়িয়ে দিল মনে হয়। সে হাত রাখল সেই নারী মূর্তির স্তনে, নিতম্বে। কী সুন্দর, কামোদ্দীপক দেহ! আর তারপর সে আরও একটা জিনিস খেয়াল করল। পুরুষমূর্তি যে বেদিটার ওপর শুয়ে নারীকে ধারণ করেছে তা হুবহু ঘরের মধ্যে থাকা সেই পাথুরে বেঞ্চ বা বেদির মতো! হ্যাঁ, ওই তো দুটো বেদির পায়াতেই শঙ্খলাগা জোড়া সাপের ছবি খোদাই করা!

অগ্নিভ বুঝতে পারল, তার মানে ঘরের মধ্যে থাকা লম্বা বেঞ্চের মতো বেদিটা নিছক বসার জন্য তৈরি করা হয়নি। আসলে ওটা রমনবেদি। বিপরীত বিহারের জন্য ব্যবহার করা হত। তবে কি এটা রমনকক্ষ ছিল? সেই পুরুষ বা নারীরা কারা ছিল? পুরোহিত-দেবদাসী? সৈনিক-নর্তকী?

সিগারেটে আবার একটা লম্বা টান দিল অগ্নিভ। মাথাটা যেন মৃদু ভার

BanglaBook.org

ভার লাগতে শুরু করল এবার। সে একবার তাকাতে লাগল সেই বেদির দিকে। আর একবার সেই নারীমূর্তির দিকে। আর এরপরই হঠাৎ যেন তার মনে হতে লাগল সেই নারীমূর্তির মুখের সঙ্গে মিল আছে সুদেষ্ণার।

সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণায় কুঁকড়ে উঠল সে। তার মনে পড়ে গেল সেই ঘটনার কথা। সেদিন ক্লাবের পার্টিতে একটু বেশি মদ্যপান করেই ঘরে ফিরে পোশাক খুলে ফেলেছিল তারা দুজন। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই খাটে-শোয়া অগ্নিভর শরীরের ওপর উঠে বসেছিল সুদেষ্ণা। মেতে উঠেছিল বিপরীত বিহারে। আধো-অন্ধকার ঘর। সুদেষ্ণার শরীরটা খেলছিল অগ্নিভর দেহর ওপর।

এ পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল। কিন্তু তার শরীরটা নাচাতে নাচাতে সম্ভবত মদের ঘোরেই সুদেষ্ণা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে চিৎকার করে বলে উঠেছিল, 'আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। পাগল হয়ে যাচ্ছি! কী আরাম রক্তিম!

হয়তো সুদেষ্ণা চোখ বন্ধ করে তার শরীরটাকে খেলাতে খেলাতে কল্পনা করছিল যে, সে খেলছে রক্তিমের শরীরের ওপরই।

রক্তিম-সুদেষ্ণা-অগ্নিভ-নির্বাণ একই কোম্পানিতে চাকরি করত তখন। কিছুদিন ধরেই রক্তিম আর সুদেষ্ণার ব্যাপারে একটা সন্দেহ দানা বাধছিল অগ্নিভর মনে। অগ্নিভর বুকের ওপর খেলতে-থাকা সুদেষ্ণার অসতর্ক উচ্ছাসে সেই মুহূর্তে অগ্নিভর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছিল সব কিছু।

এক ঝটকায় সুদেষ্ণাকে তার দেহর ওপর থেকে ফেলে দিয়ে উঠে বসেছিল অগ্নিভ। আর সুদেষ্ণাও সম্বিত ফিরে পেয়ে বুঝতে পেরেছিল যে, তার আর কিছু করার নেই। ব্যাপারটা ধরে ফেলেছে অগ্নিভ। সে-রাতেই ঘর ছেড়েছিল সুদেষ্ণা।

তেমন কোনও অসুবিধা তার ছিল না। কারণ অগ্নিভ আর সুদেষ্ণার মধ্যে আইনগত কোনও সম্পর্ক ছিল না। সুদেষ্ণা এখন রক্তিমের সঙ্গে লিভ টুগেদার করে, যেমন করত অগ্নিভর সঙ্গে। সে-কোম্পানির চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে অগ্নিভ। তবে তাদের আর এক কোলিগ নির্বাণ মাঝে মাঝে ফোন করে অগ্নিভকে। আর তার মাধ্যমেই সুদেষ্ণা আর রক্তিমের ব্যাপারে টুকটাক খবর কানে আসে অগ্নিভর। খুব আনন্দেই নাকি আছে তারা দুজন। বিশেষত সুদেষ্ণা। সে নাকি আফিসের এক কোলিগকে বলেছে যে, অগ্নিভকে সে নাকি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে অগ্নিভর যৌন অক্ষমতার কারণে!

সুদেষ্ণার এ বক্তব্যের সত্য-মিথ্যা যা-ই থাকুক, নির্বাণের মুখে শোনা-কথাটা মন্দিরের ওই অপরিচিত কক্ষে সুদেষ্ণার ঘটনাটা ভাবতে গিয়ে মনে

BanglaBook.org

পড়ে গেল অগ্নিভর। দেওয়াল থেকে ছিটকে সরে এসে সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বাইরে বেরোতে যাচ্ছিল সে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মাথাটা ঘুরে গেল তার। আর এক পা এগোতে পারছে না সে। অগ্নিভ টলতে টলতে বসে পড়ল সেই রমনবেদির ওপর।

২

গাঢ় অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা আবছা আলো ধীরে ধীরে যেন ভেসে উঠতে লাগল অগ্নিভর চোখের সামনে। চোখ মেলল অগ্নিভ। প্রথমে সে বুঝতে পারল না সে কোথায় আছে! ঘোরটা পুরোপুরি না কাটলেও আস্তে আস্তে সে চিনতে পারল সেই ঘর। মাথার ওপর ফাটল বেয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে সে যেখানে বসে আছে ঠিক সে জায়গাতে। অর্থাৎ বেদিটার ওপর। চারপাশের দেওয়ালগুলোও আবছা দেখা যাচ্ছে। ওই তো দেওয়ালের গায়ে বিপরীত বিহাররত সেই নারীমূর্তি। জায়গাটা চিনতে পেরে বেশ অবাক হল অগ্নিভ। তাহলে সে মন্দিরের ভেতর সেই ঘরেই রয়েছে এখনও!

কতক্ষণ সে রয়েছে এখানে?

বেদি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘড়ি দেখতে যাচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা অস্পষ্ট খসখস শব্দ শুনে সে দেখতে পেল দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে একটা ছায়া! সে প্রবেশ করল ঘরে। তারপর এসে দাঁড়াল বেদির কাছাকাছি। অগ্নিভ তাকে দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল। এক তন্বী যুবতী! চাঁদের আলো এসে পড়েছে তার গায়ে। তার গায়ে জরির কাজ করা বক্ষবন্ধনী, কোমর থেকে হাঁটুর কিছুটা নীচে পর্যন্ত ঘাগরার মতো পোশাক। বাজুবন্ধনী, চুড়িসহ বেশ কিছু গহনাও আছে শরীরে, নাকছাবিটা মৃদু ঝিলিক দিচ্ছে চাঁদের আলোতে। তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে একটু অস্বস্তিবোধও হল অগ্নিভর। ফিতে দিয়ে বাঁধা তার বক্ষবন্ধনী ঘন সন্নিবিষ্টভাবে ধরে রেখেছে তার স্তনদুটোকে। ফলে প্রকট হয়ে উঠেছে তার বক্ষ বিভাজিকা। বক্ষ আবরণী আর রেশমের কোমরবন্ধনীর মাঝে উন্মুক্ত স্থান থেকে অগ্নিভর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটার গভীর নাভি।

মেয়েটা মৃদু হাসল অগ্নিভর দিকে তাকিয়ে, তারপর পরিষ্কার বাংলায় প্রশ্ন করল, 'এ ঘরে কী করছেন?'

BanglaBook.org

অগ্নিভ বলল, 'আমি টুরিস্ট। মন্দির দেখতে এসেছিলাম। এখানে ঢোকার পর মাথাটা সম্ভবত ঘুরে গেছিল। হুস ছিল না। এখন চোখ মেলে দেখি এঘরেই রয়ে গেছি।'

মেয়েটা তার জবাব শুনে একটু হেসে দেওয়ালের রমণ-ভাস্কর্যটা দেখিয়ে বলল, 'মাথা ঘুরে গেছিল কি ওই মূর্তিটা দেখে?'

স্পষ্ট কৌতুকের ছাপ ফুটে উঠল মেয়েটার মুখে।

তার প্রশ্ন শুনে অপ্রস্তুত বোধ করল অগ্নিভ। সে বলল, 'না, তেমন কোনও ব্যাপার নয়। আমাকে এবার হোটেলে ফিরতে হবে। বেশ রাত হয়ে গেছে!'

মেয়েটা বলল, 'হ্যাঁ, বেশ রাত। বারোটা বেজে গেছে।'

কথাটা শুনে চমকে উঠল অগ্নিভ, তার রিস্টওয়াচেও বারোটা বাজে। তার মানে অন্তত পাঁচ ঘণ্টা সে এঘরে কাটিয়েছে!

এরপর মেয়েটা বলল, 'কিন্তু যাবেন কীভাবে? মন্দিরচত্বরের বাইরে বেরোবার গেটে আছে তাতে তো সন্ধ্যা নামার পরই তালা বন্ধ করে চলে গেছে সিকিওরিটির লোকরা। তাছাড়া অন্য বিপদও হতে পারে। এত রাতে আপনাকে এখানে দেখে কেউ মূর্তিচোর বা পাচারকারী বলে সন্দেহ করতে পারে। তাতে বিপদ বাড়তে পারে আপনার।'

কথাটা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অগ্নিভ। তারপর বলল, 'তবে কী করা যায়?'

সে বলল, 'আর তো পাঁচ-ছ-ঘণ্টা পর সূর্য উঠবে। ট্যুরিস্টদের জন্য গেট খোলা হবে। তখন সে-ভিড়ে মিশে আপনি বেরিয়ে যেতে পারবেন। কেউ জানবেই না, আপনি এখানে রাত কাটিয়েছেন। থেকে যান এখানে। রাতটুকু আমি আপনাকে সঙ্গ দেব।'

মেয়েটার কথা খুব একটা অযৌক্তিক নয়। তবে মেয়েটা কে? এত রাতে কোথা থেকে এখানে এল তার পোশাক দেখে অগ্নিভর মনে হল, 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ড'-এর সঙ্গে যে মেয়েদের দল নর্তকীদের অভিনয় করে, হয়তো বা তাদের কেউ হতে পারে মেয়েটা। অগ্নিভ তাকে বলল, 'আপনি তো বাংলায় বেশ কথা বলেন! আপনি বাঙালি? এখানে থাকেন?'

সে জবাব দিল, 'এখানে অনেক বাঙালি আসেন। আমার নাম-ধাম-পরিচয়ের চেয়ে সবচেয়ে বড় পরিচয়, আমি একজন নারী! একজন যুবতী। সেটাই একজন পুরুষের কাছে আমার বড় পরিচয় নয় কি?'

কথাটা বলে সে বেদিটার একদম সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর আবারও

BanglaBook.org

তাকাল দেওয়ালে খোদিত সেই সঙ্গমরত নারীমূর্তির দিকে।

অগ্নিভ হেসে বলল, 'তবুও তো পরিচয় জানার ইচ্ছা একটা হয়ই।'

সেই যুবতী দেওয়ালের দিকে চোখ রেখে ঠোঁটের কোণে একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, 'ওই যে দেওয়ালের গায়ের মেয়েটাকে আপনি যখন প্রথম দেখেছিলেন তখন ওকে দেখে কি আপনার ওর নাম-পরিচয় জানার ইচ্ছা হয়েছিল? জানার ইচ্ছা হয়েছিল যে কার মূর্তি রচনা করেছিলেন প্রাচীন শিল্পী? নাকি ওর সৌন্দর্যই আকর্ষণ করেছিল আপনাকে?'

কথাটা ঠিক। মূর্তির নারীদেহই আকৃষ্ট করেছিল বা করছে অগ্নিভকে। তার পরিচয় নয়।'

এ কথা বলার পর মেয়েটা অদ্ভুতভাবে বলল, 'আচ্ছা, আমি যদি আমার নাম-পরিচয় বলি তাহলে কি আপনি আমাকে জীবনসঙ্গী করবেন?'

অগ্নিভ এবার হেসে ফেলে বলল, 'এভাবে কি কাউকে জীবনসঙ্গী করা যায়? তার জন্য সময় লাগে। বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়।'

মেয়েটা স্পষ্টই হাসল এবার। তারপর বলল, 'কীভাবে আপনার বিশ্বাস পেতে পারি?'

কথাটা বলতে বলতে মেয়েটা তার ডান-পা-টা তুলে দিল বেদির ওপর। ঘাগড়াটা উঠে গেছে তার হাঁটুর ওপর। চাঁদের আলোতে দেখা যাচ্ছে তার উন্মুক্ত ফর্সা-পা-টা। কী সুন্দর, কী আকর্ষক সেই পা! সেদিকে তাকিয়ে থমকে গেল অগ্নিভর চোখ। শিহরন খেলে গেল তার শরীরে। পায়ের পাতা ছুঁয়ে তার দৃষ্টি হাঁটু পর্যন্ত উঠে ঘাগড়ার আরও গভীরে যেন প্রবেশ করতে চাইল।

মেয়েটা অগ্নিভর মনের ভাব পড়তে পেরেই সম্ভবত বলে উঠল, 'খুব সুন্দর তাই না? আমি আরও অনেক বেশি সুন্দর।'

এই উদ্ভিন্ন যুবতী কে? সে কি প্রলুব্ধ করতে চাইছে অগ্নিভকে? মেয়েটা কি তবে দেহোপজীবিনী? টুরিস্টদের মনোরঞ্জন করে? অগ্নিভর মনে হল, হয়তো তাই। সে হেসে বলল, 'হ্যাঁ, সুন্দর।'

মেয়েটা এরপর বলল, 'এ জায়গাটাতে বেশ গরম লাগছে আমার। বললে না তো কীভাবে বিশ্বাস জাগাতে পারি তোমার মনে?'

বিশ্বাস! অগ্নিভ তো বিশ্বাস করেছিল সুদেষ্ণাকে। আর তারপর? সে আর কোনও মেয়েকে বিশ্বাস করবে না।—মনে মনে হাসল অগ্নিভ।

গরমের আছিলাতে এরপর সেই মেয়েটা হঠাৎ-ই তার বক্ষবন্ধনীর ফাঁসটা হালকা করে দিল। শিথিল হয়ে গেল বন্ধনী। আর এবার তার ভিতর থেকে

BanglaBook.org

শুধু বিভাজিকা নয়, আত্মপ্রকাশ করল তার শঙ্খের মতো বুকদুটোও। মাত্র একটা সুতোর ব্যবধান। সেটা সরে গেলে আর স্তনবৃন্তটাও এরপর উন্মোচিত হয়ে যাবে।

পুরুষের রক্ত ছলকে উঠতে শুরু করল অগ্নিভর শরীরে। মেয়েটা যে-ই হোক, হ্যাঁ, সে প্রলুব্ধ করছে অগ্নিভকে। সে শরীর দেবার ইঙ্গিত করছে তাকে। কী দরকার তার পরিচয় জেনে! আচ্ছা যদি অগ্নিভ তার সঙ্গে এখন শরীরের ডাকে মেতে ওঠে তবে কেউ কি জানবে সে-কথা? না, জানবে না। হয়তো মেয়েটা কিছু টাকা নেবে। তা নিক। বিয়ের ব্যাপারটা নিছক কথার কথা। হয় মেয়েটার শরীর তার-ই মতো অভুক্ত অথবা তার টাকা চাই। নইলে সে ওভাবে বুকটা খুলে দিত না।

অগ্নিভ আর পারছে না। মেয়েটার উন্মুক্ত উরু, বুক-নাভি উত্তেজিত করে তুলছে অগ্নিভকে। চপল হাসি হাসছে মেয়েটা। অগ্নিভ আর নিজেকে সংযত করতে পারল না। সে এবার বলে উঠল, 'হ্যাঁ, বিশ্বাস করব যদি তোমাকে দেওয়ালের ওই মেয়েটার মতো পাই।'

মুহূর্তখানেক স্থির দৃষ্টিতে অগ্নিভর দিকে তাকিয়ে মেয়েটা বলল, 'আচ্ছা তাই হবে।'

একটানে মেয়েটা খসিয়ে ফেলল বুকের কাঁচুলি। সমুদ্রর ঢেউয়ের মতো আকাশের দিকে উছলে উঠল তার শঙ্খের মতো বুকদুটো, গাঢ় বাদামি রঙের চেরিফলের মতো বৃন্তদুটো। ঘাগরাটাও এরপর খসিয়ে ফেলল সে। চাঁদের আলো চুঁইয়ে পড়ছে গলা থেকে স্তন ছুঁয়ে গভীর নাভীর দু-পাশ বেয়ে। তারপর সে এসে থামছে ঠিক সে জায়গায়, যেখানে তলপেটের নীচে বকফুলের পাপড়ির মতো বিকশিত হয়ে আছে যৌন-কেশগুচ্ছ। চাঁদের আলো যেন শুষে নিচ্ছে তলপেটের নীচের সে জায়গাটা।

ট্রাউজার খুলে বেদিটার ওপরে দেওয়ালে খোদিত পুরুষমূর্তিটার মতোই শুয়ে পড়ল অগ্নিভ। আর এগিয়ে এসে অগ্নিভর শরীরটাকে তার দু-পায়ের মাঝখানে রেখে তার ওপর চড়ে বসল মেয়েটা। বিপরীত বিহার।

চাঁদের আলোতে দোল খাচ্ছে মেয়েটার শরীর। উঠছে, নামছে। তার স্তনদুটো যেন সে-দুলুনিতে আকাশের দিকে উঠে যেতে চাচ্ছে। ঘামের বিন্দু তার বুকের মাঝখান দিয়ে নেমে জমা হচ্ছে আধুলির মতো তার গভীর নাভিতে। মাঝে মাঝে দু-হাত মাথার ওপর তুলে চুলগুলো কপাল থেকে সরিয়ে নিচ্ছে মেয়েটা। উন্মোচিত হচ্ছে তার বাহুসন্ধির কুঞ্চিত রোম। মাঝে মাঝে

BanglaBook.org

পরম তৃপ্তিতে শীৎকার করে উঠছে মেয়েটা।

অগ্নিভ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছেনা। যে কোন মুহূর্তে সে এবার গরম লাভার মতো দেহরস উদ্গীরণ করবে মেয়টার শরীরে। ঠিক সেই সময় হঠাৎ মেয়েটা প্রবল শীৎকার করে বলে উঠল, 'আমি পাগোল হয়ে যাচ্ছি! পাগোল হয়ে যাচ্ছি! আঃ কী আরাম রক্তিম!'

কোমড়ের ওপর মেয়েটাকে খেলাতে খেলাতে মুহূর্তের জন্য দেওয়ালের সেই বিপরীত বিহার ভাস্কর্যর দিকে তাকিয়ে ছিল অগ্নিভ। কথাটা কানে যেতেই সে তাকাল মেয়টার মুখের দিকে। চমকে উঠল অগ্নিভ। আরে, তার দেহের ওপর চড়ে বসে আছে সুদেষ্ণা! হ্যাঁ, হ্যাঁ, সুদেষ্ণাই। হ্যাঁ, এই তো চাঁদের আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার দুলতে থাকা বাঁ-বুকে পরিচিত লম্বা জরুলের দাগটা!

সে আবারও শীৎকার করে উঠল, 'আঃ, কী আরাম! আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি রক্তিম!

এ তো সুদেষ্ণার-ই গলা! কিন্তু এ কীভাবে সম্ভব হল!

কিন্তু যাই হোক না কেন, এ সুদেষ্ণাই। অগ্নিভ প্রচণ্ড ঘৃণায় ধাক্কা মেরে তার দেহ থেকে সুদেষ্ণাকে সরিয়ে উঠে বসতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে সুদেষ্ণা তার গলাটা দু-হাত দিয়ে চেপে ধরল। মুহূর্তের মধ্যে হিংস্র হয়ে উঠল তার মুখ। অগ্নিভর গলাটা চেপে ধরে নিজের দেহটা তার শরীরের ওপর খেলাতে খেলাতে সুদেষ্ণা সাপের মতো হিসহিস করে বলে উঠল, 'উঠতে দেব না, উঠতে দেব না। যতক্ষণ না আমার আশ মিটছে ততক্ষণ আমি উঠতে দেব না তোকে।' কী কামোদ্দীপক হিংস্র মুখ তার!

অগ্নিভ কিছুতেই সরাতে পারছে না সুদেষ্ণাকে তার শরীর থেকে। সুদেষ্ণার নখগুলো ক্রমশ আরও গভীরভাবে চেপে বসছে তার গলায়। যেন মৃত্যু আলিঙ্গন! দম বন্ধ হয়ে আসছে অগ্নিভর, ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে তার চোখের মণি। তাকে চেপে ধরে তার ওপর শরীরটা খেলাচ্ছে সুদেষ্ণা। আর শ্বাস নিতে পারছে না অগ্নিভ। এবার সত্যি হয়তো দমবন্ধ হয়ে মারা যাবে অগ্নিভ। কী কঠিন সেই নিষ্পেশন।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা তীব্র শিস্-এর মতো শব্দ হল। আর তারপরই যেন একটা ঝটকা খেয়ে অগ্নিভর শরীরের ওপর স্থির হয়ে গেল সুদেষ্ণার দেহ। তার হাতদুটো আলগা হয়ে গেল অগ্নিভর গলা থেকে।

চাঁদের আলো এসে পড়েছে সুদেষ্ণার শরীরে, সুদেষ্ণা পাথরের মূর্তির

BanglaBook.org

মতো বসে আছে অগ্নিভর শরীরের ওপর। সেই চাঁদের আলোতে অগ্নিভ স্পষ্ট দেখতে পেল সুদেষ্ণার দুই বুকের মাঝখানে আমূল বিঁধে আছে একটা তির! তার পিছনের পালক লাগানো অংশটা এখনও মৃদু মৃদু কাঁপছে। কামের স্বেদবিন্দু নয়, সুদেষ্ণার বুকের মাঝখান থেকে একটা গাঢ় রক্তধারা নেমে যাচ্ছে নাভির দিকে! গাঢ় লাল রক্ত!

আর এরপরই সুদেষ্ণার নিথর দেহটা অগ্নিভর দেহ থেকে ধপ করে শব্দ তুলে খসে পড়ল মাটিতে, আর সেই মুহূর্তে জ্ঞান হারাল অগ্নিভও।

৩

অগ্নিভর যখন জ্ঞান ফিরল তার অনেক আগেই বাইরে সূর্য উঠে গেছে। চোখ খুলতেই তার মনে পড়ে গেল ঘটনাটা। সেই বেদির ওপরেই শুয়েছিল সে। ঘটনাটা মনে পড়তেই ধরমর করে উঠে বসল। মেঝের দিকে প্রথমে তাকাল। না, মেঝেতে কেউ পড়ে নেই! একটু আশ্বস্ত হল সে। তবে কি ব্যাপারটা দুঃস্বপ্ন ছিল? ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছিল। যদিও তার প্যান্টটা নীচে নামানো, তবে সে সেটা ঘুমের ঘোরেই খুলে থাকতে পারে। চটপট তুলে নিল সেটা। তাকে এখনই বেরোতে হবে এই ঘর ছেড়ে।

অগ্নিভ বাইরে বেরোতে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় হুড়মুড় করে সে ঘরে ঢুকল একদল বিদেশী ট্যুরিস্ট। সঙ্গে একজন গাইড। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অগ্নিভ। তারপর এমন ভাব দেখাল যে সে যেন একটু আগেই ঘরে ঢুকেছে। সে তাকিয়ে রইল ঘরের দেওয়ালের সেই বিপরীত বিহাররত মূর্তি যুগলের দিকে।

সেই মূর্তির দিকে ট্যুরিস্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গাইড বক্তৃতা শুরু করল বিদেশী ট্যুরিস্টদের উদ্দেশ্যে—'মূর্তিটা দেখুন। "উত্তমেন অন দ্য টপ"। ইউরোপীয়রা অনেক সময় দাবি করেন যে, এই যৌনমিলন পদ্ধতি তাদেরই সৃষ্টি। কিন্তু এই মূর্তি প্রমাণ করছে যে এটা হাজার বছরের প্রাচীন ভারতীয় যৌনমিলন পদ্ধতির-ই ম্যাপ। লক্ষ করে দেখুন, ঘরের মাঝখানে যে-বেদিটা রাখা আছে তার সঙ্গে হুবহু মিল আছে পাথরের গায়ে খোদিত ছবিটার বেদির।

হ্যাঁ, ঘরের এই বেদিটাই ব্যবহার করা হত বিপরীত বিহারের জন্য। তবে এক বিশেষ কারণে। অনেক সময় সেযুগে দেবদাসীদের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে

BanglaBook.org

জড়িয়ে পড়ত পুরোহিত বা মন্দিরের রক্ষীরা। ব্যাপারটা প্রধান পুরোহিত বা রাজার কানে গেলে মৃত্যুদণ্ড নির্ধারিত হত সেই দেবদাসী বা নর্তকীয়র জন্য। তবে খুব কৌশলে কার্যকর করা হত সেই দণ্ড। সেই নারী-পুরুষকে বলা হত যে, একরাত তাদের এ-ঘরে কাটিয়ে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হতে হবে। তবে তাদের বিয়ে দেওয়া হবে। রাজি হত তারা। সেসময় বিপরীত বিহার খুব প্রচলিত ছিল। বলা হত যে সেভাবেই মিলিত হতে হবে তাদের। এই বেদিটার মাথার কাছে একটা জানলা দেখছেন আপনারা। তা দিয়ে বাইরে তাকালে আপনারা বেশ দূরে একটা বেদি দেখতে পাবেন। সেই যুগল যখন মুক্তির আশায় বিপরীত বিহারে মিলিত হত তখন দূরের ওই বেদি থেকে দক্ষ তিরন্দাজ তির ছুড়ত এই জানলা লক্ষ করে। আর তিরটা এস সোজা বিদ্ধ হত বিপরীত বিহারে সঙ্গমরত নারীর বুকে। এমনই কৌশলে বানানো হয়েছিল এই বেদি আর জানলা...'

কথাটা কানে যেতেই চমকে উঠল অগ্নিভ। তবে কি ওই জানলা দিয়েই তির ছুটে এসে লেগেছিল সুদেষ্ণার বুকে? কিন্তু সে তো স্বপ্ন ছিল। তবে কি সে সারাদিন মন্দিরচত্বরে ঘুরতে ঘুরতে কোনও ভাবে শুনেছিল গল্পটা? সেটাই ধরা দিয়েছিল তার স্বপ্নে?

তাই হবে হয়তো। মনে মনে ভাবল অগ্নিভ। ট্যুরিস্টরা বেশ কিছু ছবি তুলল সেই বিপরীত বিহার মূর্তির। তারপর তাদেরই সঙ্গে পায়ে পায়ে সে-ঘর ছাড়ল অগ্নিভ। বাইরে বেরিয়ে হঠাৎ সে খেয়াল করল, সেই দলের মধ্যে রবার্টও আছে! রবার্টও দেখতে পেল তাকে, তারপর তার কাছে এগিয়ে এসে হেসে চাপা সুরে বলল, 'কাল সিগারেটটা কেমন খেলে? ওর মধ্যে মারিজুয়ানা মেশানো ছিল। খেলে হ্যালুসিনেশন হয়।'

তবে কি ওই সিগারেটের প্রভাবেই হ্যালুসিনেশন হয়েছিল অগ্নিভর?

কিন্তু এরপরই রবার্ট বলল, 'তোমার গলাটা অমন ফুলে আছে কেন? নখের দাগও দেখতে পাচ্ছি!'

চমকে উঠল অগ্নিভ। সত্যিই যেন গলায় একটা জ্বালা অনুভব করল সে। রবার্টকে কী বলবে বুঝতে না পেরে অগ্নিভ শুধু বলল, 'ওর মধ্যে যে ড্রাগ মেশানো ছিল তা তোমার বলা উচিত ছিল।'

রবার্ট হেসে বলল, 'ও, আই অ্যাম সরি। তবে জীবনটাকে উপভোগ করো। ড্রাগ না নাও অন্ততো একটা বেড পার্টনার যোগাড় করো! "উওমেন অন দ্য টপ" পশ্চারের দেশের লোক তুমি। গুড লাক।'

BanglaBook.org

কথাগুলো বলে তার দলের সঙ্গে রবার্ট এগোল অন্যদিকে। গলায় হাত বোলাল অগ্নিভ। একটা চেরা দাগ যেন হাতের স্পর্শে অনুভব করল সে। জায়গাটা মৃদু জ্বলছে। নখের চিহ্ন?

ঠিক সেই মুহূর্তে তার মোবাইল বেজে উঠল, কলটা রিসিভ করল সে। ফোনের ওপাশে তার প্রাক্তন কোলিগ নির্বাণ। ফোন কলটা রিসিভ করতেই নির্বাণ বলল, 'তোমাকে একটা খবর দিচ্ছি। জানি না তোমার খারাপ লাগবে কিনা। অফিসে খবর এসেছে গত রাতে একটা দুর্ঘটনায় মারা গেছে সুদেষ্ণা।'

স্তম্ভিত অগ্নিভ জানতে চাইল, 'কীভাবে?'

নির্বাণ জবাব দিল, 'রক্তিমের সঙ্গে নর্থ ইস্টে বেড়াতে গেছিল সুদেষ্ণা। ওখানে গতরাতে আদিবাসীদের একটা অনুষ্ঠানে তিরখেলা দেখতে গেছিল তারা দুজন। খেলা চলার সময় একটা তির কীভাবে যেন এসে লাগে সুদেষ্ণার ঠিক বুকের মাঝে। সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ...'

মোবাইলটা খসে পড়ল অগ্নিভর হাত থেকে। তার চোখে ভেসে উঠল সেই দৃশ্য—সুদেষ্ণার বুকের মাঝখানে বিঁধে আছে একটা তির!

গতকাল রাতে দেখা ঘটনাটা না হয় মারিজুয়ানা ড্রাগের প্রভাবে হতে পারে। কিন্তু অগ্নিভর গলায় আঁচড়ের দাগটা তবে কীভাবে হল? এখনও যে জ্বালা করছে তার গলায়! সুদেষ্ণার সঙ্গে গতরাতে তার বিপরীত বিহার-এর চিহ্ন।

BanglaBook.org

একাকুন

একটা পাহাড়ের ঢালে ছোট্ট সমতলমতো একখণ্ড জায়গাতে গাইডের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলাম আমি আর হার্বার্ট। আমাদের চারপাশে ছোট-ছোট পান্না সবুজ পাহাড় খাড়া হয়ে উঠে গেছে নীল আকাশের দিকে। পাহাড়গুলোর মাথাগুলো কুয়াশায় মোড়া। আর তার ধাপে ধাপে ছড়িয়ে আছে প্রাচীন স্থাপত্যের নানা চিহ্ন। কোথাও পাথুরে দেওয়ালের খণ্ডাংশ, কোথাও ছাদহীন ঘরের চিহ্ন, আবার কোথাও বা পাথুরে সোপানশ্রেণি বা কোনও স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ। একবুক স্মৃতি নিয়ে আজও আন্দিজ পাহাড়ের কোলে দাঁড়িয়ে আছে তারা। মাচু পিচু! প্রাচীন ইনকা সভ্যতার বিখ্যাত নগরীর ধ্বংসাবশেষ।

BanglaBook.org

কেউ বলেন, এই নগরী নাকি একসময় প্রাচীন ইনকাদের গোপন সাধনাস্থল ছিল। আবার কেউ কেউ বলেন যে, সূর্যদেবের উপাসক স্বর্ণনগরীর বাসিন্দা ইনকারা নাকি তাদের স্বর্ণভাণ্ডার লুকিয়ে রেখেছিল আন্দিজ পাহাড়ের কোলে এই গোপন নগরীতেই। তবে এসব ঘটনার সত্য-মিথ্যা নিশ্চিত ভাবে যাচাই করার কোনও সুযোগ আর নেই। কারণ হাজার বছরের প্রাচীন এই নগরীর ধ্বংসাবশেষ কোনও কথা বলতে পারে না। অতএব গাইডের কথাই ভরসা।

আমি আর হার্বার্ট দুজনেই এক বহুজাতিক সফটওয়ার কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মী। হার্বার্ট আমার চেয়েও উচ্চপদে আসীন। আমি ইন্ডিয়া থেকে আর হার্বার্ট ইউ.কে থেকে গতকাল ইনকা সভ্যতার সময়ের সাবেক রাজধানী কুজকোতে এসেছিলাম আমাদের কোম্পানির কনফারেন্সে যোগ দিতে। সে-কাজ মিটে যাবার পর আজ সকালে গাড়িতে ঘণ্টা দুইয়ের রাস্তা পেরিয়ে উপস্থিত হয়েছি ইউনেস্কোর এই হেরিটেজ সাইট মাচুপিচু দেখার জন্য।

পাহাড়ের পাদদেশে একটা ছোট্ট হোটেলে রাত্রিবাসের জন্য ঘর ভাড়া নিয়েছি আমরা। ইচ্ছা আছে আজকের রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল সকালে কুজকো হয়ে লিমা ফিরে সেখান থেকে ফ্লাইট ধরে যে-যার নিজের দেশে পাড়ি দেব। গল্প-উপন্যাসে কত পড়েছি ইনকাদের কাহিনি! তাই এত কাছে এসে বঞ্চিত হতে চাইনি এ-জায়গার দর্শনলাভ থেকে।

গাইড তার কথা বলতে বলতে পাহাড়ের ধাপ বেয়ে এগোতে লাগল। আমরা তাকে অনুসরণ করতে করতে শুনছিলাম তার কথা। সে বলে চলেছিল লাটিন আমেরিকার প্রাচীন জনজাতি ইনকাদের নানা গল্প—তাদের স্বর্ণবৈভবের কথা, আর শেষ পর্যন্ত সেই সোনার লোভে কীভাবে স্পেনিয়ার্ড হার্নাদো কার্তেজ ধ্বংস করেছিল ইনকাদের, কেমনভাবে স্পেনীয় হানাদাররা শেষ ইনকা সম্রাট আতাহুয়ালপাকে মিথ্যে অভিযোগে ফাঁসির দড়ি পড়িয়েছিল, সে কাহিনি। পাহাড়ের ধাপে দাড়িয়ে থাকা স্থাপত্য চিহ্নগুলো দেখিয়ে বোঝাচ্ছিল তার কোনটা মন্দির ছিল, কোনটা উপাসনাস্থল, পুরোহিত বা দেবদাসীদের থাকার জায়গা ছিল।

এটা টুরিস্ট সিজন নয়, বর্ষাকাল। মাঝে মাঝে দু-এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে। পাহাড়গুলোর মাথার ওপর থেকে নীল আকাশের বুকে মাঝে মাঝে মেঘ ভেসে আসছে, আবার উধাও হয়ে যাচ্ছে। সামান্য কিছু টুরিস্ট ইতিউতি ঘুরছে। পাহাড়ের ঢালগুলোতে চড়ে বেড়াচ্ছে অনেকটা উটের মতো লম্বা গলাওলা, কিন্তু আকারে অনেক ছোট প্রাণী, লামার দল। পশমঅলা এই প্রাণীগুলো শুধু

BanglaBook.org

লাতিন আমেরিকাতেই পাওয়া যায়।

গাইডের পিছন পিছন ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গাতে এসে দাঁড়ালাম আমরা। পাহাড়ের ঢালে সেখানে পাথর-বাঁধানো চত্বর। আর তার গা ঘেঁসে সার সার বেশ কয়েকটা ছাদহীন ঘর দাঁড়িয়ে আছে। সেই চত্বরটা দেখিয়ে গাইড বলল, 'এ-জায়গাতে একসময় সূর্যমন্দির ছিল। আর যে-ঘরগুলো দেখছেন সেখানে থাকতেন এক্লাকুনরা।'

'এক্লাকুনরা মানে?'

গাইড জবাব দিল, 'দেবতার সেবিকা ছিলেন সেই কুমারী নারীরা। তারা কোনও দিন এই মন্দিরের বাইরে যেতেন না। একমাত্র রাজা ও রানি ছাড়া তাঁদের সঙ্গে কেউ সাক্ষাৎ করতে পারত না। তাঁদের দিকে তাকানোও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। আর কোনও কারণে কোনও পুরুষ তাঁদের স্পর্শ করলে তার মৃত্যু অবধারিত ছিল। প্রতিবছর একটা নির্দিষ্ট দিনে একজন এক্লাকুনকে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে তাঁকে মমি বানিয়ে রাখা হত আন্দিজ পাহাড়ের গোপন স্থানে। এক্লাকুনরা অমর। তারা মৃত্যুহীন। তাদের মমিগুলো আজও প্রাণ ফিরে পায়...'

গাইডের কথা শুনে হার্বার্ট মুচকি হেসে বলল, 'তোমার শেষ কথাগুলো ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। হাজার বছরের প্রাচীন মমি প্রাণ ফিরে পায়!'

গাইড কিন্তু হার্বার্টের ব্যঙ্গের হাসি গায়ে মাখল না। বরং সে আরও গম্ভীরভাবে বলল, 'হাসবেন না সাহেব। এখানে বেশ কয়েকটা মন্দিরে এক্লাকুন মমি পাওয়া গেছে। অনেকেই তাদের জীবন্ত হয়ে উঠতে দেখেছে। নড়তে দেখেছে। এখানেও তেমন একটা এক্লাকুন মন্দির আছে।'

হার্বার্ট সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল, তুমি আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে পারবে?'

গাইড বলল 'আমি কেন, কোনও গাইড-ই তোমাদের সেখানে নিয়ে যাবে না। সে-মন্দিরে প্রবেশ করলে এক্লাকুনদেবী জেগে উঠে ক্রুদ্ধ হবেন। তাঁকে ছুঁলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু অবধারিত। এমনকী সে-মন্দিরে প্রবেশ করলেও বছরখানেকের মধ্যেই মৃত্যু হয়। একবার এক সাহেব ঝড়-জলের রাতে আমাদের কথা না-শুনে ওখানে গেছিলেন, পরদিন মন্দিরের বাইরে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়। এমনকী স্থানীয় যে দুজন লোক সেই মৃতদেহটা তুলে এনেছিল তারা বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মারা যায়। এমনই ভয়ঙ্কর রাগ দেবী এক্লাকুনের।'

কথাটা শুনে হার্বার্ট কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ছাদহীন ভাঙা ঘরগুলোর

BanglaBook.org

দেওয়ালের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চারজন মেয়ে। আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল তারা। তাদের পরনে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ঝুলের রেশমি রংচঙে পোশাক, মাথার চুল কপালের সামনে সোনালি রিবন দিয়ে বাঁধা, হাতে কানে গলায় পাথরের তৈরি সাবেকি ইনকা গহনা। বয়স সম্ভবত ষোলো থেকে আঠারো হবে। তাদের দিকে তাকিয়ে যেখানে আমার চোখ আটকে গেল তা হল তাদের বুকের কাছটা। অন্তর্বাসহীন প্রস্ফুটিত বুকগুলো যেন মসৃণ রেশমের আবরণ ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তাদের শঙ্খর মতো স্তন, স্তনবৃন্ত সব-ই স্পষ্ট দৃশ্যমান।

সেদিকে তাকিয়ে চোখ ফেরালাম আমি। হার্বার্ট বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তাদের দিকে। বলা ভালো, তাদের স্তনের দিকে। তারপর গাইডকে প্রশ্ন করল, 'এরা কারা?'

গাইড জবাব দিল, 'এরা দেবী এক্লাকুন সেজেছে। ইচ্ছা হলে আপনারা ওদের কিছু সাহায্য করতে পারেন।'

গাইডের কথা শুনে হার্বার্ট একটা দশ সোল বা পেরুভিয়ান টাকার নোট বের করে সেটা ফেলল এক এক্লাকুনের হাতে-ধরা ঝুড়িতে। মেয়েগুলো আবার চলে গেল সেই ভাঙা দেওয়ালগুলোর আড়ালে।

আমাদের নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল গাইড। হঠাৎ হার্বার্ট তাকে প্রশ্ন করল 'এক্লাকুনদের পাওয়া যায়?'

গাইড বলল, 'তার মানে?'

হার্বার্ট বলল, 'মানে হল টাকা দিলে কি ওদের কেউ আমার সঙ্গে রাত কাটাবে?'

গাইড কথাটা শুনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'এ কথা কখনও মনে আনবেন না। ওরা প্রত্যেকেই এক্লাকুনদেবীদের মতোই কুমারী। তাছাড়া এক্লাকুনদেবী সাজে ওরা। এ-চিন্তা মাথায় আনলে আপনার ক্ষতি হতে পারে।'

হার্বার্ট বলল, 'তাহলে ওরা পোশাকের তলা থেকে বুক দেখিয়ে আমাদের প্রলুব্ধ করছিল কেন?'

গাইড বলল, 'না, প্রলুব্ধ নয়। আসলে এক্লাকুনদেবীরা অমন পোশাক পরতেন।'

গাইড এরপর আর কোনও কথা বলল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্মারকগুলো দেখানো শেষ করে পয়সা বুঝে নিয়ে চলে গেল।

সে চলে যাবার পর আমি হার্বার্টকে বললাম, 'তুমি সত্যিই মেয়েগুলোর

BanglaBook.org

ব্যাপারে আগ্রহী নাকি?'

হার্বার্ট বলল, 'পেলে মন্দ হত না। দেখে ভার্জিন বলেই মনে হল। আমি এমন মেয়েই পছন্দ করি।'

আমি আর এ-ব্যাপারে কথা বাড়ালাম না। গাইড চলে গেছে ঠিকই। কিন্তু আমাদের কোনও তাড়া নেই। তাই জায়গাটাতে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম আমরা।

২

হঠাৎ একটা ছোটখাটো ভিড় দেখে আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম সে জায়গাতে। একটা পাথুরে প্রাচীরের সঙ্গে তেরপলের আচ্ছাদন টাঙিয়ে একটা তাবু বানানো হয়েছে। তার সামনে নানান আকারের প্রাচীন ইনকাদের মূর্তি, বাসনপত্র ইত্যাদির রেপ্লিকা রাখা।

ঘাসের বোনা টুপি পরা স্থানীয় এক বৃদ্ধ একটা লামাকে নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। লামাটা সুন্দরভাবে সাজানো। প্রাণীটার গলায়, চারপায়ে রঙিন ফিতে বাঁধা, পিঠ থেকে ঝুলছে পুঁতির ঝালর। বৃদ্ধর ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে এক্লাকুন-সাজা একটা মেয়ে। হতে পারে এ মেয়েটিও সেই এক্লাকুন সাজা মেয়ে চারজনের মধ্যে ছিল। আসলে মেয়েগুলো প্রায় একই বয়সি আর একইরকম পোশাকে সজ্জিত ছিল বলে আমার চোখে তখন তাদের সবাইকেই একইরকম লাগছিল।

তাঁবুটার সামনে জটলাটা কেন তা কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম। ভিড়ের মধ্যে এক শ্বেতাঙ্গ টুরিস্ট দাঁড়িয়েছিল। অসংখ্য বলি-রেখাময় মুখমণ্ডলের পেরুভিয়ান লামা মালিকের হাতে ধরা ছিল তারের তৈরি বেশ বড় কয়েকটা রিং। দশ সোলের বিনিময়ে বৃদ্ধ সেই রিংগুলো তুলে দিল শ্বেতাঙ্গ লোকটার হাতে। তারপর তাকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালো লামাটার থেকে হাত কুড়ি দূরে মাটিতে খড়ি কাটা একটা জায়গার সামনে।

টুরিস্টটাকে সে-জায়গায় দাঁড় করিয়ে বৃদ্ধ আবার আগের জায়গাতে ফিরে এসে লামাটার উদ্দেশ্যে কী যেন বলতেই সে তার লম্বা গলাটা তুলে স্থির হয়ে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে গেল। আসলে খেলাটা হচ্ছে লোকটা যদি তার হাতের রিং-তিনটের কোনওটা ছুড়ে লামাটার গলায় পরাতে পারে তাহলে তাবুর সামনে রাখা স্যুভেনিরগুলোর কোনও একটা সে নিতে পারবে আর

BanglaBook.org

টাকাটাও ফেরত পাবে। না-পারলে টাকাটা পাবে লামার মালিক। বলা যেতে পারে ওটা একধরনের জুয়া।

খেলাটা দেখতে লাগলাম আমরা। লামাঅলা বৃদ্ধ শ্বেতাঙ্গ টুরিস্টকে ইশারা করল রিং ছোড়ার জন্য। ছুড়ল লোকটা। প্রথম রিংটা লামার বেশ কয়েক হাত তফাত দিয়ে বেরিয়ে গেল। সেটা লুফে নিল লামাঅলা বুড়োটা। ব্যাপারটা যত সোজা মনে হয় ঠিক তত সোজা নয়। দ্বিতীয় রিংটা বেশ সাবধানে ছুড়ল লোকটা। রিংটা লামার গলায় হয়তো আটকে যেত কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ঘাড় সরিয়ে নিল লামাটা। তার গলায় লেগে ছিটকে পড়ল রিংটা। টুরিস্ট তাই দেখে বলে উঠল, 'তোমার লামাটা মাথা সরিয়ে নিল কেন? আমি এরজন্য আর একটা বাড়তি সুযোগ পাব তো?'

বৃদ্ধ পেরুভিয়ান বলল, 'না, পাবে না। এটাও তো খেলার একটা অঙ্গ। সে কখন মাথা নাড়বে তা তার মর্জি। আমার বা তোমার কারো জানা নেই।'

অগত্যা লোকটা তার হাতের শেষ রিংটা ছুড়ল। সেটাও হয়তো লামাটার গলায় আটকাত কিন্তু শেষমুহূর্তে আবারও একই কাণ্ড করল প্রাণীটা। ঘাড় ফিরিয়ে নিল। রিংটা ছিটকে পড়ল মাটিতে। বৃদ্ধ কুড়িয়ে নিল সেটা। হাসি ফুটে উঠেছে তার মুখে। টাকাটা পকেটস্থ করতে পেরেছে সে। টুরিস্ট ব্যাজার মুখে এগোল অন্য দিকে। ভিড়টাও ভেঙে গেল। আর আমরাও খেলাটা দেখে এগোলাম অন্যদিকে।

কিন্তু কিছুটা এগিয়েই হার্বার্ট থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে বলল, 'চলো তো একবার লামাঅলাটার কাছে যাওয়া যাক।'

আমি বললাম, 'কেন, তুমি খেলবে নাকি?'

হার্বার্ট সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, 'দেখা যাক।'

পিছু ফিরে কিছুটা এগিয়ে এসে দাঁড়ালাম সেই লামাঅলার সামনে। আমাদের দেখে লামাঅলা হাসল। মেয়েটাও হাসল। স্বাভাবিক কারণেই আমার আর হার্বার্টের চোখ মুহূর্তের জন্য আটকে গেল মেয়টার বুকের ওপর। হয়তো বা এ-খেলাতে খদ্দেরকে আকৃষ্ট করার জন্যই মেয়েটাকে এক্রাকুন সাজিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। বুড়ো লোকটা প্রশ্ন করল, 'তোমরা খেলবে?'

হার্বার্ট বলল, 'খেলব। কিন্তু তার আগে একটা জিনিস জানার প্রয়োজন। রিংটা লামার গলায় পড়ার আগের মুহূর্তে প্রাণীটা ঘাড় সরাচ্ছে কেন? কোনও ট্রেনিং দেওয়া আছে নাকি?'

বৃদ্ধ বলল, 'না, ওটা ওর মর্জির ব্যাপার। ওর গলায় যে রিং পড়ানো যায়,

BanglaBook.org

আর ও যে সব সময় ঘাড় ফেরায় না সেটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি।'

কথাগুলো বলে বৃদ্ধ লামাটাকে গলা তুলিয়ে দাঁড় করিয়ে রিং নিয়ে হাত কুড়ি দূরে খড়ি-কাটা জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়াল। তারপর পরপর তিনটে রিং ছুড়ল লামাটাকে লক্ষ্য করে। লামাটা একবারের জন্য ঘাড় ফেরাল না। তিনটে রিং-ই পরপর জমা হল লামাটার গলায়! বৃদ্ধ হেসে আমাদের উদ্দেশ্যে বলল, 'কী দেখলে তো?'

হার্বাট একটা দশ সোলের নোট বের করে বৃদ্ধর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'প্রথমে আমার বন্ধু খেলবে। তারপর দেখি আমি খেলি কিনা!'

হার্বাটের কথা শুনে আমি মৃদু বিস্মিত হলেও আপত্তি করলাম না। বৃদ্ধ আমার হাতে তিনটে রিং ধরিয়ে দিল। আমি গিয়ে দাঁড়ালাম সেই খড়ি-কাটা জায়গাটাতে।

ঘাড় তুলে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে লামাটা। আমি প্রথম রিংটা ছুড়লাম। লামাটার দু-হাত দূর দিয়ে বেরিয়ে গেল সেটা। দ্বিতীয় রিংটা যত্ন করে ছুড়লাম। সেটা লামাটার গলার আরও ঘনিষ্ঠ হলেও লক্ষ্যভেদ করতে পারলাম না। তৃতীয় রিংটা ছোড়ার আগে আমি বেশ কিছুক্ষণ মনসংযোগ করলাম। আমার হাত থেকে ছুটে গেল রিংটা। এবার কিন্তু নিশ্চিতভাবেই সেটা লামার মাথা দিয়ে গলে যেতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, শেষ মুহূর্তে প্রাণীটা মাথা সরিয়ে নিল। তার ঘাড়ে ধাক্কা খেয়ে রিংটা জমা হল বৃদ্ধের হাতে। দশ সোল গচ্চা গেল!

আমি একটু হতাশ ভাবে তাকালাম হার্বাটের দিকে। দেখি সে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি আবার ফিরে এসে হার্বাটের পাশে দাঁড়ালাম।

বৃদ্ধ এবার হার্বাটকে বলল, 'তুমি এবার খেলবে তো?'

হার্বাট চারপাশে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা এই তাবুর সামনে লামাসমেত যেসব জিনিস আছে তা সব তোমার নিজের তো?'

বৃদ্ধ জবাব দিল, 'হ্যাঁ, সব নিজের। কেন?'

রবার্ট তার ব্যাগের ভিতর হাত ঢুকিয়ে বলল, 'চলো, তবে একটা বড় বাজি খেলা যাক। দশ সোল নয় দশহাজার সোলের খেলা। আমি যদি জিতি তো তোমার সব জিনিস আমার। আর হারলে দশ হাজার সোল তোমার।'

কথাটা শুনে আমার-ই মতো বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল বৃদ্ধ আর এক্সাকুন মেয়েটার মুখে। দশ হাজার সোল!

BanglaBook.org

হার্বাট ব্যাগ থেকে একটা একশো সোলের বান্ডিল বের করে মেলে ধরল বৃদ্ধর সামনে। জানি হার্বাটের অনেক টাকা। কিন্তু সে পাগল হয়ে গেল নাকি? আমি মুহূর্তের মধ্যে বিস্ময়ের ভাব কাটিয়ে উঠে তাকে নিরস্ত করার জন্য বললাম, 'হার্বাট, এ কী করছ তুমি? এত টাকা জুয়ায় বাজি ধরছ?'

হার্বাট আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আরে আমাদের জীবনটাই তো একটা বড় জুয়া। আজ আছি কাল বেঁচে থাকব কিনা কে বলতে পারে? দেখাই যাক না বাজি ধরে কী হয়?'

বৃদ্ধ মনে হয় বুঝে উঠতে পারছিল না কী করবে। কিন্তু হঠাৎ সেই মেয়েটা কয়েক পা এগিয়ে এসে হার্বাটের হাত থেকে টাকার বান্ডিলটা নিয়ে প্রথমে তাকে বলল, 'ঠিক আছে, এ-শর্তে আমরা রাজি।'

দশহাজার সোল মানে অনেকগুলো টাকা। যে মূর্তিগুলো রয়েছে তার মিলিত দাম হাজার সোল হবে কিনা সন্দেহ। কাজেই বৃদ্ধও এবার বলে উঠল, 'ঠিক আছে, আমি রাজি। হারলে আমার যা আছে সব তোমার।'

বাজির শর্ত পাকা হয়ে গেল উভয় তরফে।

৩

বৃদ্ধের হাত থেকে তিনটে রিং নিল হার্বাট। তারপর আমার হাতে তার ব্যাগটা ধরিয়ে দিয়ে গিয়ে দাঁড়াল খড়ি দিয়ে দাগকাটা জায়গাটাতে। আমার বুক ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করতে লাগল। পারবে কি হার্বাট? এতগুলো টাকা!

হার্বাট কিন্তু স্থির অচঞ্চল। একবার সে শুধু তাকাল আমার দিকে, তারপর মনঃসংযোগ করল লামাটার দিকে। প্রাণীটা আবারও গলা তুলে দাঁড়িয়েছে বৃদ্ধর নির্দেশে। বৃদ্ধ হার্বাটকে ইঙ্গিত করল রিংটা ছোড়ার জন্য।

প্রথম রিংটা ছুড়ল হার্বাট। অব্যর্থ লক্ষ্যে যেন সেটা লামার আকাশের দিকে তুলে ধরা মাথা গলে গলায় প্রবেশ করতে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে লামাটা মাথা সরিয়ে নিল। তার লম্বা কণ্ঠদেশে আঘাত করে মাটিতে ছিটকে পড়ল রিংটা। আবছা হাসি যেন ফুটে উঠল সেই পেরুভিয়ান বৃদ্ধ ও এক্লাকুন মেয়েটার ঠোঁটের কোণে। বৃদ্ধ কুড়িয়ে নিল রিংটা। হার্বাট প্রস্তুত হল দ্বিতীয় রিংটা ছোড়ার জন্য।

কিছু সময়ের বিলম্ব। হার্বাট ছুড়ল দ্বিতীয় রিংটা। এ-রিংটা লামাটাকে স্পর্শ

BanglaBook.org

করা তো দূরে থাক, বেশ অনেকটা দূর দিয়ে বেরিয়ে গেল। এত দূর দিয়ে আমার ছোড়া রিংগুলোও কোনওটা যায়নি। গাড়িতে আসার সময় এই সাতসকালেই বেশ কয়েকটা ক্যান্‌ডবিয়ার খেয়েছিল হার্বাট। তবে কি নেশার ঘোরেই বাজিটা সে ধরল! বৃদ্ধের হাসিটা এবার আরও চওড়া হল।

এবার তৃতীয়, অর্থাৎ লাস্ট চান্স। হার্বাট এবার ব্যর্থ হলে দশ হাজার সোল চলে যাবে লোকটা আর মেয়েটার হাতে। যদিও টাকাটা আমার নয়, তবুও উত্তেজনায় যেন হাতুড়ি পেটা শুরু হল আমার বুকে। হার্বাট ধীরে ধীরে রিংটা তুলে ধরল ছোড়ার জন্য। কিন্তু রিংটা ছুড়তে গিয়েও শেষ মুহূর্তে হাতটা নামিয়ে নিল সে। তারপর বৃদ্ধ আর মেয়েটার উদ্দেশ্যে বলল, 'তোমরা লামাটার থেকে দূরে গিয়ে ওই যে স্তম্ভটা আছে পিছনদিকে, ওখানে গিয়ে দাঁড়াও।'

মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে জিগ্যেস করল 'কেন? ওখানে গিয়ে দাঁড়াব কেন?'

হার্বাট অক্লেশে বলল, 'তোমার পোশাকের ভিতর দিয়ে দেখা যাওয়া স্তন আর তোমার সঙ্গী লামাঅলা বৃদ্ধর মুখ আমার মনঃসংযোগের বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, তাই। আশা করি ওখানে দাঁড়ালেও তোমরা দেখতে পাবে যে প্রাণীটার গলায় আমি রিং পরাতে পেরেছি কিনা?'

হার্বাটের কথা শুনেও কিন্তু একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল তারা। তা দেখে হার্বাট ধমকের সুরে বলে উঠল, 'কী হল? আপত্তিটা কোথায় শুনি? বলছি তো সরে যাও ওই স্তম্ভর কাছে। আমার মনঃসংযোগ নষ্ট কোরো না।'

হার্বাটের ধমক খেয়ে বুড়ো আর তরুণীর ঠোঁটের কোণে জেগে থাকা হাসি যেন এবার মিলিয়ে গেল। হার্বাট আবারও চিৎকার করে বলল, 'কী হল? কথা কানে যাচ্ছে না? তবে আমি আর খেলব না। এই মেয়ে, তুমি তোমার বুক দেখিয়ে আর লামাঅলা তুমি তোমার মুখ দেখিয়ে মন সংযোগ নষ্ট করছ আমার। হয় সরে যাও, নইলে আমার টাকা ফেরত দাও। আমি আর বাজি খেলব না।'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমে রক্তিম হয়ে উঠল মেয়েটার মুখ। নিশ্চিতভাবে তার বুক দেখানোর কথাটা শুনেই। বুড়োটার দিকে তাকিয়ে নিজস্ব ভাষায় কী যেন বলল মেয়েটা। তারপর নিতান্ত অনিচ্ছাকৃতভাবেই যেন হার্বাটের নির্দেশ মেনে এগোল লামাটার পিছন দিকে সেই স্তম্ভর দিকে। আমি স্পষ্ট লক্ষ করলাম যে, আবছা হাসি ফুটে উঠেছে হার্বাটের ঠোঁটের কোণে।

এবার তৃতীয় এবং শেষ সুযোগ। হার্বাটের কথা পালন করেছে বুড়ো আর

BanglaBook.org

মেয়েটা। এবার নিষ্ফল হলে হার্বাটের আর কিছু বলার নেই। দশ হাজার সোল গুনাগার দিতে হবে তাকে। উত্তেজনায় আমার হৃৎপিণ্ড যেন ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে বাইরে।

কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। হার্বাটের দৃষ্টি লামাটার দিকে নিবদ্ধ। ধীরে ধীরে রিং ধরা হাতটা মাথার ওপর তুলল হার্বাট। তারপর সেটা ছুড়ে দিল লামাটার গলা লক্ষ্য করে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন আমার সব কিছু চিন্তা, দৃষ্টি লোপ পেয়েছিল। আর তারপর সম্বিত ফিরে পেতেই দেখলাম, লামাটার গলায় ঝুলছে হার্বাটের হাতের রিংটা! হার্বাট জায়গাটা ছেড়ে এগিয়ে আসছে। তার মুখে বিজয়ীর হাসি। বাজি জিতে গেছে সে!

হার্বাট এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধে হাত রাখল। তখনও আমার ঘোর পুরোপুরি কাটেনি। যেন বিশ্বাসই হতে চাইছে না ব্যাপারটা। বুড়োটা আর মেয়েটাও সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের চোখেও বিস্ময়। এমনটা হবে সম্ভবত তা ভাবতে পারেনি কেউ।

কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। তারপর বৃদ্ধ মাথা নীচু করে বলল, 'তুমি জিতে গেছ। টাকা ফেরত দিচ্ছি। আর জিনিসগুলোও নিয়ে যাও।'

এক্লাকুন তার পোশাকের ভিতর থেকে টাকার বান্ডিলটা বের করল।

হার্বাট পেরুভিয়ানের উদ্দেশ্যে বলল, 'টাকা ফেরত দিতে হবে না। আমি শুধু একটা জিনিস-ই নেব।'

'কী জিনিস?' জানতে চাইল বুড়োটা।

একটু চুপ করে থেকে আমাকে বিস্মিত করে হার্বাট জবাব দিল, 'তোমার সঙ্গী এই মেয়েটাকে নেব। তবে শুধু আজকের রাতের জন্য।'

হার্বাটের কথা শুনে বৃদ্ধ আর মেয়েটা আমার মতোই চমকে উঠল। লামাঅলা বলে উঠল, 'এ কী বলছ তুমি?'

হার্বাটের মুখে কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। সে বলল, 'ঠিকই বলছি। তুমি তো বলেছিলে তোমার যা আছে তা বাজি জিতলে সব পাব।'

বৃদ্ধ বলে উঠল, 'হ্যাঁ, আমি তা বলেছিলাম ঠিকই কিন্তু আমার কথার অর্থ এই ছিল না।'

আমি এবার হার্বাটকে থামাবার জন্য বললাম, 'টাকাটা নিয়ে এবার ফিরে চলো হার্বাট। কী হচ্ছে এসব?'

হার্বাট কথাটা শুনে আমাকে ধমকের সুরে বলল, 'তুমি চুপ করো। ইচ্ছা

BanglaBook.org

হলে তুমি চলে যেতে পারো। এই বুড়ো আর এক্কাকুন-সাজা মেয়েটা লোক ঠকায়। আমি ব্যাপারটা ধরে ফেলেছি। বাজি যখন জিতেছি তখন এই মেয়েটাকে আজ রাতের জন্য চাই।

আমি বললাম, 'ওরা লোক ঠকায় মানে?'

হার্বার্ট দৃঢ়ভাবে বলল, 'হ্যাঁ, লোক ঠকাবার কারবার করে এরা। রিংটা গলায় পড়ার উপক্রম হলেই লামাটা মাথা সরায় কেন জানো? লামাটার দৃষ্টি থাকে তার মাথার সঙ্গে সমান্তরালে কিছুটা তফাতে দাঁড়ানো এই এক্কাকুনের ওপর। রিংটা লামাটার গলায় পড়ার সম্ভাবনা হলেই এই মেয়েটা মাথার ওপর দু-হাত তোলে। লোকজনের দৃষ্টি লামা আর যে লোক রিং ছুড়ছে তার ওপর থাকে বলে মেয়েটাকে তেমনভাবে কেউ খেয়াল করে না। আর খেয়াল করলেও মনে হতে পারে যে, মেয়েটা হয়তো উত্তেজনার বশে হাত ওপরে তুলছে।

কিন্তু ওটাই হল আসল সংকেত। ওই সংকেত লক্ষ করেই লামাটা মাথা ঘোরায়। এমন-ই ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে ওকে। ব্যাপারটা আমি ধরে ফেলেছি। ইচ্ছাকৃতভাবেই আমি দ্বিতীয় রিংটা দূরে ছুড়েছিলাম যাতে এদের মনে কোনও সন্দেহ না জাগে সেজন্য। তারপর বুড়ো আর মেয়েটাকে লামাটার পিছনে তার দৃষ্টিশক্তির বাইরে পাঠিয়েছিলাম যাতে তারা কোনও সংকেত করতে না পারে তাই।'

কথাগুলো বলে হার্বার্ট তাকাল লামাওলা আর মেয়েটার দিকে। হার্বার্টের কথাগুলো শুনে বৃদ্ধর লোলচর্ম যেন আরও ঝুলে গেল, আর ফ্যাকাশে হয়ে গেল মেয়েটার মুখটাও। ধরা পড়ে গেছে তারা।

আমি কথাটা শুনে বিস্মিত হলেও আবারও হার্বার্টের উদ্দেশ্যে বললাম, 'যা হবার হল। চলো এবার টাকাটা নিয়ে ফিরে যাই।'

আমার কথার কোনও জবাব দিল না হার্বার্ট। কথাটা পাত্তা দিল বলেও মনে হল না। বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'কী করবে বলো?'

বৃদ্ধ জবাব দিল, 'না, এ হয় না। অসম্ভব। আমার যা অন্য কিছু আছে তুমি নিয়ে যাও।'

হার্বার্ট হেসে বলল, 'ওসব মূর্তি-আবর্জনা নিয়ে আমি কী করব? যা চাচ্ছি তাই দাও। একটা রাতের তো ব্যাপার। কেউ কিছু জানবে না। তাছাড়া টাকাটাও তোমার হবে। এত টাকা জীবনে কামাতে পারবে না তুমি।'

বৃদ্ধ আবারও বলল, 'না, এ সম্ভব নয়।'

কথাটা শুনে রবার্ট হেসে বলে উঠল, 'ঠিক আছে, ব্যাপারটা যখন সম্ভব

BanglaBook.org

নয়, তখন আমি টুরিস্টদের আর এখানকার কর্তৃপক্ষকে জানাব ব্যাপারটা। জানাব কীভাবে বিদেশী টুরিস্টদের ঠকাও তোমরা। ব্যাপারটা সবাই যখন জানতে পারবে তখন তোমার ব্যবসা তো বন্ধ হবেই, তার সঙ্গে সঙ্গে জেলের ঘানিও টানতে হবে।'

হার্বাটের কথাগুলো শুনতে শুনতে স্পষ্ট ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল তাদের মুখে। চুপ করে রইল তারা।

দূর থেকে একদল টুরিস্ট এগিয়ে আসছিল। তাদের দেখিয়ে হার্বাট বৃদ্ধকে বলল, 'তোমরা যখন রাজি নও তখন ওই ট্যুরিস্টদলটাকে দিয়েই আমার কাজটা শুরু করা যাক?'

এক্লাকুন মেয়েটা এবার তাদের নিজস্ব ভাষায় কী যেন বলল বৃদ্ধের উদ্দেশ্যে। তারপর হার্বাটকে বলল, 'ওসবের কোনও দরকার নেই। তুমি কোন হোটেলে উঠেছ?'

হার্বাট বিজয়ীর হাসি হেসে বলল, 'হোটেল সান টেম্পল।'

মেয়েটা জবাব দিল, 'ঠিক আছে, রাত দশটায় আমি যাব সেখানে। তবে হোটেলে ব্যাপারটা হবে না। আমি অন্য জায়গাতে নিয়ে যাব তোমাকে। হোটেলে পুলিশের ভয় আছে। এসব ব্যাপারে এখানকার আইন খুব কড়া। একসঙ্গে ধরা পড়লে দুজনেরই জেল হবে।'

হার্বাট বলল, 'আচ্ছা, তবে তাই হবে। তোমার জন্য অপেক্ষা করব। তবে আমরা বিদেশী বলে চালাকি করার চেষ্টা কোরোনা। তাতে বিপদ হবে তোমাদের।'

ট্যুরিস্টদের দলটা কাছে এসে পড়েছে। মেয়েটা আর সময় নষ্ট না করে বলল, 'নিশ্চিন্তে থাকো, আমরা পালাব না। এ জায়গা ছেড়ে আর অন্য কোথাও যাবার জায়গা নেই আমাদের।'

বুড়ো লামাঅলাটা শুধু একবার মাথা নীচু করে আক্ষেপের স্বরে বলল, 'তোমরা শ্বেতাঙ্গরা যুগ যুগ ধরে আর কত অপমান করবে আমাদের?' —বৃদ্ধ যেন কিছুতেই মানতে পারছে না ব্যাপারটা।

হার্বাট কিন্তু গায়ে মাখল না বৃদ্ধের কথা। এক্লাকুন সুন্দরীর দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'মনে থাকে যেন। আমি তোমার প্রতীক্ষায় রইলাম।'

মাথা নাড়িয়ে বিষণ্ণভাবে হার্বাটের কথায় সম্মতি জানাল মেয়েটা।

ট্যুরিস্টের দলটা খুব কাছে এসে পড়েছে। তাই এবার আমরা এগোলাম। অন্য দিকে। একটা ফাঁকা জায়গাতে পৌঁছে আমি বেশ উষ্মা প্রকাশ করে বললাম, 'কাজটা তুমি ঠিক করছ না হার্বাট। অচেনা জায়গা। বিপদ হতে পারে।

BanglaBook.org

তাছাড়া অমন অল্পবয়েসি কুমারী মেয়ে...।'

হার্বাট কথাটা শুনে হেসে বলল, 'ভার্জিন গার্ল বলেই তো বেশি পছন্দ আমার। দেখো 'রয়', তোমাদের ইন্ডিয়ানদের মতো সেক্স নিয়ে কোনও ট্যাবু নেই আমাদের। জীবন একটাই। তাকে উপভোগ করতে শিখেছি আমরা। এই যে নিজের দেশ থেকে এতদূর এসেছি, তা তো কেবল টাকা কামাবার জন্যই। আর আমি টাকা কামাই জাগতিক সুখ ভোগ করার জন্য। আর তার সর্বপ্রধান বিষয় হল নারীসঙ্গ—নারীদেহ। অপছন্দ হলে তুমি আমাকে ত্যাগ করতে পারো।'

কথাটা শুনে আমার হার্বাটের ওপর বিতৃষ্ণা জন্মালেও আমি আর এ-প্রসঙ্গে একটা কথাও তাকে বললাম না। ঘটনাচক্রে আমরা এ-জায়গায় একসঙ্গে বেড়াতে এসেছি বটে, কিন্তু হার্বাট আমার কেউ হয় না। এ ব্যাপারটা একান্তই তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। ভালো-মন্দ যা-ই হোক, তার দায়ভার হার্বাটের ওপরই বর্তাবে।

যদিও বেলা দুপুর, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য ঢেকে গেল মেঘের আড়ালে। জোর বৃষ্টি শুরু হবে মনে করে আমরা নীচে নামতে শুরু করলাম, হোটেলে ফেরার জন্য।

৪

মাঝদুপুরে হোটেলে ফিরে এসেছিলাম আমরা। তারপরই বৃষ্টি নামল। ছোট হোটেল। রাস্তার ধারেই পাশাপাশি দুটো ঘর বরাদ্দ আমাদের জন্য। কাচের জানলার পাল্লা খুললেই পাহাড়ের থাকগুলো আর তার গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন স্থাপত্যচিহ্নগুলো নীচ থেকে দেখা যায়। দুপুরের খাওয়া সেরে আমি জানলার ধারে বসলাম। বৃষ্টিস্নাত পাহাড়গুলো খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। পাহাড়ের ঢালগুলো আরও বেশি সবুজ মনে হচ্ছে। আবার যখন কালো মেঘ এসে সূর্যকে ঢেকে দিচ্ছে তখন সবকিছু অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে থেকে।

শেষ বিকেলে অবশ্য কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টি থামল। দিনের শেষ আলো এসে রাঙিয়ে দিল পাহাড়ের থাকগুলোতে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন স্থাপত্যগুলোকে। সে এক অপরূপ দৃশ্য! তবে এসব কিছুর মধ্যেই আমার মাঝে মাঝে মনে পড়ছিল হার্বাটের বাজির ব্যাপারটা।

সন্ধ্যার কিছু আগে হার্বাট আমার ঘরে এল। সঙ্গে বেশ বড় একটা হুইস্কির

BanglaBook.org

বোতল। আমার উদ্দেশ্যে সে বলল, 'কয়েক ঘণ্টা বেশ ভালো করে ঘুমিয়ে নিলাম। রাতে অভিসারে বেরোতে হবে তো তাই। চলো ব্যাপারটা সেলিব্রেট করা যাক।'

আমি শুধু বললাম, 'তাহলে তুমি যাচ্ছই!'

টেবিলের সামনে বসে মদের বোতলটা খুলতে খুলতে হার্বাট হেসে বলল, 'যাব। যাব না কেন? জীবন তো একটাই। এবং তা উপভোগ করার জন্যই। এই যে আমরা এখন মুখোমুখি বসে আছি, কিন্তু কে বলতে পারে হয়তো কাল আমাদের দুজনের মধ্যে একজন হয়তো পৃথিবীতেই নেই! যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ জীবনটাকে উপভোগ করা দরকার। আমার জীবনদর্শন এটাই এবং আমি মনে করি সবার ক্ষেত্রে এটাই জীবনদর্শন হওয়া উচিত।'

আমি আর এ-প্রসঙ্গে হার্বাটের সঙ্গে বিতর্কে গেলাম না।

বোতলটা খোলা হল। দুটো গ্লাসে মদ ঢালা হল। পান শুরু করলাম আমরা। বাইরে তখন অন্ধকার নামতে শুরু করেছে, ধীরে ধীরে চোখের সামনে হারিয়ে যেতে লাগল সবকিছু। চুপচাপ বসে গ্লাসে চুমুক দিতে লাগলাম আমরা।

সময় এগিয়ে চলল। নিকষ কালো অন্ধকারের পর আবছা একটা চাঁদও দেখা গেল। মেঘে ঢাকা চাঁদ। আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে টিপ টিপ করে। আমি তিন পেগ মদ খাবার পরই মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করতে লাগল, ঘুম পেতে লাগল। বেশ কড়া হুইস্কি। হার্বাট মনে হয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল, 'তুমি শুয়ে পড়ো। তোমার তো আর জেগে থাকার তাড়া নেই।' কথাটা বলে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে গ্লাসে আর এক পেগ মদ ঢালল হার্বাট। আর, আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পাশের বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম নেমে এল আমার চোখে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলাম আমি। পাহাড়ের ঢালে ইনকাদের স্বর্ণনগরীতে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি। ঘুরতে ঘুরতে একটা মন্দিরের সামনে উপস্থিত হলাম। তার স্তম্ভ, চূড়া সব কিছু সোনায় মোড়া। সে মন্দিরে প্রবেশ করলাম আমি। সোনায় মোড়া কক্ষ-অলিন্দ অতিক্রম করে অবশেষে প্রবেশ করলাম এক কক্ষে। সেখানে আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল এক নারী। আমার পায়ের শব্দে ফিরে তাকাল সে। তার পরনে লম্বা ঝুলের রংচঙে পোশাক, সঙ্গে স্বর্ণ আভূষণ, চুলগুলো মাথার সামনে সোনার সুতোয় বোনা ফিতে দিয়ে বাঁধা। আমার দৃষ্টি আটকে গেল তার বুকের কাছে। মসৃণ পোশাকের ভিতর থেকে যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে তার শঙ্খের মতো স্তনযুগল। কিন্তু আমাকে দেখেই যেন সেই সুন্দরীর চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

BanglaBook.org

সে বলল, 'একি, তুমি এক্লাকুন মন্দিরে প্রবেশ করেছ কেন? জানো না এ-মন্দিরে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ?'

ততক্ষণে সেই যুবতীর স্তনদুটো যেন আমাকে মোহাবিষ্ট করে ফেলেছে। আমি জবাব দিলাম, 'এখানে না এলে কি তোমার মতো সুন্দরীকে দেখতে পেতাম?'

কথাটা শুনেই রাগে কাঁপতে লাগল সেই এক্লাকুন। তারপর সে বলল, 'তুই এক্লাকুনকে দর্শন করলি। বাজে চিন্তা করলি, তুই ধ্বংস হ, ধ্বংস হ। বজ্রপাত হোক তোর মাথায়।'

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড জোরে বজ্রপাতের শব্দে কেঁপে উঠল চারপাশ! কিসের ঝনঝন শব্দ শোনা গেল তার সঙ্গে! এ পর্যন্ত স্বপ্নটা দেখেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানায় উঠে বসে আমি দেখলাম জানলার কাচের শার্শিটা সত্যি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে! মুহুর্মুহু বাজ পড়ছে বাইরে। কেঁপে উঠছে ঘরটা। বাজের শব্দের আঘাতেই সম্ভবত ভেঙেছে জানলার কাচটা।

আমার চোখ পড়ল টেবিলের ওপর রাখা বোতলটার দিকে। বোতলটা পুরো খালি! হার্বাট গেল কোথায়? তার পরই আমার কেন জানি না চোখ চলে গেল জানলার বাইরে। ঠিক সেই সময় আকাশে বিদ্যুতের ঝলক দেখা গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্য দৃশ্যমান হল বাইরেটা। দেখলাম সামনের ঢাল বেয়ে পাহাড়ের ওপর দিয়ে উঠতে শুরু করেছে দুটো অবয়ব। একজন নারী আর তার কিছুটা তফাতে একজন পুরুষ। আমার বিন্দুমাত্র বুঝতে অসুবিধা হল না তারা কারা? সেই এক্লাকুন-সাজা নারী আর হার্বাট!

আর এর পরই আমার বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। এই দুর্যোগের রাতে হার্বাট এই অচেনা জায়গাতে নৈশ অভিযানে বেরোল, তার কিছু হবে না তো? আর কিছু না হোক ভেজা পাহাড়ের ঢালে পা পিছলেও তো দুর্ঘটনা হতে পারে? হার্বাট প্রচুর পরিমাণে মদ গিলেছে। সে এখন সুস্থ অবস্থায় নেই।

আবার একবার বিদ্যুতের চমক হল। আমি আবার তাদের দেখতে পেলাম। ঢাল বেয়ে বেশ অনেকটা ওপরে উঠে প্রাচীন নগরীর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রবেশ করতে চলেছে তারা!

মুহূর্তের মধ্যে আমি আমার কর্তব্য ঠিক করে নিলাম। থামাতে হবে হার্বাটকে। মদ আর যৌনতার নেশায় কাণ্ডজ্ঞান সম্ভবত লোপ পেয়েছে। তেমন হলে হোটেলেই ফিরিয়ে আনতে হবে দুজনকে। এই দুর্যোগের রাতে নিশ্চয়ই পুলিশ হানা দেবে না হোটেলে। খাট ছেড়ে লাফিয়ে নামলাম আমি। আর

BanglaBook.org

মিনিট খানেকের মধ্যেই হোটেলের বাইরে বেরিয়ে ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলাম।

বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। কড় কড় শব্দে বাজ পড়ছে। ঢাল বেয়ে আমি প্রথমে প্রাচীন নগরীর চাতালে উঠে এলাম। বিদ্যুতের ঝলকে মুহূর্তের জন্য দৃশ্যমান হচ্ছে আশেপাশে পাথুরে ধাপের গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন কাঠামোগুলো, পরক্ষণেই আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সব কিছু। সেই বিদ্যুৎ চমকের আলোতেই বেশ অনেকটা দূরে একটা ঢাল বেয়ে এক্লাকুন আর হার্বাটকে এগোতে দেখলাম। আমি চিৎকার করে উঠলাম—'হার্বাট কোথায় যাচ্ছ? থামো।'

কিন্তু বাজের শব্দে আমার কণ্ঠস্বর ঢাকা পড়ে গেল। আমি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে লাগলাম তাদের। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকে হয়তো তাদের দেখা যাচ্ছে, আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তারা। আমি কোন দিকে যাচ্ছি তা বুঝতে পারছি না, শুধু এ-ধাপ ও-ধাপ অতিক্রম করে অনুসরণ করে চলেছি তাদের। কত পাথুরে চত্বর, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ অতিক্রম করে চলছি তা খেয়াল নেই। মাঝে মাঝে বৃষ্টির জলে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে চোখ, বধির হয়ে যাচ্ছে কান। তবু তাদের অনুসরণ করে চলেছি আমি।

অবশেষে এসে উপস্থিত হলাম পাহাড়ের একটা প্রশস্ত ধাপে। বিশাল একটা পাথুরে চত্বর। আর তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট একটা প্রাচীন কাঠামো। তবে সেটা ছাদহীন নয়, মোটামুটি এখনও সে তার অবয়বটাকে ধরে রেখেছে। গঠন দেখে মনে হচ্ছে, হয়তো বা সেটা কোনও মন্দির ছিল।

বিদ্যুতের চমক অব্যাহত। আর সেই আলোতেই আমি দেখতে পেলাম হার্বাটকে। কাঠামোটার প্রবেশমুখে দাঁড়িয়ে আছে সে। মেয়েটাকে দেখতে পেলাম না। সম্ভবত সে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করেছে। আমি তাকে দেখামাত্রই চিৎকার করে উঠলাম 'হার্বাট দাঁড়াও' বলে। কিন্তু হার্বাট আমার কথা হয়তো শুনতে পেল না। অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে সে প্রবেশ করল।

অগত্যা আমিও এগোলাম সেদিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রবল বৃষ্টি শুরু হল। মুষলধারে বৃষ্টি। আর তার সঙ্গে সঙ্গে বাজের শব্দে থরথর করে কাঁপতে লাগল চারদিক। তারই মধ্যে নিরুপায় হয়ে মন্দিরের দিকে এগোলাম। কিছুটা এগিয়ে একটা বাঁধা পেলাম। মন্দিরের সামনের অংশটা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। কোনও রকমে তার ফাঁক গলে আমি মন্দিরের প্রবেশতোরণের সামনে এসে দাঁড়ালাম, ঠিক যে-জায়গাতে কিছুক্ষণ আগে দাঁড়িয়েছিল হার্বাট।

পাথুরে কাঠামোটার ভিতর খেলা করছে জমাট বাঁধা অন্ধকার। একটু ইতস্তত করে আমি প্রবেশ করলাম তার ভিতরে। মুহুর্মুহু বাজের শব্দে কেঁপে

BanglaBook.org

উঠছে প্রাচীন কাঠামোটা। কোনও স্তম্ভ বা পাথর খসে পড়লেই মৃত্যু নিশ্চিত। মাঝে মাঝে হয়তো বিদ্যুতের আলো দেওয়াল-ছাদের ফাটল বা উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়ে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করছে। সেই আলোতে চোখে পড়ছে দেওয়াল বা স্তম্ভর গায়ে খোদিত বিভিন্ন প্রাচীন মূর্তি। হ্যাঁ, সম্ভবত এটা মন্দির ছিল। কাঠামোটার ভিতর প্রবেশ করে একটা জিনিস অনুভব করলাম আমি। মন্দিরের ভিতরে বাতাসটা যেন ভারী। শ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে। হার্বাটের নাম ধরে মাঝে মাঝে ডাকতে ডাকতে অন্ধকার হাতড়ে এগোতে লাগলাম। কিন্তু হার্বাটের কোনও সাড়া পেলাম না। শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে আমার, গলাটা যেন ফুলে উঠছে, ব্যথাও শুরু হয়েছে। মন্দিরের বাইরে বেরোতে হবে আমাকে। উন্মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিতে হবে।—এ-ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আবার বাইরে বেরোতে যাচ্ছিলাম আমি।

ঠিক তখনই বিদ্যুতের আলোতে সামনের ঘরটার ভিতর একটা জিনিস চোখে পড়াতে আমি থমকে দাঁড়ালাম। বেশ বড় ঘরটার চারপাশে বেশ কয়েকটা প্রবেশমুখ আছে। খোলা জানলা আছে। তা দিয়ে বিদ্যুতের ঝলক বাইরে থেকে প্রবেশ করে আলোকিত করে তুলছে ঘরটাকে। বাইরে প্রতিমুহূর্তেই বিদ্যুৎ ঝলকে উঠছে। আর সেই আলোতে আমি দেখলাম ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা নীচু বেদির ওপর হাঁটুমুড়ে উবু হয়ে বসে আছে সেই এক্কাকুন নারী। তার থুতনিটা হাঁটুর ওপর রাখা। চোখে পাতাগুলো আর ঠোঁটদুটো মৃদু মৃদু কাঁপছে বিদ্যুতের ঝলকে। নাকের পাটা ফুলে উঠছে মাঝে মাঝে।

আর এরপরই আমি দেখতে পেলাম হার্বাটকে। অন্য দিক থেকে ঘরে প্রবেশ করল সে। আমি ডাকতে গেলাম হার্বাটকে। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। কেউ যেন টিপে ধরে আছে আমার গলাটা। আমি তাকিয়ে রইলাম ঘরের ভিতর। ঈষৎ টলতে টলতে হার্বাট এগোচ্ছে সেই নারীর দিকে। বিদ্যুতের ঝলকে তার চোখে-মুখে স্পষ্ট জেগে উঠেছে কামার্ত ভাব।

হার্বাট এসে দাঁড়াল সেই নারীর সামনে। এবার থরথর করে কেঁপে উঠল সেই নারী। হার্বাট একটু ঝুঁকে প্রথমে দু-হাত দিয়ে তার কাঁধ স্পর্শ করল। তারপর ধীরে ধীরে তার ঠোঁট নামিয়ে আনতে লাগল এক্কাকুনের ঠোঁটের ওপর।

হার্বাট এক্কাকুনের ঠোঁটে ঠোঁট স্পর্শকরা মাত্রই বেশ কয়েকবার একসঙ্গে বিদ্যুতের ঝলক দেখা দিল। বাজের প্রচণ্ড গর্জনে থরথর করে কেঁপে উঠল কাঠামোটা। আর তার পরক্ষণেই সে সেই নারীদেহ ছেড়ে ছিটকে দাঁড়িয়ে

BanglaBook.org

উঠে আতঙ্কিতভাবে চিৎকার করে উঠল, 'মমি! মমি!' তারপর সে ছুটে বেরিয়ে গেল সে-ঘর ছেড়ে। তার আর্তনাদ মন্দিরের ভিতর হারিয়ে যেতে লাগল বাজের শব্দের সঙ্গে।

কিন্তু ওই নারী যদি সত্যি এক্লাকুন মমি হয়ে থাকে তবে সে কী করে জীবন্ত হয়ে উঠল? বিদ্যুতের প্রত্যেকটা ঝলকের সঙ্গে আমি যে এখনও দেখতে পাচ্ছি তার চোখের তারা, ঠোঁট কাঁপছে! ফুলে উঠছে নাকের পাটা! তাহলে কি এক্লাকুন মমি সত্যিই জীবন্ত হয়ে ওঠে? আতঙ্কে হিম হয়ে গেলাম আমি। আমার যেন মনে হল, এবার সে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে আমার দিকে!

আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না আমি। মন্দিরের বাইরে যাবার জন্য ছুটতে শুরু করলাম। ভাগ্য হয়তো আমার সঙ্গী হয়েছিল, তাই বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি। চত্বরটা অতিক্রম করে কাঁটাতারের বাইরে এসে শেষবারের জন্য মন্দিরটার দিকে তাকিয়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। এক অপার্থিব ভৌতিক সবুজ কুয়াশার চাদর যেন গ্রাস করে নিচ্ছে প্রাচীন কাঠামোটাকে।

একবার সেদিকে তাকিয়ে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে আবার ছুটতে লাগলাম। কিন্তু কিছুটা এগিয়েই আমাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। বিদ্যুতের আলোতে দেখলাম আমার রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে সেই এক্লাকুন নারী! তার ঠোঁটের কোণে জেগে আছে বিদ্রূপের হাসি! তাহলে কি এই জীবন্ত মমি আমাকে পালাতে দেবে না? প্রচণ্ড আতঙ্কে আমার হাত-পা অবসন্ন হয়ে আসতে লাগল। মাটিতে পড়ে গেলাম আমি।

BanglaBook.org

৫

পাথুরে একটা জমিতে বসেছিলাম আমি। আমাকে ঘিরে বেশ কয়েকজন লোক। এই মনুমেন্টের কিউরেটর আর কয়েকজন পুলিশ কর্মী। কিছুক্ষণ আগে আমার জ্ঞান ফিরেছে এদের চেষ্টাতেই। তারপর তারা আমাকে ধরাধরি করে এনে বসিয়েছে এখানে। বৃষ্টি কখন থেমে গেছে জানি না। রৌদ্রকরোজ্জ্বল মেঘমুক্ত আকাশ এখন। সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে সবুজ পাহাড়ের থাক গুলোতে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন স্থাপত্যগুলোর গায়ে। সুন্দর সকাল।

আমি যেখানে বসে আছি তার কিছুটা তফাতে কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশে সেই পাথুরে চত্বর আর তার শেষপ্রান্তে সকালের সূর্যালোকে দাঁড়িয়ে আছে

প্রাচীন সেই কাঠামো বা মন্দিরটা। আমার চোখ গেল সেই প্রাচীন মন্দিরের প্রবেশতোরণের ঠিক বাইরে মাটিতে পড়ে থাকা একটা দেহের ওপর। তার পোশাকের রং দেখে আমি বুঝতে পারলাম সে কে। হার্বার্টের দেহ। শেষ পর্যন্ত মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে এলেও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে সে।

ধীরে ধীরে আমি উঠে দাঁড়ালাম। কাঁটাতারের ওপাশে মন্দিরের সামনে পড়ে থাকা দেহটার দিকে দূর থেকে তাকিয়ে কিউরেটর ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, 'উনি কি আপনার সঙ্গী ছিলেন?'

আমি জবাব দিলাম 'হ্যাঁ। আমরা একই কোম্পানিতে চাকরি করি। একটা কনফারেন্সে এসেছিলাম এখানে লিমাতে। তারপর গতকাল মাচুপিচু বেড়াতে এসেছিলাম। কাল রাতে মন্দিরে ঢুকেছিলাম।'

লোকটা প্রশ্ন করল, 'কিন্তু কেন? কীভাবেই বা আপনারা এখানে এলেন?'

সত্যি জবাবটা দিলে মৃত মানুষের ওপর কলঙ্ক লেপন করা হবে। তাই আমি বললাম—'হার্বার্ট বৃষ্টির মধ্যে রাতে ঘর ছেড়েছিল। তাকে অনুসরণ করে আমি মন্দিরে প্রবেশ করি। ঘরের মধ্যে একটা এক্লাকুন মমি রাখা ছিল। সে জীবন্ত। হার্বার্ট তাকে স্পর্শ করেই ভয় পেয়ে গেল। আমিও ভয় পেয়ে গেলাম। আমি পালাতে পারলাম কিন্তু সে পারল না...'

একজন পুলিশ কর্মী বলে উঠল, 'ব্যাড লাক। কেন যে লোকটা মন্দিরে প্রবেশ করতে গেল? ছুঁতে গেল মমিটাকে? ওই এক্লাকুন মমিটা আছে বলেই আমরা কোনও টুরিস্টকে প্রবেশ করতে দিই না ওখানে। কাঁটা তার দিয়ে ঘিরে রেখেছি জায়গাটা। তবু দুর্ঘটনাটা ঘটলই।

আমি বলে উঠলাম, 'তবে কি এক্লাকুন মমি সত্যি জীবন্ত হয়ে ওঠে? আমি তাকে নড়তে দেখেছি। তার চোখের পাতা, ঠোঁট নড়ছিল! কেঁপে উঠেছিল তার শরীর!'

কিউরেটর ভদ্রলোক বলল, 'হ্যাঁ, অনেকেই অমন দেখেছে ঝড়বাদলের রাতে। তবে ওটা বিদ্যুতের আলোতে দৃষ্টি বিভ্রম। বাজের গর্জনে চারপাশের সব কিছুর সঙ্গে মমিটাও কেঁপে ওঠে। পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারনে অতিবড় যুক্তিবাদীও তা দেখে ভয় পেয়ে যায়।'

আমি বললাম, 'তবে হার্বার্ট মারা গেল কেন?'

জবাব এল, 'সে মমিটাকে ছুঁয়েছিল বলে। তীব্র বিষের ভাণ্ডার ওই এক্লাকুন মমির দেহ। জীবিত অবস্থায় এক্লাকুন রমণীদের কেউ স্পর্শ করতে পারত না। মৃত্যুর পরও যাতে তাদের কেউ স্পর্শ না করতে পারে সে জন্য তীব্র বিষ মাখিয়ে রাখা হত এক্লাকুন মমির শরীরে। হাজার বছর পরও সেই বিষ

BanglaBook.org

অতিমাত্রায় সক্রিয়। ছুঁলেই মৃত্যু। যে কারণে মিউজিয়ামে রাখা হয় না এক্লাকুন মমি। এ মমি স্পর্শ করে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে।'

আমি বলে উঠলাম, 'কিন্তু ওই সবুজাভ ভৌতিক কুয়াশা? যা গ্রাস করে নিচ্ছিল মন্দিরটাকে?'

লোকটা জবাব দিল 'হ্যাঁ, ওই অদ্ভুত কুয়াশার জন্যও মন্দিরে প্রবেশ করে অনেকের মৃত্যু হয়। আসলে বর্ষার জল চুঁইয়ে মন্দিরের নীচে পৌঁছে কোনও রাসায়নিক উপাদানের সঙ্গে মেশে। যার ফলে হলদেটে সবুজ ক্লোরিন গ্যাস সৃষ্টি হয়। বিষাক্ত সেই মারণ গ্যাসই ওই কুয়াশার সৃষ্টি করে। এক্লাকুন মমিকে স্পর্শ না করলেও ঝড়বাদলের রাতে ওই মন্দিরের ভিতর কেউ বেশীক্ষণ থাকলে মৃত্যু অবধারিত। এই গ্যাসের কারণেও মৃত্যু হয়েছে অনেকের।'

লোকগুলোর কথাবার্তা শুনে এবার ধীরে ধীরে আমার কাছে স্পষ্ট হতে শুরু করল ব্যাপারটা। তবে কি লামাঅলার সেই সঙ্গীনি এক্লাকুন-সাজা নারী কৌশলে হার্বাটকে শাস্তি দেবার জন্য তাকে মন্দিরে প্রবেশ করিয়ে নিজে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল? পালাবার সময় তাকেই কি দেখে আমি ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম?

একজন পুলিশ কর্মী এরপর বলল, 'আমাদের লোক আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দিচ্ছে। আপাতত আপনি সেখানে গিয়ে বিশ্রাম নিন। লাশটা উঠিয়ে নেবার ব্যবস্থা করার পর আমরা আবার যাব আপনার কাছে।'

এর পর আমি অন্য একজন পুলিশকর্মীর সঙ্গে রওনা হলাম নীচে ফেরার জন্য।

ফেরার পথে হঠাৎ-ই রাস্তার পাশে একটা চাতালে ছোটখাটো ভিড় চোখে পড়ল আমার। সেই তাঁবুটা। আর তার সামনে লামটাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই বৃদ্ধ আর তার সঙ্গীনি সেই এক্লাকুন সুন্দরী। মুহূর্তের জন্য যেন তার সঙ্গে চোখাচোখি হল আমার। আমাকে সে চিনতে পারল। এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটের কোণে। বিদ্রূপের হাসি।

আমি তার মুখ বা বুক, আর কোনও কিছুর দিকে না তাকিয়ে দ্রুত নীচে ফেরার পথ ধরলাম।

BanglaBook.org

মেডুসার মুক্তো

'নিক্সন পার্ল কোম্পানি'-র মালিক মোটাসোটা গোলগাল চেহারার নিক্সন সাহেব তাঁর সোনার চশমাটার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে মৃগাঙ্ককে বললেন, 'আমেরিকাতে আমি প্রায় তিরিশবছর ধরে পার্ল জুয়েলারির ব্যবসা করছি তা আপনি আমাদের একজন দায়িত্বশীল কর্মী হিসেবে জানেন। জাপান, সিংহল, পারস্য অর্থাৎ ইরাকের বসর ও অস্ট্রেলিয়া থেকে আমরা মুক্তো সংগ্রহ করি এবং এদেশে ব্যবসা করি। আমাদের কোম্পানির তরুণ প্রতিনিধি হিসাবে আপনাকেও বেশ কয়েকবার যেতে হয়েছিল ওসব জায়গাতে। এবং আপনি দক্ষতার সঙ্গে কোম্পানির দায়িত্ব পালন করেছেন তাই তো?'

BanglaBook.org

মৃগাঙ্ক প্রায় দশবছর কাজ করছে ফ্লোরিডার এই জুয়েলারি কোম্পানিতে। নিষ্ঠার সঙ্গেই সে কোম্পানির কাজের দায়িত্ব পালন করে আসছে। মালিকের কথা শুনে সে বিনীতভাবে বলল, 'দক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছি কিনা জানি না তবে আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করি আমার কর্তব্য পালন করতে।'

নিক্সন মনে হয় খুশি হলেন মৃগাঙ্কর কথা শুনে। নাকের ডগা থেকে চশমাটা একটু ওপরে তুলে নিয়ে মৃদু হেসে তিনি বললেন, 'ইয়ং-ম্যান, সেজন্যই আপনাকে একটা বিশেষ দায়িত্ব দিতে চাই আমি।'

মৃগাঙ্ক জানতে চাইল, 'কী দায়িত্ব?'

নিক্সন তার প্রশ্নের জবাবে একটা পোস্টকার্ড আকারের ফটোগ্রাফ বাড়িয়ে দিলেন মৃগাঙ্কর দিকে। মৃগাঙ্ক ছবিটা হাতে নিয়ে তাকাল সেটার দিকে। ক্যামেরায় তোলা ছবি। বিচিত্র সাজে সজ্জিত এক মহিলার ছবি। তার পোশাক দেখে মৃগাঙ্কর মনে হল, সে আমেরিকা মহাদেশের কোনও নেটিভ মহিলা হবে। মানে যারা এ-মহাদেশের আদি বাসিন্দা। মেয়ে বা সেই মহিলার কোমর থেকে উরু পর্যন্ত পশুচর্মের আবরণে ঢাকা, ঊর্দ্ধাঙ্গেও পশুচর্মের বক্ষআবরণী। দুই হাত ও দুই পায়ে মোটা ভারী ধাতুর বালা, গলায় ধাতুর কণ্ঠ বন্ধনী। মাথায় একটা অদ্ভুত মুকুট, বাঁকানো দাঁত বেরিয়ে আছে তার থেকে। ভালো করে দেখলে বোঝা যায়, আসলে একটা হাঙরের দাঁতসুদ্ধ চোয়াল মুকুট হিসেবে পরা আছে তার মাথায়। তাতে আবার দুটো বড়বড় রঙিন পালক গোঁজা। যেমন পালক ব্যবহার করে রেডইন্ডিয়ানরা।

তবে তার সাজ-পোশাকের মধ্যে যে-জিনিসটা মৃগাঙ্কর সব থেকে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করল তা হল তার গলার হারের ছরা। নিটোল গোল গোল সাদা পিংপং বলের মতো দেখতে জিনিসগুলো সুতোয় গেঁথে বানানো হয়েছে মালাটা। বলের মতো জিনিসগুলোর একটা ঔজ্জ্বল্য আছে, ঠিক যেমন মুক্তোর হয়! কিন্তু মুক্তো কী এত বড় হয়? নাকি ওগুলো পাথরের বল?'

নিক্সন বললেন, 'ছবিটার দিকে তাকিয়ে আপনি কী চিন্তা করছেন আমি জানি। আপনার কৌতূহল নিরসনের জন্য বলি, আপনি ছবিটার যে জিনিসটা দেখে সেটা কী হতে পারে ভাবছেন, সেটা হল আসলে পার্ল—মুক্তো। অন্তত প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ তাই বলছে।'

BanglaBook.org

এই নিক্সন পার্ল কোম্পানিতে চাকরি করার সুবাদে ছোট-বড় নানা মুক্তো দেখার সৌভাগ্য মৃগাঙ্করও হয়েছে। তা বলে এত বড় মুক্তো? বিস্মিতভাবে মৃগাঙ্ক তাকাল নিক্সনের দিকে।

নিক্সন এরপর বললেন, 'আমি এ-ব্যবসা করতে গিয়ে নানা দুর্লভ মুক্তোর কথা শুনেছি, দেখেছি। যেমন মিশরসম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা নাকি দুষ্প্রাপ্য নীল মুক্তোর মালা পড়তেন। স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের কাছে নাকি পায়রার ডিমের মতো মুক্তো ছিল, সেসব আমি চোখে না দেখলেও পর্তুগালের মিউজিয়ামে রাখা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মুক্তো আমি দেখেছি যা একমাত্র আকারে ওই নেটিভ আমেরিকান রমনীর মুক্তোগুলোর সমান। কাজেই ওই আকারের মুক্তো অতি দুর্লভ হলেও অসম্ভব নয়। ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে কলম্বাস যখন প্রথম এই দ্বীপে যান তখনও তার বিবরণে এই আরাওয়াক নেটিভ আমেরিকান রমণীদের কণ্ঠসজ্জায় এই বিরাট বিরাট মুক্তো দেখার কথা উল্লেখ আছে। এরপর স্পেনীয় দখলদার, ফরাসি জলদস্যুরাও ওই মুক্তো দেখেছে বলে তাদের বিবরণে দাবী করে।'

এই পর্যন্ত বলে তিনি একটু থামলেন তারপর আবার বললেন, 'তবে আপনার হাতে যে ছবিটা আছে সেটা সাম্প্রতিক তোলা। গতবছর ঘটনাচক্রে ইউনেস্কোর এক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন আরাওয়াক নেটিভদের উৎসবের দিনে। ইউনেস্কো থেকে ঘোষিত সংরক্ষিত জনজাতি আরাওয়াকদের দেখতে গেছিলেন তিনি। কলম্বাস যখন সে দ্বীপ আবিষ্কার করেন তখন সেখানকার একমাত্র অধিবাসী ছিল এই আরাওয়াকরাই। স্পেনীয়রা আরওয়াকদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এখন সেখানে আফ্রিকানদের বংশধররাই, কালো মানুষরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। খুব সামান্য আরওয়াক সেখানে টিকে আছে।

যাই হোক ইউনেস্কোর প্রতিনিধি লুথার কিং নামের ভদ্রলোক বেশ কিছুদিন ছিলেন ওখানে, এবং অসংখ্য ছবি তোলেন। এ-ছবি তারই একটা। ভদ্রলোকের অবশ্য খুব একটা আগ্রহ নেই এসব ব্যাপারে। হয়তো এ ব্যাপারে জানা নেই বলেই তার আগ্রহ নেই। কিন্তু এ ছবি দেখে ব্যাপারটা সম্বন্ধে আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছে আমার মনে। এবং আমার ব্যবসার কারণেই আগ্রহটা বেশ প্রবল। ঘটনাচক্রে ছবিটা দেখার পর আমি যোগাযোগ করেছিলাম লুথার নামের ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনিও আমাদের এই ইউ

BanglaBook.org

এস-এ তে ফ্লোরিডায় থাকেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমার ব্যাপারটা সম্বন্ধে আগ্রহ আরও বেড়েছে।'

এ পর্যন্ত শুনে মৃগাঙ্ক প্রশ্ন করল, 'আপনি যে-জায়গার কথা বলে চলেছেন সে-জায়গা কোথায়?'

নিক্সন বললেন, 'দেশটা হল ফ্লোরিডার ৯৭০ কিলোমিটার দক্ষিণপূর্বে আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত এক স্বাধীন রাষ্ট্র—হাইতি। আর এই আরওয়াকরা বসবাস করে এই দ্বীপরাষ্ট্রের দক্ষিণে ক্যারিবিয়ান সাগরের উপকূলে এক জায়গাতে। তথাকথিত সভ্য সমাজের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকে তারা। সভ্য পৃথিবীর সঙ্গে খুব একটা বৈরিতা বা সখ্যতা—এ-দুইয়ের কোনওটাই তাদের নেই। উপকূল অঞ্চলে মাছ শিকার, আর জঙ্গল থেকে পশুশিকার করেই তাদের জীবন কাটে।'

এ-কথা বলে মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে নিক্সন বললেন, 'লুথারের সঙ্গে কথা বলে আমি জেনেছি যে ওরা নাকি তাদের উৎসবে এক নারীকে এই মুক্তোমালা দিয়ে সাজিয়ে আরাধনা করার পর, কিছুদিনের মধ্যেই সেই মুক্তোমালা সমুদ্রে বিসর্জন দেয়। পরের বছর আবার উৎসবের কিছুদিন আগে এই মুক্তো সংগ্রহ করে মালা গাঁথা হয়। লুথারের থেকে শোনা এই কথাটাই আমার আগ্রহ আমার বাড়িয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ এই প্রাচীন আমেরিকান জনগোষ্ঠী নিশ্চয়ই জানে যে, ক্যারিবিয়ান সাগরের কোনও এক জায়গাতে এই বিরাট বিরাট মুক্তো পাওয়া যায়। যার একটার দাম-ই কয়েক লাখ ডলার হতে পারে।'

মৃগাঙ্ক জানতে চাইল, 'ওই লুথার নামের ভদ্রলোককে কি ওরা বলেছে যে কোথা থেকে ওরা মুক্তো সংগ্রহ করে?'

নিক্সন হেসে বললেন, 'লুথারকে জিগ্যেস করায় তিনি বললেন সামান্য কৌতূহলবশত তিনি একবার আরাওয়াক গোষ্ঠীপতির কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে তারা ওই বড় বড় মুক্ত কোথা থেকে সংগ্রহ করে? জবাবে সেই গোষ্ঠীপতি ওঝা বা পুরোহিত নাকি বলেছিলেন যে, "মেডুসার ওই মুক্তোমালা আমরা সংগ্রহ করি মানুষের পেট থেকে।" ভাবুন একবার, ঝিনুকের পেট থেকে নয়, মানুষের পেট থেকে! লুথার অবশ্য এসব মুক্তো-টুক্তো নিয়ে খুব বেশি আগ্রহী নন বলে ব্যাপারটা নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন করেননি।'

BanglaBook.org

মৃগাঙ্ক বলল, 'মেডুসা! সেই ভয়ঙ্কর দেবীর কথা তো আমি গল্পে পড়েছি! তার মাথার চুলগুলো হল ফনা-তোলা সাপ। সেই দেবী বা অপদেবী কোনও মানুষের দিকে তাকালে পাথর হয়ে যেত সে।'

নিক্সন বললেন, 'পুরাণ-কথিত সেই দেবীর কথা আমিও গল্পে পড়েছি। তার সঙ্গে এই আরাওয়াকদের মেডুসার কোনও সম্পর্ক আছে কিনা জানি না, তবে আরাওয়াকরা মুক্তোমালাশোভিত যে-নারীকে দেবী হিসেবে পুজো করে তাকে মেডুসার নামেই ডাকে।'

এরপর নিক্সন কয়েক মুহূর্ত মৃগাঙ্কর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাকে কেন ডেকেছি জানেন? আপনাকে একবার সে-জায়গাতে যেতে হবে। রওনা হতে হবে কালকেই। কারণ তাদের দেবী পুজোর উৎসবের আর মাত্র সপ্তাহখানেক বাকি। নিশ্চই তারা এসময় সমুদ্র থেকে মুক্তো সংগ্রহ করবে। আপনাকে জানার চেষ্টা করতে হবে যে ক্যারিবিয়ান উপকূলের কোথা থেকে তারা ওই মুক্তো সংগ্রহ করে। কি, সে-জায়গাতে আপনি যেতে রাজি তো?'

মুক্তো কোম্পানির মালিক নিক্সন এমনই কোনও প্রস্তাব দেবেন তা অনুমান করছিল মৃগাঙ্ক। একটু চুপ করে থেকে জবাব দিল, 'আমি কীভাবে, কী পরিচয় দিয়ে পৌঁছোব সেখানে?'

নিক্সন বললেন, 'এখান থেকে আকাশপথে প্রথমে আপনি নামবেন হাইতির রাজধানী পোর্টপ্রিন্সে। সেখানে আমাদের স্থানীয় এজেন্ট লুইস থাকবেন। পোর্টপ্রিন্স বন্দর থেকে লঞ্চে লুইস আপনাকে নিয়ে যাবে আরাওয়াকদের অঞ্চলে। তবে লঞ্চ সেই দ্বীপে ভিড়বে না। লঞ্চের লোকরা আপনাকে ক্যানোতে করে পৌঁছে দেবে সমুদ্রখাড়ির সেই দ্বীপে। একলাই আপনাকে সেখানে যেতে হবে। সঙ্গে স্যাটেলাইট ফোন দেওয়া হবে। আপনার কাজ মিটে গেলে তাদের ফোনে জানালে তারা আবার আপনাকে সেখান থেকে উঠিয়ে নেবে।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'আপনার সেই লুইস নামের এজেন্ট তো আমার সঙ্গে যেতে পারত, তবে কিছুটা সুবিধা হত। স্থানীয় মানুষ সে...।'

নিক্সন বললেন, 'এখানে একটা ছোট্ট সমস্যা আছে। সে নিগ্র-বংশোদ্ভূত। তাদের খুব একটা পছন্দ করে না আরাওয়াকরা। তাদের ধারণা এই কালো মানুষরাই তাদের দেশ দখল করে নিয়েছে। যদিও ব্যাপারটা মোটেও তাই

BanglaBook.org

নয়। শ্বেতাঙ্গদের ক্রীতদাস হিসাবেই তারা প্রথম সে-দেশে গেছিল তারপর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হয়ে ওঠে। লুইস সঙ্গে থাকলে হয়তো সমস্যা হতে পারে। আরাওয়াকরা হয়তো পত্রপাঠ আপনাকে বিদায় করে দিল সেখান থেকে।

তবে আরাওয়াকদের সঙ্গে কথা বলতে আপনার খুব একটা সমস্যা হবে না। ইউনেস্কোর লোকজন, খ্রিস্টান মিশনারিরা, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের লোকজন মাঝে মাঝে সেখানে যাওয়া-আসা করার কারণে আরাওয়াকরা সবাই না হলেও ওই দলপতি বা ওঝাসহ বেশ কয়েকজন ইংরাজি বুঝতে পারে ও ভাঙা ভাঙা ইংরাজি বলতে পারে। আপনিও আমাদের কোম্পানির প্রতিনিধি হিসাবে ওদের জন্য সাহায্য নিয়ে যাবেন। লুইস সেসব জিনিস সরবরাহ করবে আপনাকে।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'আমাকে কোনও অস্ত্র দেওয়া হবে কি নিরাপত্তার কারণে?'

নিক্সন বললেন, 'না, কোনও অস্ত্র থাকবে না। আরাওয়াকরা ইউনেস্কোর সংরক্ষিত জনজাতী বলে সে দ্বীপে কোনও অস্ত্র নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ। যদিও আরাওয়াকরা নিজেরা তির ধনুক, বর্শা ইত্যাদি অস্ত্র ব্যবহার করে। একই রকম নিয়ম ঘোষিত আছে আন্দামানের জারোয়া দ্বীপেও। আপনি সেখানেও অস্ত্র বহন করতে পারবেন না। তবে আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই। আরওয়াকরা বেশ শান্ত প্রকৃতির। আদিম জনজাতি হলেও তারা সভ্য মানুষ।'

এরপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিক্সন বললেন, 'আপনার যাবার সব ব্যবস্থা আমি করছি। কাল ভোরের ফ্লাইট ধরলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আপনি হাইতি পৌঁছবেন। আর সেখান থেকে কাল বিকেলের মধ্যে পৌঁছে যাবেন আরাওয়াক নেটিভ আমেরিকানদের গ্রামে। বেস্ট অব লাক। 'এ-ছবিটা আপনি সঙ্গে রেখে দিন।'

২

পরদিন দুপুরে লঞ্চের ডেকে দাঁড়িয়েছিল মৃগাঙ্ক। তার পাশে দাঁড়িয়ে লুইস, নিক্সন কোম্পানির স্থানীয় এজেন্ট। তার কাছ থেকেই আরওয়াক দ্বীপের

BanglaBook.org

সম্বন্ধে নানারকম তথ্য সংগ্রহ করছিল মৃগাঙ্ক। লুইস-ই তাকে এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করে লঞ্চে এনে তুলেছে। আরও জনসাতেক লোকও আছে তাদের সঙ্গে। সবাই তারা কৃষ্ণাঙ্গ। এদেশে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের সংখ্যা এত বেশি যে, দেশটাকে আমেরিকা মহাদেশের অন্তর্গত বলে মনেই হয় না।

সমুদ্রের জলরাশি ভেদ করে দ্রুত এগোচ্ছিল লঞ্চটা। মাঝে মাঝেই চোখে পড়ছে নানা ছোট-বড় দ্বীপ, নির্জন বালুতটের ওপাশে সার সার নারকেলগাছ। ঘণ্টা সাতেকের সমুদ্রযাত্রা প্রায় শেষ হতে চলেছে। কারণ, লুইস জানাল যে 'আর কিছুক্ষণের মধ্যে সে-জায়গাতে পৌঁছে যাব আমরা।'

মৃগাঙ্ক প্রশ্ন করল তাকে, 'আপনি আগে ওখানে গেছেন নিশ্চই?'

লুইস জবাব দিল, 'ও-দ্বীপের পাশ দিয়ে গেলেও নামিনি কখনও। কারণ ওরা আমাদের পছন্দ করে না। তবে ওরা নির্বিবাদী। মাঝে মাঝে ওদের ছই-অলা জেলে-নৌকো মাছের সন্ধানে সমুদ্রে ভেসে বেড়ায়। আপনাকে আমরা দ্বীপে নামিয়ে দেব। তারপর কাজ মিটে গেলে আপনি আমাদের স্যাটেলাইট ফোনে যোগাযোগ করবেন। স্যাটেলাইট ফোনসেট দিয়ে দিয়েছি আপনার ব্যাগে। আর কিছু সামুদ্রিক সাপের বিষের অ্যান্টিভেনাসও দিয়েছি। ওই একটা ব্যাপারেই সাবধান। এসব দ্বীপগুলোতে প্রচুর সাপ আছে।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'আচ্ছা। মুক্তোর সন্ধানে কোস্টাল অঞ্চলে কাজ করতে যেতে হয় বলে ভেনাস ইঞ্জেকশন নেবার পদ্ধতি আমার জানা আছে। কিন্তু আপনি কি জানেন যে কেন আমি ও-দ্বীপে যাচ্ছি?'

লুইস জবাব দিল, 'নিক্সন আমাকে বলেছেন কথাটা। আপনি ওখানে যাচ্ছেন ওদের মেড়ুসাদেবীর মুক্তোর সন্ধানে। ওই মুক্তোর গল্প বহু দিন ধরে এ-তল্লাটে প্রচলিত। তবে গল্প নয়, সত্যি। বহু লোকে দেখেছে ওই মুক্ত হার। কিন্তু কিছুতেই ওরা বলতে চায় না যে, সমুদ্রের কোন অংশ থেকে তারা ওই মুক্তো সংগ্রহ করে। কেউ এ ব্যাপারে জিগ্যেস করলেই ওরা মজা করে এক অদ্ভুত কথা বলে—ঝিনুকের পেটে নয়, মানুষের পেটে নাকি ওই মুক্তো পাওয়া যায়। উৎসবের শেষে সমুদ্রের গভীরে নাকি ওরা বিসর্জন দেয় ওই মুক্তোমালা। দেখুন যদি আপনি কোনওভাবে খবর সংগ্রহ করতে পারেন।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'দেখা যাক কী হয়?'

জল কেটে এগিয়ে চলল লঞ্চ। বিকেল নাগাদ বেশ বড় একটা দ্বীপ

BanglaBook.org

দেখা গেল। তার চারপাশে সোনালি বালুতটে গিয়ে আছড়ে পড়ছে উর্মিমালা। আর বালুতটের ওপাশে ঘন নারকেলগাছের সারি আন্দোলিত হচ্ছে সমুদ্র বাতাসে। দু-চারটে ছোট বড় নৌকাও রাখা আছে বালুতটে। ছবির মতো এক শান্ত-সুন্দর দ্বীপ। লুইস বলল, 'ওই হল আরাওয়াক দ্বীপ।'

দ্বীপের কাছাকাছি যতদূর লঞ্চ যেতে পারে সে পর্যন্ত গিয়ে লঞ্চটা দাঁড়িয়ে পড়ে বেশ কয়েকবার ভোঁ বাজাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই নারকেল গাছগুলোর আড়াল থেকে একদল লোক বেড়িয়ে এসে দাঁড়াল বালুতটে। তাদের দেখে লঞ্চের সারেং একটা সাদা পতাকা নাড়ল তাদের উদ্দেশ্যে। তা দেখে তারাও একটা সাদা কাপড় নাড়ল। লঞ্চের থেকে একটা ছোট নৌকো জলে নামিয়ে তাতে মালপত্রসমেত মৃগাঙ্ককে ওঠানো হল। একজন লোক দাঁড় টেনে মৃগাঙ্ককে নিয়ে চলল পাড়ের দিকে।

মৃগাঙ্কদের নৌকোটাকে এগিয়ে যেতে দেখে সে-লোকগুলোও এগিয়ে এসে হাঁটুজলে দাঁড়াল। নৌকা গিয়ে থামল তাদের সামনে। জনা সাত-আটেক লোক। তাদের পরনে ছাগলের চামড়ার তৈরি হাতকাটা জ্যাকেট, গোড়ালির ওপর পর্যন্ত ওঠানো পশুচর্মের তৈরি প্যান্টের মতো পোশাক, মাথায় প্রাচীন নাবিকদের মতো টুপি, তার ফাঁক গলে লম্বা বেণী ঝুলছে পিঠের ওপর। লালচে বর্ণের শক্তপোক্ত লোকগুলোর হাতে ধরা আছে মাছ ধরার কোঁচের মতো দেখতে বর্শা।

একজন লোক প্রথমে নৌকোর কাছে এসে দাঁড়াল। অসংখ্য বলিরেখাময় মুখ তার। এ-লোকের সাজগোজের একটু ভিন্নতা আছে। মাথার টুপিতে গোঁজা আছে বেশ কয়েকটা বড় বড় রঙিন পালক। কানে সোনার মাকড়ি। কোমরবন্ধ হিসেবে বাঁধা আছে একটা সাপের চামড়া, তার থেকে ঝুলছে একটা ছুরি। এ-লোকটার গলাতে বেশ কয়েক ছড়া মালা ঝুলছে। তবে তা মুক্তোর নয়, নানা রঙের পাথরের মালা। লোকটা বারান্দাঅলা চামড়ার টুপির নীচ দিয়ে মৃগাঙ্কদের দিকে তাকিয়ে সন্দিগ্ধভাবে ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে প্রশ্ন করল 'তোমরা কারা? কেন এসেছ এখানে?'

মৃগাঙ্ক জবাব দিল, 'আমি আমেরিকা থেকে আসছি। কিছু উপহারও এনেছি তোমাদের দ্বীপের মানুষদের জন্য। আমি ক'দিন থাকতে চাই এখানে।'

লোকটা বলল, 'আমেরিকা! কিন্তু তুমি সাদাও নও, কালোও নও। কোন

BanglaBook.org

দেশের মানুষ তুমি?'

মৃগাঙ্ক বলল, 'ইন্ডিয়ান'। কাজের সূত্রে আমেরিকায় থাকি।'

ইতিমধ্যে লোকটার অন্য সঙ্গীরাও তার পাশে এসে দাঁড়াল। মৃগাঙ্কর জবাবে লোকটা কী বুঝল কে জানে নৌকোতে রাখা বস্তাগুলো দেখিয়ে বিজাতীয় ভাষায় তার সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলে নিয়ে মৃগাঙ্ককে বলল, 'আমার নাম ম্যাকাও। আমাদের গ্রামের মাথা আমি। তুমি যখন থাকবে বলে এসেছ তখন থাকতে দিতে আপত্তি নেই আমাদের। তবে আমাদের কোনও ব্যাপারে নাক গলালে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের জলে নামিয়ে দেব।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'তোমাদের কোনও ব্যাপারে আমি নাক গলাব না। আমি শুধু এই সুন্দরদ্বীপে ক'দিনের জন্য ঘুরে-বেড়াতে এসেছি।'

ম্যাকাও বলল, 'হ্যাঁ, কথাটা মনে থাকে যেন।' এর পর লোকটা তার সঙ্গীদের নির্দেশ দিল নৌকো থেকে জিনিসপত্রগুলো নামিয়ে নেবার জন্য। সেসব সমেত মৃগাঙ্ককে নিয়ে দলটা বালুতট পেরিয়ে চলল নারকেলগাছের আড়ালে-থাকা তাদের গ্রামের দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামে পৌঁছে গেল তারা। নারকেলগাছের পাতায় ছাওয়া কুড়ি-পঁচিশটা কুঁড়েঘর দাঁড়িয়ে আছে বৃত্তাকার একটা ফাঁকা জায়গার মাঝখানে। ঘরগুলোর সামনে খুঁটির মাথায় হাঙরের দাঁতসুদ্ধ চোয়াল, বিভিন্ন পশু-পাখির মাথা ইত্যাদি দিয়ে সাজানো। ছাগল, শূকরসহ বেশ কিছু গবাদি পশু আছে গ্রামে। আর আছে ছোট আকৃতির অনেক বানর। এক জায়গাতে স্তূপাকৃত প্রচুর নারকেল রাখা আছে। তার ওপর লাফালাফি করছে তারা।

মৃগাঙ্ককে নিয়ে লোকগুলো গ্রামে প্রবেশ করতেই কিছু নারীও বেরিয়ে এল কুটির ছেড়ে। কয়েকজন শিশুও আছে তাদের সঙ্গে। বিভিন্নবয়সি সেসব নারীরাও চামড়ার পোশাকে সজ্জিত। গলা থেকে ঝুলছে নানা ধরনের পাথরের মালা, মাথায় গোঁজা নানা রঙের পাখির পালক। মৃগাঙ্ক খেয়াল করেছে প্যারাকিট অর্থাৎ টিয়া প্রজাতির নানা বড় বড় পাখি আছে এ-দ্বীপে। নানা রঙের পাখি। নারকেলগাছগুলোর মাথায় ওড়াউড়ি করছে তারা।

মৃগাঙ্ককে নিয়ে লোকগুলো উপস্থিত হল একটা কুঁড়েঘরের সামনে। তারপর তাকে নিয়ে কুঁড়েঘরের ভিতরে ঢুকল ম্যাকাও। খড়ের বিছানা আছে সেখানে। একটা জলের পাত্রও আছে। ম্যাকাও বলল, 'এই তোমার

BanglaBook.org

থাকার জায়গা। দু-বেলা তোমার খাবার দিয়ে যাবে আমাদের লোকেরা। তবে তোমাকে নিয়ে দ্বীপ দেখাতে পারবে না কেউ। আমরা এখন খুব ব্যস্ত। তোমাকে নিজে নিজেই ঘুরে বেড়াতে হবে। তবে একটু সাবধানে বেড়িও। দ্বীপে কিন্তু প্রচুর সাপ আছে।'

মৃগাঙ্ককে ঘরে রেখে এরপর লোকগুলো চলে গেল সে-জায়গা ছেড়ে।

মৃগাঙ্ক সামান্য কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ঘর ছেড়ে। সূর্য ডুবতে আরও বেশ কিছু সময় বাকি আছে। প্রথমে ঘর থেকে বেরিয়ে ঘরগুলোর মাঝখানে ফাঁকা জমিটাতে এসে দাঁড়াল সে। নারী-শিশুর দলও এখন বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। কয়েকজন আরওয়াক রমণী ফাঁকা জমিটার মাঝখানে বাঁশ-ডালপালার কাঠামো দিয়ে মঞ্চ তৈরির কাজ করছে। মৃগাঙ্ক পায়ে পায়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর একজনকে প্রশ্ন করল, 'এখানে কী হবে?'

মেয়েটা জবাব দিল, 'দেবী মেডুসার উৎসবের মঞ্চ বাঁধা হচ্ছে। আর কদিন পরই দেবীর পুজো আছে।'

মৃগাঙ্ক এরপর জানতে চাইল, 'গ্রামের পুরুষরা সব কোথায় গেল?'

মেয়েটা নারকেল বনের দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ওই যে ওদিকে।'

মৃগাঙ্ক তার কথা শুনে হাঁটতে শুরু করল সেদিকে। নারকেল বনের ভিতরে ঢুকে কিছুটা তফাতেই একটা ভাঙা কুটির চোখে পড়ল তার। যদি লোকগুলোকে সেখানে পাওয়া যায়, কোনও তথ্য সংগ্রহ করা যায় তাই ঘরটার দিকে এগোল সে। পাতায় ছাওয়া ঘরটার একটা জানলা আছে। সে জানলা দিয়ে ঘরের ভিতর উঁকি দিল মৃগাঙ্ক। ম্যাকাও সহ গ্রামের পুরুষ মানুষেরা সমবেত হয়েছে সেখানেই। তবে ম্যাকাও ছাড়া অন্যদের উর্দ্ধাঙ্গে কোনও পোশাক নেই। সবল চেহারার লোকগুলো খালি গায়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। ম্যাকাও একটা লোকের দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন পরীক্ষা করছে। দাঁড়িয়ে-থাকা লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ-ই যেন কী একটা অদ্ভুত ব্যাপার ধরা পড়তে যাচ্ছিল মৃগাঙ্কর চোখে। কিন্তু সে ভালো করে ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই ম্যাকাও মুখ তুলে তাকাল জানলার দিকে। মৃগাঙ্ককে দেখতে পেয়ে সে বলল, 'তুমি এখানে কেন?'

মৃগাঙ্ক বলল, 'তোমাদের সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলতে এলাম।'

জবাব শুনে ম্যাকাও একটু রুক্ষভাবে বলল, 'আমরা এখন ব্যস্ত আছি।

BanglaBook.org

তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় নেই। তুমি নিজের মতো ঘুরে বেড়াও।'

এরপর আর কোনও কথা চলে না। কাজেই মৃগাঙ্ক এগোল অন্যদিকে। দ্বীপের চারপাশে শুধু নারকেলগাছ। কোনও কোনও গাছের গায়ে বিরাট বিরাট পাতাঅলা উদ্ভিদ নাগপাশের মতো গুঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে নারকেল পাতার সঙ্গে মিলেমিশে মাথার ওপর পাতার জটলা সৃষ্টি করেছে। সমুদ্র বাতাসে দুলছে গাছের মাথাগুলো। মাঝে মাঝে গাছগুলোর ফাঁকগুলো দিয়ে চোখে পড়ছে উন্মুক্ত তটরেখা, আর তার বুকে আঁছড়ে পড়া সমুদ্রের ঢেউ।

ঘণ্টাখানেক একা একা ঘুরে বেড়াবার পর আবার গ্রামের ভিতর প্রবেশ করল সে। ম্যাকাওসহ গ্রামের পুরুষরা সবাই আবার গ্রামে ফিরে এসেছে। একটা ঘরের সামনে কী ব্যাপারে যেন উত্তেজিতভাবে জটলা করছে তারা। আর এর পরই মৃগাঙ্ক দেখল, একটা লোককে যেন জোর করেই ঘরের মধ্যে ঠেলে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে খিল উঠিয়ে দিল তারা। মৃগাঙ্ক ব্যাপারটা দেখে একটু থমকে দাঁড়ালেও সেদিকে এগোল না। এটা ওদের নিজস্ব কোনও ঝামেলা হবে হয়তো। মৃগাঙ্কর ব্যাপারটাতে মাথা গলিয়ে লাভ নেই। সে এগোল নিজের ঘরের দিকে।

কিন্তু ঘরের ভিতর ঢুকেই চমকে উঠল সে। জানলা দিয়ে একদল বাঁদর ঢুকেছে ঘরের ভিতর। ব্যাগগুলোর চেন খুলে গেছিল মৃগাঙ্ক। খাবারের সন্ধানে ব্যাগ থেকে জিনিসপত্র বের করে লণ্ডভণ্ড করছে বাঁদরের দল। মৃগাঙ্ক ঘরে ঢুকতেই প্রাণীগুলো ভয় পেয়ে দুড়দাড় করে লাফ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। মৃগাঙ্কর সঙ্গে-আনা কয়েকটা শুকনো খাবারের প্যাকেটও নিয়ে গেল তারা। মৃগাঙ্ক আর বাইরে বেরোল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার নামল দ্বীপে। এখানে আলোর কোনও ব্যবস্থা নেই। মৃগাঙ্ক একটা মোম জ্বালালো। অন্ধকার নামার কিছুক্ষণ পর একজন লোক এসে খাবার দিয়ে গেল। আটার মণ্ড আর ঝলসানো মাছ। খাওয়া সেরে খড়ের বিছানায় শুতেই পথশ্রমের ক্লান্তিতে ঘুম নেমে এল তার চোখে। ঘুমিয়ে পড়ল সারা গ্রামটাও।

ভোরের দিকে হঠাৎ-ই একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল মৃগাঙ্কর। গ্রামের কোনও একটা ঘর থেকে যেন তীব্র আর্তনাদ ভেসে আসছে। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সে দেখল, আকাশে শুকতারা ফুটে উঠেছে। বাইরে থেকে

BanglaBook.org

ভেসে আসা সেই আর্তনাদ শুনতে শুনতে আলো ফোটার প্রতীক্ষা করতে লাগল সে।

৩

আকাশ একটু পরিষ্কার হতেই ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল মৃগাঙ্ক। সেই আর্তনাদ তখন অনেকটাই স্তিমিত হয়ে এসেছে। মৃগাঙ্ক দেখতে পেল গতকালের সেই ঘরটার সামনে ভিড় করেছে গ্রামের পুরুষরা। অস্পষ্ট একটা আর্তনাদ মাঝে মাঝে ভেসে আসছে সেখান থেকে। এবার আর কৌতূহল দমন করতে না পেরে মৃগাঙ্ক এগিয়ে গেল সেদিকে। ঘরের দরজাটা এখন খোলা। আর তার ঠিক বাইরে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে একটা লোক। মুখ দিয়ে গাঁজলা উঠছে। মৃদু আর্তনাদ করছে লোকটা। মৃগাঙ্ক ভিড়ের মধ্যে ম্যাকাওকে দেখে প্রশ্ন করল, 'এ লোকটার, কী হয়েছে?'

প্রশ্নটা শুনে ম্যাকাও ইশারায় কিছুটা তফাতে একটা জিনিসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাল মৃগাঙ্কর। সেখানে মাটির সঙ্গে কোঁচ দিয়ে গাঁথা একটা সাপ। এ-লোকটাকে সাপে কেটেছে। সম্ভবত ঘরেই ছিল কালো রঙের অচেনা সামুদ্রিক সাপটা। আর সে ঘর থেকে পালাবার সময় তাকে কোঁচ দিয়ে মারা হয়েছে কিছুক্ষণ আগেই। কথাবার্তার মাধ্যমে মৃগাঙ্ক জানতে পারল এ-লোকটার নাম প্যারোট। বিশেষ কারণবশত তাকে এঘরে আটকে রাখা হয়েছিল। ভোররাতে তাকে সাপে কাটে। সাপের কামড়টাও দেখতে পেল মৃগাঙ্ক। লোকটার বাঁম হাতের পাতার ওপর জেগে আছে সর্পদংশনের চিহ্ন। দুটো লাল বিন্দু। এখনও লোকটা জ্ঞান হারায়নি। শুধু আতঙ্কিত বিস্ফারিত চোখে অন্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে আর অস্পষ্ট আর্তনাদ করছে।

মৃগাঙ্ক বলল, 'আমার কাছে সাপের কামড়ের ইঞ্জেকশন আছে। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক একে বাঁচানো যায় কিনা?'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকাও বলল, 'দেখো দেখো ওকে বাঁচাতে পারো কিনা? ও মারা গেলে দেবীর উৎসব করা যাবে না। তাহলে ভয়ঙ্কর কাণ্ড হবে। সমুদ্রে মাছ পাওয়া যাবে না, না-খেয়ে মরব আমরা। অথবা জলোচ্ছ্বাসে দ্বীপ ভেসে মারা যাব সবাই।'

BanglaBook.org

মৃগাঙ্ক খেয়াল করল আশেপাশের লোকজনের চোখে কেমন যেন ভয়ার্ত ভাব ফুটে উঠেছে। আর কথা না-বাড়িয়ে মৃগাঙ্ক ছুটল তার কুঁড়ের দিকে, ভেনস অ্যাম্পুল আর সিরিঞ্জ আনার জন্য। জিনিসগুলো নিয়ে মৃগাঙ্ক আবার হাজির হল সে-জায়গাতে। ইতিমধ্যে লোকটা যেন আরও নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। লোকটাকে প্রথমে ধরাধরি করে আবার ঘরের ভিতর নিয়ে খড়ের বিছানায় শোয়ানো হল। মৃগাঙ্ক ইঞ্জেকশন দিল লোকটাকে। তারপর লোকটার চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে সবাই প্রতীক্ষা করতে লাগল সে-ইঞ্জেকশন কোনও কাজ দিয়েছে কিনা দেখার জন্য।

বাইরে সূর্যদেব আকাশে উঠতে শুরু করলেন। সময় এগিয়ে চলল। খুব দামি ইঞ্জেকশন। কিন্তু তবুও যেন আস্তে আস্তে আরও নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগল লোকটা। আর তার সঙ্গে সঙ্গে যেন আরও বেশি ভয়ার্ত ভাব ফুটে উঠতে লাগল দাঁড়িয়ে-থাকা লোকগুলোর চোখেমুখে। ম্যাকাওয়ের অসংখ্য বলিরেখাময় মুখমন্ডল যেন দুশ্চিন্তায় আরও বেশি কুঞ্চিত হতে লাগল। ঘণ্টাখানেক সময় কেটে গেল। প্যারোট নামের লোকটাকে তখন যেন একদম নিস্পন্দ মনে হচ্ছে। মৌনতা ভঙ্গ করে একটা লোকের উদ্দেশ্যে ম্যাকাও বলল, 'শার্ক, ওর নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখো।'

দেখল লোকটা। তারপর ভয়ার্তভাবে বলল, 'প্যারোটের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে!'

মৃগাঙ্ক নিজে ডাক্তার নয়। তবে লোকটার দেহ পরীক্ষা করে তারও যেন মনে হল লোকটা মারা গেছে। শ্বাস পড়ছে না, চোখের মণি স্থির। বুকের ধুকপুকানিও যেন থেমে গেছে।'

মাথার থেকে টুপি খুলে ম্যাকাও বলল, 'আমারও মনে হচ্ছিল প্যারোট আর বাঁচবে না। ও-সাপ কামড়ালে কাউকে কোনভাবে বাঁচানো যায় না।'

কথাটা শুনে সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক আতঙ্কিতভাবে বলে উঠল 'তবে কি দেবী মেডুসার পুজো বন্ধ হবে অলঙ্কারের অভাবে?'

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ ভাবে দাঁড়িয়ে রইল ম্যাকাও। প্রবল দুশ্চিন্তা গ্রস্থ তার মুখ। তারপর সে ঘরের অন্যান্য আতঙ্কগ্রস্থ মুখ গুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলো, প্যারোটের দেহটাকে সমুদ্রর পারে রেখে আসা যাক। সমুদ্র ভাসিয়ে নিয়ে যাক ওর দেহ।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরাধরি করে প্যারোটের দেহটা ঘর থেকে বের করা

BanglaBook.org

হল। ইতিমধ্যে গ্রামের নারী-শিশুরাও ভিড় জমিয়েছিল ঘরের বাইরে। মৃতদেহটা দেখেই যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল তাদের মুখ। একজন বয়ঃজ্যেষ্ঠা নারী হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে উঠল 'মেডুসা মেডুসা' বলে। তারপর সবাই যেন কেমন নিশ্চুপ হয়ে গেল। এক অখণ্ড নীরবতা নেমে এল চারপাশে।

প্যারোটের মরদেহ নিয়ে ম্যাকাওয়ের নেতৃত্বে গ্রামের পুরুষরা এগোল সমুদ্রের দিকে। আর মৃগাঙ্ক ফিরে চলল তার কুঁড়ের দিকে। এখানে এসেই যে তাকে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে তা সে ভাবেনি। সে ভাবতে লাগল, লোকটার মৃত্যুর জন্য যদি মেডুসার পুজো বন্ধ হয়ে যায় তবে তার এখানে আসাটাই হয়তো পণ্ড হবে।

ঘরে ঢুকে সে ব্যাপারটা ভাবতে লাগল। হঠাৎ একটা লোকের বক্তব্যও তার মনে এল। লোকটা বলছিল যে অলঙ্কারের অভাবে দেবী মেডুসার পুজো বন্ধ হবে? তাহলে কি যে লোকটা মারা গেল সে-ই দেবীর অলঙ্কার সংগ্রহ করত? অলঙ্কার মানে কি সেই মুক্তো, যার সন্ধান করতে এ-দ্বীপে ছুটে এসেছে মৃগাঙ্ক। একটা ব্যাপার মৃগাঙ্ক ম্যাকাও আর তার সঙ্গীদের কথোপকথনে বুঝতে পেরেছে যে, প্যারোট নামের লোকটার মৃত্যুতে এরা যতটা না শোকাহত তার থেকে অনেক বেশি আতঙ্কিত লোকটার মৃত্যুতে দেবী মেডুসার পুজো বন্ধ হয়ে যাবার ভয়ে।

আরও সময় এগিয়ে চলল। বেলা দশটা নাগাদ মৃগাঙ্কর আর ঘরে থাকতে ভালো লাগল না। পরিস্থিতি বোঝার জন্য ঘর থেকে বেরোল সে। বাইরে বেরিয়েই সে দেখতে পেল সর্দার ম্যাকাও আর তার সেই অনুচর শার্ক এগিয়ে আসছে তার ঘরের দিকে। তারা এসে মৃগাঙ্কর মুখোমুখি দাঁড়াল। ম্যাকাও, মৃগাঙ্কর উদ্দেশ্যে বলল, 'প্যারোটকে সমুদ্রের পাড়ে রেখে আসা হয়েছে। এতক্ষণে হয়তো সমুদ্রের জল ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তার দেহ। আমরা মৃতর অন্তিমকাজ এভাবেই সম্পন্ন করি।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'ব্যাপারটা খুব দুর্ভাগ্যজনক। তোমাদের আমার সমবেদনা জানাচ্ছি।'

ম্যাকাও বলল, 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যজনক তো বটেই। দেবীর পুজো যদি বন্ধ হয় তবে দুর্যোগ নেমে আসবে আমাদের ওপর। তাছাড়া তুমি যার খোঁজে এসেছ, দেবীর গলার সেই মুক্তোমালাটাও তোমার দেখা হবে না।'

BanglaBook.org

ম্যাকাওয়ের শেষ কথাটাতে চমকে গেল মৃগাঙ্ক। সে জানল কী করে যে, সে ওই মেডুসার মুক্তোর সন্ধানে এসেছে?'

এ-প্রশ্নের জবাব অবশ্য কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মৃগাঙ্ক পেয়ে গেল। ম্যাকাও তার পোশাকের মধ্যে থেকে একটা ছেঁড়া, দোমড়ানো কাগজের টুকরো বের করে এগিয়ে দিল মৃগাঙ্কর হাতে। নিক্সনের দেওয়া মুক্তোমালা-শোভিত মেডুসা-সাজা সেই আরওয়াক রমণীর ফটোগ্রাফ। যা ছিল তার ব্যাগের মধ্যে! জিনিসটা যে খোয়া গেছিল তা বুঝতে পারেনি মৃগাঙ্ক।

ছবিটা মৃগাঙ্কর হাতে তুলে দিয়ে ম্যাকাও বলল, 'আমরা যে বাঁদরগুলোকে দিয়ে নারকেল পাড়াই তারা তোমার ঘরে ঢুকে এ-ছবিও নিয়ে গেছিল। একটা বাঁদর চিবুচ্ছিল এটা। তার থেকে এটা একজন গতকাল সন্ধ্যাতে উদ্ধার করে আমাকে দেয়। আর কদিন পরেই দেবীর পুজো আমার একটা সন্দেহ প্রথমেই হয়েছিল যে, হঠাৎ তুমি এসময় উপস্থিত হলে কেন? ছবিটা দেখার পর ব্যাপারটা স্পষ্ট হল আমার কাছে। দেবী মেডুসার মুক্তোমালার সন্ধানেই তুমি এখানে এসেছ। নইলে এ-ছবি তোমার কাছে থাকবে কেন? আমি ঠিক বলছি কিনা বলো?'

ম্যাকাওয়ের কথা শুনে কী জবাব দেবে তা বুঝতে না পেরে মৃগাঙ্ক তাকিয়ে রইল ম্যাকাওয়ের দিকে। অবশ্য হাসি ফুটে উঠেছে ম্যাকাওয়ের মুখে। ধরা পড়ে গেছে মৃগাঙ্ক।

বেশ কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। ম্যাকাও তার পর বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলি, দেবীর পুজো বন্ধ হোক আমরা তা কিছুতেই চাই না। আর তুমিও নিশ্চই ওই মুক্তো কোথায় পাওয়া যায় সে-রহস্য থেকে বঞ্চিত হতে চাও না। তুমি যদি চাও তবে সে-সন্ধান তুমি পেতে পারো।'

কথাটা শুনে মৃগাঙ্ক এবার বলল, 'কীভাবে?'

ম্যাকাও বলল, 'মেডুসা দেবীর পুজোর প্রধান উপচার তাঁর কণ্ঠশোভিত ওই মুক্তোছড়া। ওই মুক্তোমালায় স্বজ্জিত না করলে দেবীর পুজো হবে না। সমুদ্রর গভীরে এক গোপন জায়গাতে গিয়ে সে-মুক্তো সংগ্রহ করি আমরা। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে গিয়ে সেই মুক্তো আহরণে সহায়তা করো তবে তোমার আমার দুজনের-ই কাজ হয়। যাবে আমাদের সঙ্গে?'

মৃগাঙ্ক বলল, 'হ্যাঁ, যাব। কখন যেতে হবে?'

ম্যাকাও বলল, 'এখনই রওনা হতে হবে। আজ সূর্যোদয়ের পরই যাত্রা

BanglaBook.org

শুরু করার কথা ছিল আমাদের। কিন্তু প্যারোটের মৃত্যুটা সব গোলমাল করে দিল। মুক্তো আহরণে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার কথা ছিল তার। সে কাজটা তোমাকেই করতে হবে।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'ঠিক আছে আমি রাজি।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ম্যাকাও আর তার অনুচর শার্কের সঙ্গে গ্রাম ছাড়ল মৃগাঙ্ক। নারকেল বন অতিক্রম করে সমুদ্রের পাড়ে এসে উপস্থিত হল তিনজন। একটা বেশ বড় পালতোলা নৌকা ভাসছে সমুদ্রর জলে। শনে ছাওয়া কাঠের বেশ কয়েকটা ঘরও আছে নৌকোতে। মৃগাঙ্ক ও-নৌকো আগে দেখেনি। জল ভেঙে নৌকোতে ওঠার জন্য এগোতে এগোতে সমুদ্রতটের একটা জায়গার দিকে তাকিয়ে ম্যাকাও বলল, 'ওখানেই প্যারোটের মৃতদেহটা রাখা হয়েছিল। এখন দেখছি না। সমুদ্র ভাসিয়ে নিয়ে গেছে দেহটা।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'তোমরা লোকটাকে ঘরে আটক করেছিলে কেন?'

আরওয়াক দলপতি জবাব দিল, 'ওকে নিয়ে আজ আমাদের সমুদ্রে ভাসার কথা ছিল। কিন্তু ও রাজি হচ্ছিল না। ভেবেছিলাম সারারাত ওকে আটকে রাখলে হয়তো মত পরিবর্তন করবে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ও নিজেকে বাঁচাতে পারল না। দেবী মেডুসার মুক্তো সংগ্রহের কাজে রাজি না-হওয়ায় হয়তো দেবী মেডুসার অভিশাপেই মৃত্যু হল তার।'

জল ভেঙে নৌকোতে উঠল মৃগাঙ্করা। নোঙর হিসেবে একটা ভারী পাথরখণ্ড মোটা কাছি দিয়ে জলে ফেলা ছিল। ম্যাকাও আর শার্ক মিলে সেটা ওপরে টেনে তুলল। মৃগাঙ্কদের নৌকো ভেসে পড়ল সমুদ্রর জলে।

মৃগাঙ্ক খেয়াল করল, তাদের নৌকোটার সঙ্গে নারকেলগাছের গুড়ির মধ্যে গর্ত করে তৈরি একটা ছোট কালো জাতীয় নৌকোও কাছি দিয়ে বাঁধা। সেটাও সমুদ্রের ঢেউ-এ দুলতে দুলতে এগিয়ে চলল বড় নৌকোটার সঙ্গে। সমুদ্রর বাতাস পাল ঠেলে নৌকা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ক্যারিবিয়ান সাগরের গভীরে। দাঁড় বাইতে হচ্ছে না। শুধু হাল ধরে বসে আছে শার্ক। আর তার পাশে বসে ম্যাকাও।

মৃগাঙ্ক গিয়ে বসল তাদের কিছুটা তফাতে এক জায়গাতে। চারপাশে তাকিয়ে সে বোঝার চেষ্টা করতে লাগল কোনদিকে যাচ্ছে। প্রথম অবস্থায় তার চোখে পড়তে লাগল ছোট-বড় নানা দ্বীপ। কিন্তু আস্তে আস্তে সেসব

BanglaBook.org

দ্বীপ হারিয়ে যেতে লাগল তার চোখের আড়ালে। গভীর থেকে গভীর সমুদ্রে প্রবেশ করতে লাগল নৌকো। মৃগাঙ্ক একবার ম্যাকাওকে জিগ্যেস করল, 'আমরা কোনদিকে যাচ্ছি?'

ম্যাকাও শুধু জবাব দিল, 'দেবী মেডুসার ইচ্ছায় বাতাস আমাদের যেখানে নিয়ে যাচ্ছে সেদিকে।'

জবাব শুনে মৃগাঙ্ক বুঝতে পারল, এব্যাপারে এখনই কিছু বলতে রাজি নয় এই আরওয়াক।

সূর্য ঠিক মাথার ওপর পৌঁছল। এগিয়ে চলল নৌকো। খোলা জায়গাতে বাতাস থাকলেও সূর্যের তাপে গরম লাগতে শুরু করল মৃগাঙ্কর। তাছাড়া সমুদ্রের জলে সূর্যরশ্মির প্রতিফলনও চোখে পীড়া দিচ্ছে। তার থেকে কিছু সময়ের জন্য মুক্ত হতে নৌকোর ঘরগুলোর মধ্যে গিয়ে ঢুকল মৃগাঙ্ক। ছোট কাঠের ঘরগুলোর মধ্যে কিছু নেই, শুধু একটা ঘরের মধ্যে লম্বা একটা টেবিল আছে। সেটা আবার মেঝের সঙ্গে পেরেক পুঁতে আটকানো। টেবিলটা দেখে তার ওপরই শুয়ে পড়ল সে। নৌকার দুলুনিতে অনিচ্ছাকৃতভাবেই ঘুম নেমে এল তার চোখে।

একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে যখন মৃগাঙ্কর ঘুম ভাঙল তখন ঘণ্টা তিনেক সময় কেটে গেছে। মৃগাঙ্ক তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এল। সামনে একটা বালির চর। সেখানেই নোঙর ফেলা হয়েছে। আর তার ঝাঁকুনিতেই ঘুম ভেঙেছে মৃগাঙ্কর।

এ কোন জায়গা? এখানেই কি তবে মুক্তো পাওয়া যায়?

মৃগাঙ্কর সঙ্গে চোখাচোখি হল ম্যাকাওয়ের। তার মনের ভাব পাঠ করেই যেন ম্যাকাও বলল, 'হ্যাঁ, এটাই সেই জায়গা, যেখান থেকে মেডুসার মুক্তো সংগ্রহ করে নিয়ে যাব আমি।'

মৃগাঙ্ক আকাশের দিকে তাকিয়ে জায়গাটার অবস্থান বোঝার চেষ্টা করতে লাগল।

শার্ক নামের লোকটা নৌকোর পাটাতনের কাঠ সরাল। তার ভিতর থেকে একে একে বের করতে লাগল ছুরি, দড়ি এসব। মৃগাঙ্ক ভাবল এবার নিশ্চয়ই সমুদ্রের তলায় নেমে ঝিনুক তোলার প্রস্তুতি শুরু হল। যে ঝিনুকে অত বড় মুক্তো থাকে সে ঝিনুকগুলোও নিশ্চয়ই বেশ বড়ই হবে। কিন্তু নৌকোর খোল থেকে সব শেষে যে-জিনিসটা টেনে বের করল তা দেখে

BanglaBook.org

একটু অবাক হল মৃগাঙ্ক। সেটা হারপুনের মতো একটা অস্ত্র! মৃগাঙ্ক, ম্যাকাওকে প্রশ্ন করল, 'হারপুন দিয়ে কী হবে?'

জবাবে ম্যাকাও আঙুল তুলে দেখাল জলের দিকে। সেদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল মৃগাঙ্ক। ব্যাপারটা এতক্ষণ সে খেয়াল করেনি। বালির চরা সংলগ্ন সমুদ্রে, নৌকোর আশেপাশে পাক খাচ্ছে ক্যারিবিয়ান সাগরের বিখ্যাত গ্যালানো হাঙরের ঝাঁক! আকারে ছোট হলেও এই হাঙরের দাঁত অতি মারাত্মক ধারালো আর তীক্ষ্ণ। এক কামড়ে এরা যে-কোনও মানুষকে দু-টুকরো করে ফেলতে পারে। এ সমুদ্রে নামা মানেই নির্ঘাত মৃত্যু।

মৃগাঙ্কর চোখে বিস্ময়ের ভাব লক্ষ করে ম্যাকাও বলল, 'মুক্তো সংগ্রহ করার জন্য আগে আমাদের হাঙর মারতে হবে একটা। এটাই রীতি।' কিছুক্ষণের মধ্যেই হার পুণে দড়ি পড়াল শার্ক। তারপর হাঙরগুলোকে দেখে নিয়ে হারপুন ছুড়ল নৌকোর পাশে ঘোরা একটা হাঙরকে লক্ষ্য করে। অব্যর্থ লক্ষ্য। হাঙর মারার নৈপুন্যের জন্যই হয়তো বা লোকটার নাম শার্ক হবে। দড়ি-টেনে হারপুনবিদ্ধ, হাঙরটাকে নৌকোয় তুলে ফেলল শার্ক। হাঙরের ফাঁক-করা মুখের ভিতর জেতো আছে সার সার তীক্ষ্ণ বীভৎস দাঁতগুলো। কী ভয়ঙ্কর দাঁত! হাঙরটাকে নৌকোয় তোলার পর শার্ক একটা বড় ছুরি দিয়ে হাঙরের মাথাটা কেটে রেখে দেহটা ছুড়ে ফেলল জলে। স্বজাতীয় মাংস ছিড়ে খাবার জন্যই মেতে উঠল হাঙরগুলো।

তাই দেখে মৃগাঙ্ক বলল, 'এখান থেকে মুক্তো কীভাবে সংগ্রহ করবে? কীভাবে জলে নামবে?'

তার কথা শুনে ম্যাকাও বলল, 'ও মুক্তো সংগ্রহ করা হবে চাঁদ ওঠার পর। তখন সব কিছু শান্ত হয়ে যাবে।'

শার্ক নামের লোকটা হাঙরের কাটা-মাথাটা নিয়ে এরপর তার কাজ শুরু করল। মৃগাঙ্ক দেখল, লোকটা একটা ছুরি দিয়ে হাঙরের মারাত্মক দাঁতগুলো চোয়াল থেকে খুলে একটা পাত্রে রাখছে। সেগুলো দিয়ে কি হবে তা ঠিক বুঝতে পারল না মৃগাঙ্ক। সময় এগিয়ে চলল। বিকেল হয়ে গেল, তারপর একসময় সমুদ্রের বুকে লাল আবীর গুলে সূর্যদেব বিদায় নিতে বসলেন। ম্যাকাও, মৃগাঙ্ককে বলল, 'এবার আপনি বিশ্রাম নিন। মুক্তো সংগ্রহ করার সময় আপনাকে ডাকব।'

ঘরে ঢুকে টেবিলটার ওপর বসল মৃগাঙ্ক। কিছুক্ষণ পর শার্ক একটা

BanglaBook.org

পাত্রে ডালের মতো কিছুটা তরল খাবার দিয়ে গেল। মৃগাঙ্ক পাত্রটা নিয়ে একটা চুমুক দিল তাতে। দ্বিতীয় চুমুক যখন সে দিতে যাচ্ছে ঠিক তখনই যেন একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত হল তার গালে। তার হাত থেকে ছিটকে পড়ল বাটিটা। ব্যাপারটা বুঝতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল মৃগাঙ্কর। তারপরই সে দেখল, ঘরের মেঝের খড়ের ওপর পড়ে ছটফট করছে একটা উড়ুক্কু মাছ। জল থেকে উড়ে খোলা জানলা দিয়ে ভিতরে ঢুকে সেটা আছড়ে পড়েছিল মৃগাঙ্কর গালে। মৃগাঙ্ক মাছটাকে তুলে নিয়ে আবার জলে ফেলে দিল। কেমন যেন ঘুম পাচ্ছে মৃগাঙ্কর। টেবিলটার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সে।

৪

মৃগাঙ্কর যখন হুঁশ ফিরল তখন খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি পড়ল তার। চাঁদ উঠে গেছে অনেকক্ষণ। তবে মাঝে মাঝে তা ঢেকে যাচ্ছে মেঘের আড়ালে। বেশ বাতাসও বইছে। মাঝে মাঝেই ঢেউয়ের আঘাতে নৌকাটা দুলছে। মৃগাঙ্কর মনে পড়ল, ম্যাকাও বলেছিল চাঁদ উঠলে মুক্তো সংগ্রহ করবে তারা। কথাটা মনে হতেই তাড়াতাড়ি উঠে বসতে যাচ্ছিল মৃগাঙ্ক। কিন্তু পারল না। আর এরপরই মৃগাঙ্ক বুঝতে পারল তার শরীরটা টেবিলের সঙ্গে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা! কী হল ব্যাপারটা? সে আঁধো-অন্ধকার ঘরের চারপাশে তাকিয়ে ম্যাকাওকে ডাকতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে একটা মশাল হাতে তার সঙ্গীকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল ম্যাকাও। তার সঙ্গী শার্কের হাতে ধরা থালার মতো একটা পাত্র।

মৃগাঙ্ক তাকে দেখে বলে উঠল, 'আমাকে কে বেঁধেছে? কেন?'

হাসল ম্যাকাও। তারপর ধীরেসুস্থে হাতের মশালটা কাঠের দেওয়ালের গায়ে এক জায়গাতে গুঁজে বলল, 'তোমার জ্ঞান ফিরে গেছে দেখছি! খাবারটা তাহলে পুরোটা খাওনি তুমি। যা হোক, তাতে আমার কাজের তেমন অসুবিধে হবে না।'

মৃগাঙ্ক আবার বলে উঠল, 'আমাকে বেঁধে রেখেছ কেন?'

ম্যাকাও বলল, 'তোমাকে তো বলেইছিলাম চাঁদ উঠলে মুক্তো সংগ্রহ

BanglaBook.org

করব আমরা।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'তার সঙ্গে আমাকে বেঁধে রাখার সম্পর্ক কী? তোমরা কি আমাকে সে-ব্যাপারটা দেখতে দিতে চাও না?'

ম্যাকাও অদ্ভুত হেসে বলল, 'তুমি কতদূর থেকে ছুটে এসেছ মেডুসার মুক্তো কীভাবে কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয় তা জানার জন্য। সেটা কি তোমাকে আমি না জানিয়ে পারি? আর একটু পরেই তুমি জেনে যাবে ব্যাপারটা। অবশ্য ফিরে গিয়ে তুমি অন্যদের ব্যাপারটা সম্বন্ধে জানাতে পারবে কিনা তা আমার জানা নেই।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'তার মানে?'

ম্যাকাও আর শার্ক কিছুটা এগিয়ে এল মৃগাঙ্কর কাছে। তাদের দুজনের মুখেই কেমন যেন একটা হিংস্র ভাব ফুটে উঠেছে। ম্যাকাও হিসহিস করে বলে উঠল, 'ব্যাপারটা জানার জন্য খুব শখ ছিল তোমাদের। যাতে কোটি কোটি ডলার কামাতে পারো তোমরা। এবার তোমাকে জানাচ্ছি ব্যাপারটা। এ-মুক্তো সত্যি সংগ্রহ করা হয় মানুষের পেট থেকে। তোমার পেট থেকেও আমি সংগ্রহ করব ওই মুক্তো। দাঁতগুলো কী ধারালো দেখেছ? তোমার পেট চেরার সময় তোমার মালুম-ই হবে না'—এই বলে সে শার্কের হাতে-ধরা প্লেটটা দেখাল।

মৃগাঙ্ক দেখল সেই প্লেট বা থালার ওপর সার্জিকাল নাইফের মতো সুন্দরভাবে সাজানো আছে হাঙরের তীক্ষ্ণ বাঁকানো দাঁতগুলো। বড় থেকে ছোট নানা আকৃতির দাঁত।

সেগুলো দেখার সঙ্গে সঙ্গেই মৃগাঙ্ক আতঙ্কে চিৎকার করে বলে উঠল, 'তোমরা কি পাগল হয়ে গেছ? মানুষের পেটে কখনও মুক্তো পাওয়া যায়?'

ম্যাকাও প্লেট থেকে বেশ বড় একটা দাঁত তুলে নিয়ে সেটাকে ঠিক যেভাবে ব্লেড ধরে তেমনভাবে ধরল ডান হাতের তর্জনী আর মধ্যমার ফাঁকে। ব্লেডের থেকেও ধারালো হাঙরের বাঁকানো দাঁত। সেটাকে একবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিয়ে সে বলল, 'না, পাগল হইনি। ব্যাপারটা তুমি এখন-ই বুঝতে পারবে।' কথাগুলো বলে টেবিলের দিকে পা বাড়াল ম্যাকাও।

আতঙ্কে হিম হয়ে আসছে মৃগাঙ্কর শরীর। সে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে টেবিলের নীচে একটা খচ্‌খচ্‌ শব্দ হল।

BanglaBook.org

সেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে মৃগাঙ্কর টেবিল আর ম্যাকাওদের মাঝে আবির্ভূত হল একজন। মৃগাঙ্কর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালেও সে একজন আরওয়াক। তাকে দেখেই থমকে দাঁড়াল ম্যাকাও। বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল ম্যাকাও আর শার্কের মুখে। কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। শার্কের মুখে ফুটে উঠতে লাগল আতঙ্কের ভাব। তার হাতে ধরা প্লেটটা কাঁপতে থাকল।

ম্যাকাও বলে উঠল, 'প্যারোট তুমি?'

লোকটা জবাব দিল, 'আমার-ই তো এখানে আসার কথা ছিল। তাই চলে এলাম।'

মৃগাঙ্ক এবার বুঝতে পারল, এ-লোকটা সেই সাপে-কাটা প্যারোট। কিন্তু সে জবাবটা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই শার্কের হাত থেকে প্লেটটা খসে পড়ল। আতঙ্কে সে ছুটল জানলার দিকে। তারপর খোলা জানলা দিয়ে সোজা ঝাঁপ দিল সমুদ্রের জলে। আর তার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মারনার্তনাদ ভেসে এল সমুদ্রের বুক থেকে। যে হাঙরের দাঁতগুলো এতক্ষণ সাজিয়ে ধরে রেখেছিল সে, সেই দাঁতগুলোই এখন ছিঁড়ে খাচ্ছে তার দেহ!

হতভাগ্য লোকটার আর্তনাদ মিলিয়ে গেল। কিন্তু সঙ্গীর আকস্মিক এই মৃত্যু কিন্তু তেমন বিচলিত করতে পারল না ম্যাকাওকে। বরং ঘটনাতে তার চোখে-মুখে আরও হিংস্র ভাব ফুটে উঠল। ম্যাকাও প্যারোটের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'ও তোমাকে প্রেতাত্মা ভেবে জলে ঝাঁপ দিলেও আমাকে তুমি বোকা বানাতে পারবে না। ওই ইঞ্জেকশনটা নেবার ফলে তুমি সুস্থ হয়ে উঠেছ। তারপর আমরা যখন তোমাকে সমুদ্রের পাড়ে ফেলে গ্রামে গেছিলাম তখন তুমি জ্ঞান ফিরে পেয়ে এই নৌকোতে উঠে লুকিয়ে ছিলে। আমাকে আমার কাজ করতে দাও। লোকটার পেট চিরব আমি।'

মৃগাঙ্কর মনে হল ম্যাকাওয়ের যুক্তিটা সত্যি। জ্ঞান ফিরে আসার পর লোকটা নিশ্চয়ই নৌকোতে এসে উঠেছিল।

ম্যাকাওয়ের কথা শুনে প্যারোট বলে লোকটা তার কাছে গিয়ে তেরছা-ভাবে দাঁড়িয়ে তার জামাটা প্রথমে ওপরদিকে তুলে ধরল। লোকটার মুখ, শরীর এবার দৃশ্যমান হল মৃগাঙ্কর চোখে। প্যারোট তার উন্মুক্ত পেটটা দেখিয়ে ম্যাকাওকে বলল, 'এখান থেকেই তো তোমার মুক্তো নেবার কথা ছিল। এখান থেকেই নাও। ওই লোকটার পেট চিরতে দেব না তোমাকে।'

বেশ কঠিন স্বরে কথাগুলো বলল প্যারোট। কথাটা শুনে দপ্ করে

BanglaBook.org

জ্বলে উঠল ম্যাকাও-এর চোখ। সে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, এবার দুটো মুক্তোর ছড়া পড়াব দেবীকে। তোরটাও নেব, আর এই বিদেশীরটাও নেব। অনেক মুক্তো পাওয়া যাবে।' এই বলে সে প্যারোটের দিকে এগিয়ে গিয়ে দু-আঙুলের ফাঁকে ধরা হাঙরের দাঁতটা চালাল প্যারোটের পেট লক্ষ্য করে।

কিন্তু দাঁতটা প্যারোটের পেট ছুঁয়ে গেলেও কোনও আঁচড়-ও কাটতে পারল না। ম্যাকাও-র চোখে ফুটে উঠল বিস্ময়ের ভাব আর প্যারোটের চোখে এক বিদ্রূপের হাসি! এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে ম্যাকাও আবার সজোরে হাঙরের দাঁত চালাল প্যারোটের পেট লক্ষ্য করে। কিন্তু ব্লেডের চেয়েও ভয়ঙ্কর দাঁত এবারও আঁচড় কাটল না তার পেটে। ম্যাকাওয়ের উদ্দেশ্যে এবার লোকটা বলল, 'আমার পেটের দিকে না-তাকিয়ে নিজের পেটের দিকে তাকাও।'

ম্যাকাও তাকাল, আর মৃগাঙ্কও তাকাল ম্যাকাওয়ের পেটের দিকে। প্যারোটের পেটে নয়, যেন নিজের পেটেই হাঙরের দাঁত চালিয়েছে ম্যাকাও। দুটো চেরা দাগ! রক্তের স্রোতের সঙ্গে ম্যাকাওয়ের নাড়িভুঁড়ি যেন বাইরে বেরিয়ে আসছে! ম্যাকাওয়ের শরীরটা কেঁপে উঠল থরথর করে। তার হাত থেকে খসে পড়ল হাঙরের দাঁতটা। আর তারপর ম্যাকাও ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল!

নৌকোটা প্রচণ্ড দুলছে। হাঙরের দাঁতটা কুড়িয়ে নিয়ে প্যারোট এগিয়ে এল মৃগাঙ্কের দিকে। সে কি মৃগাঙ্কর পেট চিরবে নাকি? লোকটা এগিয়ে এসে হাঙরের দাঁতটা দিয়ে দড়ির বাঁধন কেটে তার হাত ধরে ঘরের বাইরে বের করে আনল। বাইরে প্রচণ্ড তুফান শুরু হয়েছে। মৃগাঙ্ককে নিয়ে লোকটা চড়ে বসল ক্যানোটাতে। ক্যানো নিয়ে উত্তাল সমুদ্রে ভেসে পড়ার আগে হাঙরের দাঁত দিয়ে নৌকোর নোঙরের কাছিটাও কেটে দিল। ঝড়ের গতিতে সমুদ্রের অন্যদিকে ভেসে গেল নৌকো। আর ক্যানোর দাঁড় বাইতে শুরু করল লোকটা। উত্তাল সমুদ্রে মোচার খোলার মতো দুলতে থাকল নৌকো।

মৃগাঙ্ক যেন একটা আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে ছিল। যখন তার হুঁশ ফিরল ততক্ষণে তারা ঝঞ্ঝাপূর্ণ সমুদ্র-অঞ্চল অতিক্রম করে এসেছে। কোনদিকে এসেছে, কত সময় কেটেছে তার খেয়াল নেই। চারপাশে এখন শান্ত সমুদ্র, চাঁদের আলো খেলা করছে জলে। শান্ত মনে ক্যানোর দাঁড় বাইছে প্যারোট।

BanglaBook.org

মৃগাঙ্ক ধাতস্থ হতে আরও বেশ কিছুক্ষণ সময় নিল। হঠাৎ দূরে একটা আলোক বিন্দু দেখা গেল। সেটা দেখিয়ে প্যারোট বলল, 'ওটা মাছ ধরার জাহাজ। এ-নৌকো তোমাকে পৌঁছে দেবে ওখানে। তুমি বেঁচে গেলে।'

মৃগাঙ্ক এবার প্রশ্ন করল, 'তুমি আমাকে বাঁচালে কেন?'

প্যারোট জবাব দিল, 'তুমি আমাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলে তাই। আর সবচেয়ে বড় কথা, মানুষের পেট চিরে মুক্তো তৈরির এপ্রথা আমি বন্ধ করতে চেয়েছিলাম। বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে এতে। এজন্যই আমাদের জনজাতি নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'মানুষের পেট চিরে মুক্তো তৈরি মানে?'

প্যারোট দাঁড় টানতে টানতে বলল, 'এ এক প্রাচীন প্রথা আমাদের। দেবী মেডুসার গলায় তোমরা যে জিনিসগুলোকে দেখো তা আসলে ঝিনুকের পেটের মুক্তো নয়। ওই হাঙরের দাঁত দিয়ে মানুষের পেট চিরে তার অন্ত্রের একটা অংশ কেটে বের করা হয়। তারপর সেটাকে বিশেষ পদ্ধতিতে ক্ষার দিয়ে মেজে আরও সাদা চকচকে করা হয়। তারপর তার ভিতর বাতাস পুরে ছোট ছোট বলের মতো বানানো হয়। হাতে না নিলে তুমি জিনিসটা দেখে আসলে বুঝতেই পারবে না যে সেটা আসল মুক্তো নয়। এই বাতাস-পোরা মানুষের তৈরি মুক্তো বেশিদিন থাকে না। পচে যায়। তাই আমরা একে সমুদ্রে বিসর্জন দিই। মজার ব্যাপার হল, মেডুসাদেবীর উপাসনার জন্য তৈরি এ-মুক্তো কীভাবে বানানো হয় তা লোকজনকে না বললেও আমরা যখন বলি যে, এ মুক্তো মানুষের পেটে পাওয়া যায় তখন সে-কথা কিন্তু বাইরের পৃথিবীর লোক বিশ্বাস করে না। অথচ আমরা কৌশলে সত্যি কথাই বলি।'

এরপর দাঁড় বাইতে বাইতে আরওয়াক বলল, 'আমাদের গ্রামের সবার পেট থেকেই আগে একবার নাড়ি নেওয়া হয়েছে। আমারও নাড়ি নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়বার নেবার পর আর কেউ বাঁচে না। আমার অন্ত্র না-পেয়ে শেষে ওরা তোমার থেকে তা নেওয়ার চেষ্টা করছিল।'

মৃগাঙ্কর এবার মনে হল, গ্রামের সেই নারকেলবনের মধ্যে সারবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে-থাকা আরওয়াকদের সবার পেটে যেন একটা করে কাটা দাগ ছিল! ব্যাপারটা সে বুঝেও ঠিক বুঝতে পারেনি!

প্যারোটের কথাগুলো শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সে।

BanglaBook.org

ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে জেলেনৌকোর আলো। প্যারোট একসময় বলল, 'এবার আমি ফিরে যাই। সমুদ্রস্রোত পৌঁছে দেবে তোমাকে ওই জেলে-নৌকোতে। কিন্তু তুমি আর কোনওদিন ও-দ্বীপে যেও না।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'কীভাবে ফিরবে তুমি? কোথায় যাবে?'

চাঁদের আলোতে একটা বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল প্যারোটের ঠোঁটে। সে জবাব দিল, 'দেখি সমুদ্রস্রোত কোথায় নিয়ে যায় আমাকে!' এ-কথা বলে লোকটা ক্যানো ছেড়ে নেমে গেল জলে। চাঁদের আলোতে প্যারোটের দেহটা ভাসতে ভাসতে হারিয়ে গেল ঢেউ-এর আড়ালে।

মৃগাঙ্কর হঠাৎ মনে হল, আচ্ছা, সাপের ভেনাসটা সত্যি লোকটার ওপর কাজ করেছিল তো? নাকি অন্যকিছু! নইলে হাঙরের দাঁতের আঘাত প্যারোটের পেটাকে স্পর্শ করল না কেন? কেনই বা চিরে গেল ম্যাকাওর পেট? প্যারোট জলের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল?

কিছুক্ষণের মধ্যেই জেলে নৌকো থেকে সার্চ লাইটের তীব্র আলো এসে পড়ল মৃগাঙ্কর ক্যানোটাতে। একটা চিৎকার শোনা গেল, 'অ্যাহয়? কে তুমি?'

মৃগাঙ্ক জবাব দিল, 'অ্যাহয়। আমি আরওয়াক দ্বীপ থেকে আসছি। আমাকে তোমাদের নৌকোয় তোলো...'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG